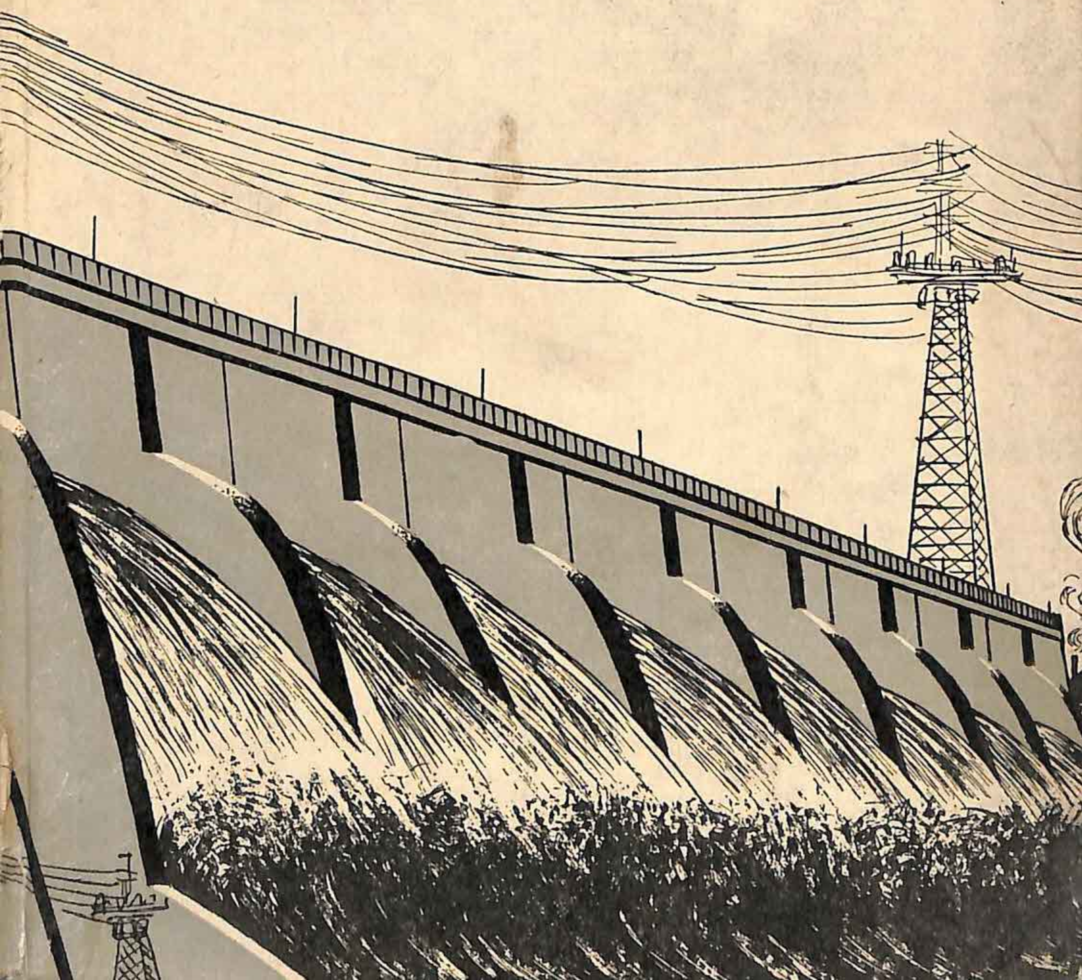
বাংলা দেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা

•

কপিল ভট্টাচার্য



বাংলা দেশের
নদ-নদী ও পরিকল্পনা

বাংলা দেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা

কপিল ভট্টাচার্য

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা ৯

বর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ
নভেম্বর ১৯৫৯

: প্রচ্ছদ :
শঙ্কর দাশগুপ্ত

মূল্য ঃ চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও জ্ঞানোদয় প্রেস (১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা ৯) হইতে শ্রীঅমৃতলাল কুণ্ডু কর্তৃক মুদ্রিত ॥

বিষয়-নির্দেশ

দ্বিতীয় সংস্করণ উপলক্ষে গ্রন্থকারের নিবেদন

আজ ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ। এই বইখানি প্রথম লেখা শেষ করি ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসেই। কিন্তু যে-উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এ বইখানি লিখেছিলাম, তা আজও সাধিত হয় নি। মারাত্মক ভ্রান্তিময় দামোদর পরিকল্পনার ফলে কলিকাতা বন্দর ধ্বংস হতে চলেছে, প্রতি বছরই বর্ষাকালে পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী-হুগলী-উপত্যাকা ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ছে, অথচ তার প্রতিকারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হবার সম্ভাবনা আজও দেখতে পাচ্ছি না। তাই বইখানি পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

প্রথম যখন দামোদর পরিকল্পনা রূপায়িত হতে যাচ্ছিল, তখনই বলেছিলাম, এই পরিকল্পনার মারাত্মক ত্রুটির ফলে, ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই হুগলী নদীর মোহানা এমন মজে যাবে যে সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজ আর কলিকাতা বন্দর অবধি যাতায়াত করতে পারবে না, পশ্চিমবঙ্গ প্রতি বছরই বর্ষাকালে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়বে। সরকারী কর্তৃপক্ষ বাক্‌চাতুরী দিয়ে আমার আশঙ্কা অমূলক বলে প্রচার করছিলেন। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের আর ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ভয়াবহ প্লাবন চোখে আঙুল দিয়ে কিন্তু প্রমাণ করে দিয়েছে, বাক্‌চাতুরী সৃষ্টি করে বৈজ্ঞানিক সত্য চাপা দেওয়া যায় না। কলিকাতা বন্দরে পুরাবোঝাই জাহাজ আজ আর আসতে যেতে পারছে না। কলিকাতা বন্দরে যাতায়াত জাহাজ কোম্পানিগুলির পক্ষে অত্যধিক ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়েছে। এখন ব্যবস্থা হচ্ছে কলিকাতা বন্দর থেকে নদীপথে প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণে হলদিয়া হুগলী নদীর সঙ্গমের কাছে নোঙর ফেলে বড় জাহাজ আংশিকভাবে খালাস করা হবে! কিন্তু কর্তৃপক্ষ ভুলে যাচ্ছেন, হলদিয়া পর্যন্ত জাহাজ আনাও বন্ধ হয়ে যাবে আর ৪।৫ বছরের মধ্যেই। অর্থাৎ ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই হুগলীর মোহানার চর জাহাজ চলাচলের পথ রোধ করে দাঁড়াবে। তখন তাঁরা কি বলবেন! বাস্তবিক আমি এই কথা ধরে নিতে বাধ্য হচ্ছি—Subsidiary Port Scheme-এর অন্তরালে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ থেকে কলিকাতা বন্দর পরিত্যাগের নীতিই গ্রহণ করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার সান্ত্বনা এই যে, দেশের এই সমূহ বিপদের কথা সর্বসাধারণের কাছে নিবেদন করে আসছি দৃঢ় ভাষায়, অক্লান্তভাবেই গত বারো বৎসর ধরে। দেশের সকল সুধী ব্যক্তিই আজ আমার সঙ্গে একমত।

১৯৪৮।৪৯ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের প্রধান মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের বারবার পত্র লিখে এই সমূহ বিপদের কথা জানাই। সেই সময় থেকেই সংবাদপত্রে চিঠি লিখে ও প্রবন্ধ লিখে জনসাধারণকেও জানাই। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ থেকে নানা জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে, সরকারী মহলে ডেপুটেশনের সঙ্গী হয়ে, অবিরাম চেষ্টা করে যাচ্ছি—দেশের এ ভয়াবহ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্যে।

[দুই]

ডি-ভি-সি'র কর্তৃপক্ষ ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে "নিম্ন-দামোদর অনুসন্ধান-কমিটি" প্রতিষ্ঠা করেন—১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী সেই কমিটির সম্মুখে হাজির হবার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। এই বইখানির এক কপি পেশ করে আমার বক্তব্য সেই কমিটির বিশেষজ্ঞদলের কাছে জানিয়ে এসেছিলাম। পরে যখন তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী শ্রীপাতিলের নিমন্ত্রণে নয়াদিল্লী যাই, তখন আলোচনা-প্রসঙ্গে জানতে পারি এই 'নিম্ন-দামোদর অনুসন্ধান কমিটি'র বিশেষজ্ঞগণ সমস্যাটি অন্ততঃ আংশিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছেন—সমস্যা-সমাধানের উপায় হিসাবে আমার প্রস্তাবের মূলনীতিটিও মেনে নিয়েছেন।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের আগে যে দামোদরের খাত ৫০ হাজার কিউসেক জল নিকাশ করতে পারতো, ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে সে দামোদর-খাতের নিকাশ-ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে ২০ হাজার কিউসেকে দাঁড়িয়েছে। রূপনারায়ণ-নিম্ন-হুগলীর খাতের সর্বাধিক জল-নিকাশ ক্ষমতা এই পাঁচ বছরের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। তথাপি দেখছি সমস্যা-সমাধানের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পন্থা আজও অবলম্বিত হচ্ছে না। ফলে পশ্চিমবঙ্গ এক ভিক্ষুক-রাজ্যে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। দেশের সাধারণ মানুষের দুর্দশাই অদূরভবিষ্যতে চরম পর্যায়ে উঠবে। তাই প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তিরই কর্তব্য বাংলা দেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান অর্জন করে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সমস্যা সমাধানের প্রকৃত পন্থা অবলম্বনে কর্তৃপক্ষদের বাধ্য করা। এই কাজ যদি তাঁরা না করেন, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ দুর্দশার হাত থেকে তাঁরাও নিস্তার পাবে না।

বর্ধমান বিভাগ জেলা সম্মিলনীর আহ্বানে গত ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর তারিখে কলিকাতায় 'স্টুডেন্ট্স হলে' এক জনসভায় 'পশ্চিমবঙ্গের জীবনে রূপনারায়ণ নদের ভূমিকা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম। সাধারণ পাঠক যাতে আমার মূল বক্তব্যের সঙ্গে অনায়াসে পরিচিত হতে পারেন, সেইজন্যে ওই প্রবন্ধটি এইখানে পুনর্মুদ্রিত করলাম।

কলিকাতা ১২
১৮ (এন.) মদন বড়াল লেন
২১শে অক্টোবর ১৯৫৯

কপিল ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গের জীবনে রূপনারায়ণ নদের ভূমিকা*

রূপনারায়ণ নদ অতি প্রাচীন। বাস্তবিক, হিমালয় পর্বতের উত্থানের আগে যখন গঙ্গানদীর অস্তিত্ব ছিল না, কাজেই গাঙ্গেয় উপত্যকা ও বাংলা দেশের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ যখন সৃষ্টি হয় নি, তখনও মধ্যভারতের বিন্ধ্য পর্বতের পূর্ব সানুদেশের জল যেসব নদ-নদীর পথে সমুদ্রে মিশতো, রূপনারায়ণ নদ তাদেরই একটি। আজ ডায়মণ্ডহারবার থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত যে নদীকে আমরা নিম্ন-হুগলী নদী বলে চিনি, প্রাচীনকালে সেটি সমুদ্রের খাঁড়ি ছিল,—ভূতাত্ত্বিকদের এই মত। আর সেই প্রাচীন খাঁড়িতেই রূপনারায়ণ, কাঁসাই বা অপর প্রাচীন নদ-নদী বিন্ধ্য পর্বতের পূর্ব সানুদেশের জল সমুদ্রে ঢেলে দিত।

সেই সুপ্রাচীনকালে ভাগীরথী হুগলী নদীর অস্তিত্ব তো ছিলই না, আজ বাংলা দেশের যে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ দিয়ে ভাগীরথী প্রবাহিত হচ্ছে সেই ব-দ্বীপেরও অস্তিত্ব ছিল না—সমস্তটাই সমুদ্র ছিল। তারপরে ভূতাত্ত্বিক কারণে হিমালয় পর্বত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে মাথা উঁচু করলো (আজও সেই পর্বতশ্রেণী মাথা আরও উঁচু করছে), তার কোলে জন্মালো ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ-নদী, সেই নদ-নদী পলি ঢেলে ঢেলে উত্তর ভারতের সমস্ত দেশটাকে নতুন রূপ দিল, বাংলার ব-দ্বীপ সৃষ্টি করলো, নতুন নতুন মানুষ নতুন সভ্যতার পত্তন করলো। এরই মধ্যে প্রয়োজনের তাগিদে ভাগীরথী নামে নতুন খাল কাটা হয়েছিল, অথবা পুরানো জল-পথ সংস্কার করা হয়েছিল। মানচিত্রে আজ দেখা যায়, সেই ভাগীরথী রূপনারায়ণের মোহানায় লম্বভাবে এসে পড়েছে। বৃটিশ আমল থেকে এই রূপনারায়ণ-মোহানা (প্রাচীন কালের সমুদ্রের খাঁড়ি), নিম্ন-হুগলী নদী নামে পরিচিত হয়েছে। আসলে এটা রূপনারায়ণ নদেরই শেষাংশে—অকারণে তাকে তার প্রকৃত সম্মান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

বাংলার গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সৃষ্টিতত্ত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে অনুধাবন করলে কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এই ব-দ্বীপের পশ্চিমের অংশটি পূর্বের অংশের চেয়ে দ্রুততর বর্ধনশীল। সেইজন্যে পশ্চিমের অংশ দৈর্ঘ্যে এবং উচ্চতায় পূর্বের অংশের চেয়ে বেশী বড়। গত দুই হাজার বছরে সমুদ্র প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে ৫০ মাইল দক্ষিণে সরে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের নদীগুলি জোয়ারের সঙ্গে সমুদ্র থেকে আনা পলিতে দ্রুত মজে যাচ্ছে। যদি রূপনারায়ণ নদ দিয়ে প্রচুর বন্যার জল না নামতো, বহু প্রাচীনকালের 'নিম্ন-হুগলী'র সমুদ্র-খাঁড়িটি ভরাট হয়ে যেত। এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গের রূপনারায়ণ নদটির এত গুরুত্ব। বস্তুতঃ, রূপনারায়ণ নদ দিয়ে যদি বন্যাপ্রবাহ সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ করে দেওয়া হয়, আর বাংলার ব-দ্বীপ সৃষ্টির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের যদি কোনও ব্যবস্থা না করা হয়, তা হলে কয়েক বছরের মধ্যেই 'নিম্ন-হুগলী' নদী সম্পূর্ণ মজে গিয়ে নতুন ভূভাগ সৃষ্টি হয়ে যাবে। সাগর দ্বীপের আশপাশের কোনও গাংএরই অস্তিত্ব থাকবে না। রূপনারায়ণ নদই আজও এই গাংগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

---

* ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর জনসভায় পঠিত।

[চার]

রূপনারায়ণ নদ প্রধানতঃ শিলাই বা শিলাবতী ও দ্বারকেশ্বর বা ঢলকিশোর নদী দুটির সংযোগে ঘাটাল থেকে ওই নামে পরিচিত হলেও, শুধু ওই নদীগুলির বন্যাপ্রবাহ বহন করে না। উপরন্তু দামোদরের বন্যার প্রধান অংশ মুণ্ডেশ্বরীর খাতে রূপনারায়ণেই প্রবেশ করছে। কাজেই ছোটনাগপুর উপত্যকায় পূর্ব-দক্ষিণাংশের প্রায় সমস্ত বৃষ্টির জলই বন্যারূপে রূপনারায়ণের খাত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে 'নিম্ন-হুগলীর' সমুদ্র খাঁড়িতে পড়ে। আর কিছুটা কাঁসাই-হলদি দিয়ে নামে। বর্ষাকালে রূপনারায়ণের এই বন্যাগুলির ভরবেগ নিম্ন-হুগলীর খাতে পলি অপসারিত করে দেয়। তাই এই খাঁড়িটি পলি দিয়ে ভরাট হয়ে যেতে পারে না। যদিও সারা বছর ধরে বঙ্গোপসাগরের নিমজ্জিত পলিমঞ্চ থেকে মণ্ডপলি এই খাঁড়ির খাতে জমা হয় আর চর সৃষ্টি করে, রূপনারায়ণের বন্যা সুষ্ঠু-ভাবে পূর্ণ ভরবেগে প্রবাহিত হতে পারলে সে চর বর্ষাকালে কেটে নিয়ে আবার সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দেয়। এই প্রক্রিয়ায় রূপনারায়ণ নিম্ন-হুগলীর খাত পলি দিয়ে মজে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে।

রূপনারায়ণের বন্যার পূর্ণতরবেগে প্রবাহ প্রথম ব্যাহত করা হয়েছে যখন কোলাঘাট রেলওয়ে পুলটি নির্মিত হয়েছে। ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে যখন কোলাঘাটের রেলওয়ে পুলটি নির্মিত হয়, তখন ইঞ্জিনিয়ারেরা ও পুলে যথেষ্ট জলপ্রবাহের দ্বার (৫,৬৩,৫৩০ কিউসেক—অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৬ লক্ষ ঘনফুট জলের প্রবাহ) খোলা রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে এদিক দিয়ে তাঁদের ভুল হয় নি। কিন্তু নদীর মধ্যে ৯টি পোস্তা গেঁথে ছিলেন তাঁরা। এই পোস্তা (Pier) গাঁথার ফলে সারা বছরের জোয়ার-ভাটার সঙ্গে আনা পলি নদীগর্ভে পতিত হয়েছে, ঔদক-বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী স্বল্প জলের প্রবাহের গতি মন্থরিত হওয়ার জন্যে, আর সেই জন্যে রূপনারায়ণের খাত অনেক মজে গিয়েছে। আবার এইভাবে খাত মজে যাওয়াতে বর্ষার বেশী বন্যায় ভরবেগ অনেক ব্যাহত হয়ে গিয়েছে। কাজেই রূপনারায়ণের বন্যা এই রেলওয়ে সেতু নির্মাণের আগেকার দিনের মত সুষ্ঠুভাবে নিম্ন-হুগলীর পলি অপসারণ করতে পারে না। সেইজন্যে গত পঞ্চাশ বছরে হুগলী নদী আর ভাগীরথী নদী অতি দ্রুত মজে আসছে। ঔদক-বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী নদীর মোহানা ভরাট হলে উপরাংশও সত্বর মজে যায়। ভাগীরথী মূলগঙ্গা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে আজ। এই বিগত পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই (অর্থাৎ কোলাঘাটের রেলওয়ে সেতু নির্মাণের পরে) প্রাচীন তাম্রলিপ্তের শেষ চিহ্ন তমলুক শহর রূপনারায়ণের কূল থেকে অর্ধমাইল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে একটি বিরাট চর দ্বারা। এই সময়ের মধ্যে রূপনারায়ণের নাব্যতা এত দ্রুত হ্রাস পেয়েছে যে ও-অঞ্চলের অধিবাসীরা সকলেই স্মরণ কালের মধ্যেই সেটা লক্ষ্য করতে পেরেছেন। মোটকথা রূপনারায়ণের খাত ধ্বংস হয়ে গিয়ে তার ভিতর দিয়ে বন্যার জলপ্রবাহ দ্রুতগতিতে নিষ্কাশিত হওয়ার আর উপায় নেই। কোলাঘাটের রেলওয়ে সেতুর দ্বার যদিও প্রায় ৬ লক্ষ ঘনফুট জল প্রতি সেকেণ্ডে বার করে দেওয়ার জন্যে নির্মিত হয়েছিল, নদী কিন্তু সে দ্রুতগতিতে জল নিকাশ করতে পারছে না। 'হাঁ'টি যত বড়ই হোক, মৃতপ্রায় মানুষ যেমন পর্যাপ্ত আহার গলাধঃকরণ করতে পারে না, তেমনি ইঞ্জিনিয়ারেরা কোলাঘাটের

রেলওয়ে সেতুতে যতবড় দ্বারই খোলা রেখে থাকুন না, মৃতপ্রায় রূপনারায়ণ বন্যা-প্রবাহ দ্রুতগতিতে নিকাশ করতে পারে না। কাজেই সুযোগ পেলেই নদীর জল উপচিয়ে পড়ে দেশব্যাপী প্লাবনের সৃষ্টি করে। নিম্ন-দামোদর ও রূপনারায়ণের রেলসেতু পরোক্ষে এই এলাকার প্লাবনের জন্যে দায়ী। তারাই নদীর খাত মজিয়ে দিয়ে জল নিকাশের ক্ষমতা নষ্ট করেছে। আমি কিন্তু এ কথা বলছি না যে, ওই রেলওয়ে পুল দুটি করা উচিত হয় নি। দেশে রেলপথের প্রয়োজন যখন অনিবার্য, তখন নদ-নদীর উপর সেতু নির্মাণও অনিবার্য। তা ছাড়া ৫০।৬০ বছর পূর্বে কোলাঘাটে রূপনারায়ণ নদের উপর যে দৃঢ় সেতু নির্মিত হয়েছে, সেটি সে যুগের সেতু-স্থাপত্যের একটি যে অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন, সে কথা অনস্বীকার্য। গত ৫০।৬০ বছরে নদী-বিজ্ঞান এবং নদী-শাসন সম্বন্ধীয় পৌর্তিক বিদ্যারও অনেক উন্নতি হয়েছে। রূপনারায়ণের খাত ধ্বংস করার জন্যে তখনকার ইঞ্জিনিয়ারদের দোষী সাব্যস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে এ সব কথাও মনে রাখতে হবে। বর্তমান যুগের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাঁদের ছিল না।

দুঃখের বিষয়, রেলপথ ও রাজপথের সেতু-নির্মাতা ইঞ্জিনিয়ারদের প্রধান লক্ষ্য হয়, তাঁদের নির্মিত সেতুগুলি রক্ষা করা। নদীর খাত রক্ষা, নদীর জল-প্রবাহের সম্যক্ গতি রক্ষায় তাঁদের লক্ষ্য থাকে না। তারই ফলে দেখা যায়, আমাদের দেশে সেতু-নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে নদীর খাত নিহত হয়েছে, নদীর নাব্যতা ও জল-নিকাশ ক্ষমতা ধ্বংস হয়েছে, প্লাবনের বৃদ্ধি হয়েছে।

সম্প্রতি কোলাঘাটের উক্ত রেলওয়ে সেতুর মাত্র এক ফার্লং উত্তরে রূপনারায়ণ নদের উপর দিয়ে রাজপথ যাবার জন্যে একটি সেতুর পরিকল্পনা করা হয়েছে। নদী-বিজ্ঞানের এত উৎকর্ষের দিনেও এই কলিকাতা-বোম্বাই জাতীয় সড়কের সেতু পরিকল্পনায় যে পূর্বভ্রান্তিরই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে, তাই দেখে বিস্মিত হচ্ছি। আজকের দিনে ইঞ্জিনিয়ারদের এরূপ ভ্রান্তি সম্পূর্ণ অমার্জনীয় অপরাধ বলেই গণ্য হওয়া উচিত। যেহেতু আজকের দিনের বৈজ্ঞানিকেরা নদীর খাত বজায় রেখে, এমন কি তার উৎকর্ষে সহায়তা করেই দৃঢ় সেতু-নির্মাণের বুদ্ধি অতি সহজেই দিতে পারেন।

রূপনারায়ণ দিয়ে দামোদরের প্রধান বন্যাপ্রবাহ মুণ্ডেশ্বরী খাত মারফত নিকাশ হত। আজ দামোদর পরিকল্পনার বন্যাবিরোধী বাঁধ সেই বন্যার জল নিরুদ্ধ করছে। কাজেই, রূপনারায়ণে আগেকার মত জলপ্রবাহ পাওয়া যাবে না। জলপ্রবাহের পরিমাণ কমানোর সঙ্গে সঙ্গে যদি নদীর প্রসারতা কমানো না হয়, তা হলে প্রবাহের গতি মন্থরতর হয়, আর নদীর গর্ভে পলি পতিত হতে থাকে, নদীর খাত উচ্চতর হয়ে নদী ক্রমশঃ মজে যায়। সে নদী আর অল্প বন্যার জলপ্রবাহ ত্বরিতে বহন করতে পারে না, অল্প বন্যাই তার উপকূল অঞ্চলে প্লাবন সৃষ্টি করে। এইভাবে নদীর প্রসারতা কমিয়ে না দেওয়ার ফলে নদীর নাব্য গভীরতা ও জল-নিকাশী ক্ষমতা লোপ পেয়ে নদী দেশের এক অভিশাপে পরিণত হয়। ঔদক-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা যাঁরা জানেন, তাঁরা সকলেই এ সম্বন্ধে একমত।

তাই আজ যখন দেখছি কলিকাতা-বোম্বাই জাতীয় সড়কের নির্মাতা ইঞ্জিনিয়ারেরা আগেকার রেলওয়ে সেতুর মত লম্বা সেতু নির্মাণ করতে চলেছেন,

আর সে সেতুর জন্যে বেশী সংখ্যায় পোস্তা গাঁথতে যাচ্ছেন নদীগর্ভে, তখন দুঃখিত না হয়ে আর পারছি না। রেলওয়ে সেতুর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ দৈর্ঘ্যের সেতু (অর্থাৎ প্রায় ৮০০ ফুট) নদীগর্ভে একটিও পোস্তা না গেঁথে অতি সহজেই নির্মাণ করা যায়। আর সেই আয়তনের সেতুই রূপনারায়ণের খাতের উৎকর্ষ সাধন করতে পারে। যেখানে আজ প্রায় এক কোটি টাকা খরচ করার ব্যবস্থা হচ্ছে, সেখানে মাত্র ২০ লক্ষ টাকা খরচ করলেই চলতো। আজকের দিনে সরকারী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শুনছি—অর্থাভাব ; ইস্পাত, সিমেন্ট প্রভৃতি মসলার অভাব, অথচ তখনই দেখছি এই কোলাঘাটে জাতীয় সড়কের রূপনারায়ণ-সেতু নির্মাণে একটা প্রকাণ্ড পরিমাণ অর্থ শুধু অপচয়িত হতে যাচ্ছে না, নদীটিকে বধ করবার কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে! দীর্ঘ সেতুর সঙ্গে কোলাঘাট এলাকায় ঘোরানো রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজন হচ্ছে, সেইজন্যে অনেক মূল্যবান চাষের জমি নষ্ট করতে হচ্ছে। দেশে যখন খাদ্যশস্যের দারুণ অভাব, সে সময়ে কর্তৃপক্ষ এভাবে মূল্যবান চাষের জমি নষ্ট করতে কেমনভাবে যে প্রশ্রয় দেন, তা বুঝতে পারি না।

অথচ মাত্র ৮০০ ফুট দীর্ঘ আধুনিক ডিজাইনের সেতুটি পুরানো উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোডের উপরই নির্মাণ করা খুবই সহজ, সেজন্যে চাষের জমি ধ্বংস করবার প্রয়োজন হত না। সেরূপ সেতু নদীর অল্প জলপ্রবাহের গতি বেগবান রেখে নদীগর্ভ গভীর করতে সাহায্য করতো, নদীর নাব্যতা ও জল-নিকাশ ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করতো। দীর্ঘতর সেতু ভীষণ হানিকর হবে।

শুধু এই সেতুর কাছেই নয়, কোলাঘাট থেকে নিম্নে গেঁয়োখালি পর্যন্ত নদী-শাসন পদ্ধতিতে রূপনারায়ণকে স্বল্পপ্রসারে এনে তার গভীরতা বৃদ্ধির আশু প্রয়োজন। কোলাঘাটের উপর দিকে ঘাটাল পর্যন্তও তাকে যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। তা না করলে, দামোদর পরিকল্পনায় বন্যানিরোধের ফলে মুণ্ডেশ্বরীর খাতও অচিরাৎ মজে যাবে, রূপনারায়ণের গর্ভ উঁচু হয়ে যাওয়ার ফলে। মেদিনীপুর জেলার নিম্নাংশ, আরামবাগ মহকুমা, হাওড়া জেলা প্রভৃতি 'নিম্ন-দামোদর' এলাকা মাঝে মাঝে (স্থানীয় বৃষ্টিপাতের ফলেই) ভীষণ প্লাবনের কবলে পড়বে, অনেকাংশ কেতুয়ার জলার মত বিরাট জলাভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে। চাষবাস নষ্ট হবে।

ঘাটালের নীচে রূপনারায়ণ থেকে দামোদর পর্যন্ত যে প্রাচীন নদীখাত ছিল, তারও পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। তাতে এই নিম্ন-দামোদরের খাতটিরও পুনরুদ্ধার করা হবে, তার জল-নিকাশ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। আর যদি কোনও দিন দ্বারকেশ্বর ও শিলাবতীতে উচ্চ এলাকায় অল্প সময়ে অতিবৃষ্টির ফলে অপ্রত্যাশিত বন্যা নামে তবে সে বন্যার জল এই দামোদরের খাত দিয়ে প্রবাহিত হতে পারবে খানাকুল অঞ্চলে প্লাবনের সৃষ্টি না করে। রূপনারায়ণের খাতে সেই অতিরিক্ত বন্যা ধাবিত হবে না। এই সব উপায়েই সমস্ত নিম্ন-দামোদর এলাকার নদী সংস্কারের প্রয়োজন। এই সব সংস্কার সাধিত না হলে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা এ দেশের সর্বনাশ করবে।

আজ থেকে ৮৷৯ বছর আগে প্রথম যখন দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা রূপায়িত হতে আরম্ভ করে, তখনই সে পরিকল্পনার প্রধান ত্রুটিগুলির প্রতি

কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তারপর থেকে দেশের মানুষকেও অবিরত আমি জানিয়ে এসেছি, সেই ত্রুটির ফলে, কি ভীষণ অকল্যাণ হতে পারে। নিম্ন-দামোদর অঞ্চলের রূপনারায়ণ ও হুগলী সমেত সব নদীর যথোপযুক্ত সংস্কার না করলে, উচ্চ উপত্যকার বাঁধের আড়ালের জল সারা বছর ধরে নিয়ন্ত্রিতভাবে সেই সব নদীপথে না চালালে, রূপনারায়ণ ও নিম্ন-হুগলীতে জোয়ার-জলের সঙ্গে আনীত পলির নিয়ন্ত্রণ সাধন না করলে, উচ্চ উপত্যকায় শুধু বাঁধ নির্মাণ করে নিম্নাঞ্চলে প্লাবন নিরোধ করা যায় না। এই কাজগুলি না করে শুধু উচ্চ উপত্যকায় বন্যার জল নিরুদ্ধ করলে শেষোক্ত নদীগুলির খাত ধ্বংস করা হবে। তার ফলে নিম্ন-দামোদর, রূপনারায়ণ তথা ডায়মণ্ডহারবার-গেঁয়োখালি থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত নিম্ন-হুগলী নদী (যেটা আসলে প্রাচীন সমুদ্র খাঁড়ি অথবা রূপনারায়ণেরই মোহানা) অচিরাৎ মজে গিয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গকে সমূহ বিপদের মুখে ফেলবে। আমি এ কথা অতি স্পষ্টভাবে আর দৃঢ় ভাষায় জানিয়ে আসছি যে, যদি ঘোষিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে দামোদরের উচ্চ উপত্যকায় বন্যা নিরোধী বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হয়, তা হলে ৫ বছরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের জল নিকাশের প্রধান মুখ নিম্ন-হুগলী এতদূর মজে যাবে যে সমুদ্রগামী বড় জাহাজ আর কলিকাতা বন্দরে যাতায়াত করতে পারবে না। সম্যক্ জল নিকাশের অভাবে সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছরই প্লাবনের উৎপাত বৃদ্ধি পাবে। আমার আশঙ্কা কতদূর সত্য তা ইতিমধ্যেই সপ্রমাণ হয়ে গিয়েছে। গত বছরে সারা পশ্চিমবঙ্গের প্লাবন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, এখন পর্যন্ত দামোদর পরিকল্পনার আংশিক বন্যা নিরোধের ফলেই নিম্ন-হুগলীর মোহানার কি নিদারুণ অবনতি ঘটেছে, তার জল-নিকাশী ক্ষমতা কত কমে গিয়েছে। তার নাব্য খাতের ত্বরিত অবনতিও বিশেষজ্ঞগণের অজানা নয়। কলিকাতা বন্দরে জাহাজ খালাস-বোঝাই-এর কাজে যে বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে তার জন্যে শুধু ডক শ্রমিকদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সরকারী মহল প্রথমতঃ নিশ্চিন্ত থাকতে চাইছিলেন। নদীর নাব্যতা-হ্রাস কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা অস্বীকার করতে পারছেন না। আর সেইজন্যে অল্প মালের জন্য বহু সংখ্যায় ছোট ছোট জাহাজের কলিকাতা বন্দরে ভিড় সামলানো শক্ত হয়ে পড়ছে। এখন চেষ্টা হচ্ছে, মাঝ দরিয়ায় গাদাবোটে মাল খালাস করে আরও কিছুদিন কলিকাতা বন্দর চালানোর। নীচের দিকে ডায়মণ্ডহারবার ও গেঁয়োখালিতে আরেকটি বন্দর পত্তনের চেষ্টার কথাও শুনছি। কিন্তু এসব কোনও বুদ্ধিই হুগলী নদীর নাব্যতা অব্যাহত রাখতে পারবে না—তার খাতের সুষ্ঠু উন্নয়ন চাই সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায়। বঙ্গোপসাগরের পলিমঞ্চ থেকে জোয়ারের জলের সঙ্গে আনীত পলির নিয়ন্ত্রণ দ্বারাই হুগলী-রূপনারায়ণের খাত ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচবে। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ নদী-শাসনের পৌর্তিক কাজও করতে হবে। রূপনারায়ণে ভুল ডিজাইনের সেতু নির্মাণ করা চলবে না। সাম্প্রতিক কালে হুগলী-নদীর জলে পলির পরিমাণ এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের পায়খানা, রাস্তা ধোওয়ার অপরিশ্রুত জলের পাইপগুলি এই পলি বোঝাই হয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শুকনোর দিনে এই পাইপ দিয়ে কলিকাতায় আর অপরিশ্রুত জল পাওয়া যায় না। আর ড্রেনের পাইপগুলোকেও সম্যক্‌ভাবে ধোওয়া যায়

না। পলিসমেত যেটুকু অপরিশ্রুত জল এই ড্রেন-পাইপগুলোতে ঢোকে, তারা পলি দিয়ে এই ড্রেন-পাইপগুলোকে আরও আবদ্ধ করে দেয়, বর্ষার জল ড্রেন-পাইপ দিয়ে নিকাশ করা যায় না। কলিকাতার বহু অঞ্চল বর্ষাকালে প্লাবিত হয়ে পড়ে থাকে। বোঝা শক্ত নয়, এর মূল কারণ হুগলী নদীর খাতের আজকের দিনের এই দারুণ অবনতি, যে অবনতি দামোদর পরিকল্পনার মারাত্মক ভ্রান্তির ফলে চরমে উঠতে চলেছে। এ ভ্রান্তি সংশোধিত না হলে ১৫।২০ বছরে কলিকাতা শহর মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে যাবে।

অনেকে মনে করেন, ফরাক্কার গঙ্গাবাঁধ বেঁধে খাল কেটে কিছু গঙ্গাজল ভাগীরথীতে অনুপ্রবিষ্ট করাতে পারলে এ সবের প্রতিকার হবে। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। হুগলী নদীর জোয়ারের জলের পলি ওই ফরাক্কা বাঁধের কাটা খাল ২।১ বছরেই বন্ধ করে দেবে। ড্রেজার চালিয়ে সে খাল খোলা রাখা গেলেও, ভাগীরথী নিজেই জোয়ারের পলিতে মজে যাবে, সুতরাং সে খাল অকেজো হবেই। যেমন দামোদর পরিকল্পনার দুর্গাপুরের নাব্য খাল অকেজো হয়ে থাকছে ত্রিবেণীর কাছে হুগলী নদী মজে থাকার জন্যে। জোয়ারের জলের এই পলির জন্যেই ভাগীরথী নিজেই মূল গঙ্গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। শত কোটি টাকা ব্যয়ে দামোদর পরিকল্পনা রূপায়িত করা হচ্ছে। দেশের শিল্পায়নের জন্যে তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু সে পরিকল্পনার ত্রুটিগুলি ও মারাত্মক ভ্রান্তিগুলি সংশোধিত না হলে, দেশের কল্যাণ না হয়ে অকল্যাণই হবে। গত দশ বৎসর ধরে দামোদর পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনায় নিম্ন-দামোদর এলাকায় অনর্থক দেড় হাজার মাইলেরও বেশী সেচ-খাল কাটা হয়েছে প্রচুর চাষের জমি নষ্ট করে। আজও সে সেচ-খালগুলি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। অধিক খাদ্যশস্য ফলানোও যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ গত দশ বছর ধরে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে রয়েছে। কিন্তু যে অর্থ ব্যয় করে ওই নিরর্থক খালগুলি কেটে নিম্ন-দামোদর অঞ্চলের নদীগুলির সর্বনাশ করা হল, তার চেয়ে অনেক অল্প ব্যয়ে বিকল্প সেচ-ব্যবস্থায় এতদিনে অনেক ফসল ফলানো যেত (সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য উপযুক্ত ভূমি-সংস্কার নীতি অবলম্বন করে)। নলকূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি সেচ-ব্যবস্থারই সবিশেষ প্রয়োজন ছিল সত্ত্ব ফল পাবার জন্যে। এ কথা আমি বহুবার বলেছি।

কিন্তু সবচেয়ে বিপদ আসছে আমাদের দেশের সামনে রূপনারায়ণের মোহানাকে (প্রাচীন সমুদ্র ফাঁড়ি—যেটা বর্তমানে নিম্ন-হুগলী নদী বলে পরিচিত) বজায় রাখার ব্যবস্থার অভাবে। ছোটনাগপুর উপত্যকায় বৃষ্টির জলের বন্যাগুলি দামোদর-রূপনারায়ণের খাত দিয়ে নেমে পলি কেটে কেটে যুগ যুগ ধরে এই মোহানা বাঁচিয়ে রেখেছিল। প্রথম সে কাজ ব্যাহত হয়েছিল, দামোদর ও রূপনারায়ণ নদের উপর দিয়ে বি. এন. আর (বর্তমান দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ)-এর সেতু নির্মাণের ফলে। এই সেতু নির্মাণের ফলে নিম্ন-দামোদর নদটি একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বললেই চলে। দামোদরের জল মুণ্ডেশ্বরীর খাতে রূপনারায়ণ দিয়ে যাওয়ার দরুন, রূপনারায়ণের খাত সেতু নির্মাণের ফলে ধ্বংসোন্মুখ হলেও বন্যাগুলি মোহানাটাকে (নিম্ন-হুগলীকে) কোনও রকমে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিল। দামোদর পরিকল্পনায় বন্যা-নিরোধের ফলে সে কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার উপরে

বর্তমানে কলিকাতা-বোম্বাই জাতীয় সড়কের যে সেতু রূপনারায়ণে নির্মিত হতে যাচ্ছে, তার ফলে রূপনারায়ণ এবং হুগলীকে বাঁচিয়ে নিম্ন রাখার আশা সমূলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ সবের প্রতিকার না হলে কলিকাতা বন্দরের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। বছরে বছরে প্লাবনের বিভীষিকা লেগেই থাকবে পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র অঞ্চলে। গেঁয়োখালি-ডায়মণ্ডহারবারে নতুন বন্দর পত্তনের আশাও মরীচিকায় পর্যবসিত হবে—ওখানেও নদীর নাব্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে ৫।৭ বছরের মধ্যেই। অথচ রূপনারায়ণকে বাঁচাতে পারলে, শুধু কলিকাতা বন্দরই রক্ষা পাবে না, কলিকাতা থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত এবং কোলাঘাট থেকে গেঁয়োখালি পর্যন্ত, সমস্ত নদীর তীরে তীরে বন্দর, জাহাজ-নির্মাণ কারখানা এবং অন্যান্য শিল্প পত্তন অতি সহজেই করা যায়, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য। পশ্চিমবঙ্গ প্লাবনের সংকট থেকেও রক্ষা পায়।

রূপনারায়ণের সমস্যা শুধু তার তীরবাসীদের সমস্যা নয়, শুধু নিম্ন-দামোদর এলাকার মানুষের সমস্যা নয়, অথবা শুধু কলিকাতাবাসীদের সমস্যা নয়। এ সমস্যা সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গবাসীর চেতনা জাগ্রত করতেই হবে, নতুবা আমাদের সমূহ বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হবে। পশ্চিমবঙ্গের জীবনে রূপ-নারায়ণ নদের প্রকৃত ভূমিকা বুঝতেই হবে। রূপনারায়ণকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

মোট কথা, রূপনারায়ণ নদকে তথা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বনিয়াদ রক্ষা করবার জন্যে অবিলম্বে এই ব্যবস্থাগুলির দরকার :

১] কলিকাতা-বোম্বাই জাতীয় সড়কের জন্যে রূপনারায়ণে যে ভুল ডিজাইনের সেতু নির্মিত হতে যাচ্ছে, সে কাজ বন্ধ করে, নদীগর্ভে একটিও পোস্তা না গেঁথে সেতু নির্মাণ করতে হবে।

২] ঘাটাল থেকে গেঁয়োখালি পর্যন্ত রূপনারায়ণের প্রসারতা পূর্ত কার্যের দ্বারা কমিয়ে তার গভীরতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে।

৩] গেঁয়োখালি থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত নিম্ন-হুগলী নদীরও প্রসারতা কমিয়ে গভীরতা বাড়ানোর জন্যে পৌর্তিক উপায় করতে হবে।

৪] বঙ্গোপসাগরের পলিমঞ্চ থেকে জোয়ারের জলের সঙ্গে বাহিত পলির সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তার জন্যে বঙ্গোপসাগরের এই অংশের বিজ্ঞান-সম্মত, সম্যক্ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা অচিরাৎ হওয়া দরকার।

৫] দারকেশ্বর, শিলাবতী প্রভৃতি নদীর সংস্কার ও প্রয়োজনীয় বাঁধ জলাধার স্থাপন করে নদীগুলিতে সারাবর্ষব্যাপী স্রোত অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬] পুরানো কাঁসাই-এর খাত সংস্কার করে তাতেও সারাবর্ষব্যাপী স্রোত অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭] ঘাটালের নিচে রূপনারায়ণ থেকে নিম্ন-দামোদর পর্যন্ত জলপ্রবাহের প্রাচীন খাত পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮] দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার সুষ্ঠু সংস্কার করে সমস্ত সেচের খালগুলি ভরাট করতে হবে। দামোদর পরিকল্পনার জল, দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী প্রভৃতি নদীর খাত দিয়েই সারা বছর অক্ষুণ্ণ স্রোতে চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আর এই নদীগুলির প্রসারতা কমানো ও গভীরতা বাড়ানোর সুষ্ঠু পৌর্তিক ব্যবস্থা করতে হবে। নিম্ন-দামোদর যেখানে হুগলী নদীর সঙ্গে মিশেছে, সেখানে ড্রেজারের সাহায্যে তার খাত গভীরতর করতে হবে। লকগেট প্রভৃতির দ্বারা জোয়ারের পলিসহ জল যাতে দামোদরে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বাংলা দেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে বই লেখার প্রয়োজন আছে, কারণ আজ বাঙালী মাত্রেই আগ্রহশীল হয়ে উঠেছেন নদ-নদীর কথা শোনবার জন্যে। সরকারী ও বেসরকারী নানা বক্তব্য সংবাদপত্রে ও রেডিওতে নিত্য পরিবেশন করা হচ্ছে নদ-নদীর পরিকল্পনা সম্বন্ধে। কিন্তু সাধারণ মানুষ সব কথা বুঝে উঠতে পারছেন না। বাংলা দেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক কথা জানা থাকলে প্রচারিত বক্তব্যগুলি হৃদয়ঙ্গম ও যাচাই করে নেওয়া যায়, সেই সব কথা জেনে নেবার মত বই বাংলা ভাষায় নেই। ইংরেজিতেও অনেক বই একত্র করলেও ঠিক প্রয়োজন মেটে না।

তবুও এ বইখানি প্রচলিত রীতিতে লেখা হয় নি। বিজ্ঞানের ছাত্র ছাড়া অপরেও বইখানি পড়বেন। এমনিভাবে এটা লিখতে চেষ্টা করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদ কয়টিতে বিষয়-বস্তুর সঙ্গে সাধারণভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে শেষের পরিচ্ছেদ কয়টিতে বৈজ্ঞানিক ধারণা স্পষ্ট করে তোলবার চেষ্টা করেছি। সাধারণ শিক্ষিত মানুষ যাতে পড়ে বুঝতে পারেন, তারই জন্য এ বই লেখা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের ভিত্তির উপর। অনেক অভিজ্ঞ পদস্থ ব্যক্তিকে দেখে অবাক হয়েছি, যাঁদের কাছে বৈজ্ঞানিক মূল তত্ত্বের সূত্রগুলি হারিয়ে গিয়েছে; তাঁরাও এ বই পড়লে আগে শেখা কথা আবার মনে পড়বে। জটিল অঙ্কের অবতারণা বাদ দিয়েছি। কিন্তু যাঁদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার পটভূমিকা আছে, তাঁদের পক্ষে মোটেই শক্ত হবে না বাদ দেওয়া ফাঁকে অঙ্ক ঢুকিয়ে নিতে। যথেষ্ট তথ্য ও ইঙ্গিত দেওয়া আছে।

সাধারণ মানুষকে বোঝাতেই অসাধারণ ক্ষমতার দরকার; আর আমার যে সে ক্ষমতা নেই, তা জানি। তবু এ চেষ্টা না করে পারি নি। কারণ তাঁদেরই কাছে আমার বক্তব্য পৌঁছিয়ে দেওয়ার সবচেয়ে প্রয়োজন আজ। সে প্রয়োজনবোধ না করলে আমি এ বই লিখতে উদ্যত হতাম না। আমার ক্ষমতার যেখানে ত্রুটি আছে, তাঁরা ইচ্ছা করলে সেটা পূর্ণ করে নিতে পারবেন, বোঝবার জন্য বার বার চেষ্টা করে। দুই পক্ষের সহযোগিতা ছাড়া উপায় নেই। সেই সহযোগিতার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

স্বদেশে, বিদেশে বহু স্থানে কাজ করবার অভিজ্ঞতা নিয়ে, বহুদিন ধরে পড়া ও দেখা ও শোনা তথ্যের সমন্বয়ে বইখানি লেখা। পূর্বগামী সকল গুরু, শিক্ষক, দেশী-বিদেশী বন্ধু ও সুধীর কাছেই আমি ঋণী। এ বইএ আমার যেটুকু নিজস্ব সেটুকু হচ্ছে—আহৃত সমস্ত তথ্যের বিজ্ঞান-সম্মত সমীক্ষা করে মূল তত্ত্বের ভিত্তির উপর দাঁড় করানো **সিদ্ধান্ত**। যুক্তিবাদী সহজবুদ্ধি মানুষদের সামনে আমার সিদ্ধান্ত হাজির করলাম, বিচার করে দেখবার জন্য।

সরকারী পরিকল্পনার ভ্রান্তি ও ভাঁওতা বুঝতে হলে নদী ও উপত্যকা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান অপরিহার্য। আজ সরকারী পরিকল্পনা দেশের মানুষকে এক বিপর্যয়ের সামনে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, প্রধানতঃ বিদেশী পরামর্শদাতাদের কুটিল

চক্রান্তে। এ বইএ সে কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করেছি। আর দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার মারাত্মক বিভ্রান্তির ফলে কেমন করে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই কলিকাতা বন্দর ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আমার সিদ্ধান্ত, তার বিস্তৃত আলোচনা বইএ করেছি। কলিকাতা বন্দর শুধু কলিকাতা শহরবাসীর নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসামের অর্থনৈতিক কাঠামোর বুনিয়াদ ; তাকে রক্ষা করার চেষ্টা আমাদের সকলেরই কর্তব্য।

বাংলা দেশের সকল অঞ্চলের অনেক বন্ধু বইখানি লিখতে উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কলিকাতা
১লা সেপ্টেম্বর ১৯৫৪

কপিল ভট্টাচার্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলা দেশের নদ-নদী সম্বন্ধে সাধারণ কথা

নদ-নদী ও বাংলা দেশ

নদ-নদীই বাংলা দেশের বৈশিষ্ট্য। বাংলা দেশের কোনও অংশকেই নদ-নদী বাদ দিয়ে কল্পনাই করা যায় না। আর বাংলা দেশের মনের ছবি এখানকার কবিরা চিরদিনই নদ-নদীকে অবলম্বন করেই ফুটিয়ে তুলেছেন। ছড়ায়, গানে, কিংবদন্তীতে, কাব্যে, মহাকাব্যে বাংলা দেশের রূপ যে নানাভাবে নদ-নদীর ছবি দিয়ে আঁকা, তা কারও অবিদিত নেই। এখানকার সাধারণ মানুষের মনের জাগরণই রবীন্দ্রনাথের কাব্যানুভূতির প্রকাশ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' ফুটে উঠেছে। কবি জসিমুদ্দিনের পদ্মা মায়াময়ী। তাই রবীন্দ্রনাথই একদিন বলেছিলেন, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসিয়ে যে বাংলা দেশকে দেখে নি, সে এ দেশ দেখে নি। প্রাচীন কাব্যে মনসার ভাসান অথবা চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রা নদীপথের ছবিই তুলে ধরে বাঙালীর মনে। সুতরাং বাংলা দেশকে চিনতে হলে এর নদ-নদীর সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় একান্তই দরকার।

বাস্তবিক এ দেশের অধিকাংশ ভূভাগই নদ-নদীর দ্বারাই গঠিত। অর্থাৎ প্রবাহ-বাহিত পলিমাটির স্তরে স্তরে অবক্ষেপণই এই ভূভাগকে সমুদ্র থেকে গেঁথে তুলেছে। উত্তরে হিমালয়ের কোল থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সুন্দরবন অঞ্চল পর্যন্ত নল পুঁতে দেখা গিয়েছে, দু-তিন হাজার ফুট গভীরতা পর্যন্ত শুধুই স্তরে স্তরে বালুকা আর নানাশ্রেণীর মৃত্তিকা পর পর সাজানো রয়েছে নিচে আদিম প্রস্তরের ভিত্তির উপর। এই স্তরীভূত বালি আর মাটিগুলি যে নদ-নদী প্রবাহে বাহিত হয়েই এসেছে আর যুগ যুগ ধরে সমুদ্রগর্ভে জমা হয়ে ক্রমে বাংলা দেশের ব-দ্বীপ অঞ্চলকে সৃষ্টি করেছে, তা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না। সুন্দরবন অঞ্চলে আর তার ক্রোড়ে বঙ্গোপসাগরের গর্ভে আজও সেই গঠনক্রিয়া চলেছে। কোনও কোনও নদী ক্রমশঃ মজে আসছে আর নতুন ভূখণ্ড গঠিত হচ্ছে। এমন কি, স্তরগুলির বালি ও মৃত্তিকা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমীক্ষা করে বলা শক্ত নয়, কোন্ নদ অথবা নদী কোথা থেকে এই বালি আর মাটি এখানে এনেছে। এইভাবে আর অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে, আজকের দিনের নদী পূর্বকালে কোন্ পথে প্রবাহিত হত তাও বলা যায়। দামোদর নদ যে পূর্বকালে চব্বিশ পরগনা জেলার উত্তর-পূর্ব দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে মিশতো, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ওই পথে দামোদরবাহিত বিশিষ্ট লাল দানা দানা বালির নিদর্শন পেয়ে আর জরিপ ও অন্যান্য পর্যবেক্ষণের ফলে।

অবশ্য, সমগ্র বাংলা দেশের ভূভাগই নদ-নদী বাহিত পলির দ্বারা সৃষ্ট হয় নি। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার প্রধান অংশ, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার আংশিক ভূভাগ বৃষ্টি, বায়ু ও হিমবাহ (glacier) দ্বারা বাহিত মাটি

দিয়ে তৈরী। এই সমস্ত ভূভাগের মাটি আর নদীর পলিদ্বারা গঠিত উত্তরবঙ্গ, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি জেলার প্রাচীন মাটি আধুনিক কালে আবার প্রধানতঃ বৃষ্টির জলে ক্ষয়িত হয়ে ওই অঞ্চলের নদ-নদী পথে পলিরূপে নিম্নাঞ্চলে চলে যাচ্ছে, সমুদ্রতটে নতুন ভূভাগ সৃষ্টি করবার জন্য।

সুতরাং এ কথা সহজেই বোঝা যায়, বাংলা দেশের নদ-নদীতেই তার প্রাণশক্তি নিহিত রয়েছে। নদ-নদীর অবস্থান ও অবস্থার উপরেই ঐতিহাসিক কালে এখানকার মানুষের ভালোমন্দ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। প্রত্যেক মননশীল বাঙালীরই বাংলার নদ-নদী সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা খুবই প্রয়োজনীয়; বিশেষতঃ, আজকের দিনে, যখন সরকারী পরিকল্পনা বিভিন্ন নদ-নদীগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া আরম্ভ করেছে। আবার নদ-নদীর বন্যার প্রকোপ তাদের মারক-মূর্তির কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছে।

বাংলার অথবা যে কোনও দেশের নদ-নদী সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান অর্জন করতে হলে ভূতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি, পদার্থতত্ত্ব, রসায়ন, অঙ্ক, গতিতত্ত্ব প্রভৃতির জ্ঞান ছাড়া উপায় নেই। এই বইখানি সাধারণ শিক্ষিত, সহজবোধসম্পন্ন, বাঙালী জনসাধারণের জন্য লিখিত, সুতরাং বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের জটিলতা যথাসম্ভব পরিহার করে সহজবোধ্য ভাষায় শুধু তথ্যগুলি পরিবেশন করা হয়েছে। একবার স্কুলপাঠ্য ভূগোল-ইতিহাস আর অঙ্কশাস্ত্রের বস্তুর গতি-বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মের স্মৃতি ঝালিয়ে নিলে এ গ্রন্থের বিষয়-বস্তু বোঝা আরও সহজ হয়।

গঙ্গা-পদ্মাই বাংলা দেশের মেরুদণ্ড

প্রথমেই বাংলা দেশের নদ-নদীর মানচিত্রখানি একটু ভালো করে দেখতে হবে। বাংলা দেশের মাঝখান দিয়ে উত্তর-পশ্চিম থেকে পূর্ব-দক্ষিণে এবং ক্রমশঃ দক্ষিণে গঙ্গা বা পদ্মা প্রবাহিত হচ্ছে, আর অন্য প্রায় সমস্ত নদীগুলি এই গঙ্গা বা পদ্মার হয় উপনদী অথবা শাখানদী। (পশ্চিমবঙ্গের সুবর্ণরেখা ও পূর্ববঙ্গের কর্ণফুলী নদী স্বাধীনভাবে সমুদ্রে প্রবেশ করেছে)। পশ্চিমবঙ্গের ছোটনাগপুর উপত্যকার উৎস থেকে উৎপন্ন নদ-নদীগুলি গঙ্গার শাখা ভাগীরথী-হুগলী নদীতে এসে মিশেছে। এইরূপে, মোটের মাথায়, প্রধানতঃ গঙ্গা নদীকেই অবলম্বন করে বাংলার সমস্ত নদ-নদী প্রবাহিত হচ্ছে।

গঙ্গা ও গাঙ্গেয় উপত্যকার উৎপত্তি

ভূতাত্ত্বিকেরা জানেন, অতি প্রাচীন কালের পৃথিবীতে হিমালয় পর্বত সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠেছে। প্রায় ২০ (কুড়ি) কোটি বছর ধরে দক্ষিণের গণ্ডোয়ানা শিলাস্তূপ আর উত্তরের লরেশিয়া শিলাস্তূপ পৃথিবীর বিষুববৃত্তের দিকে চাপছে, তারই ফলে একদিন সমুদ্রগর্ভ থেকে হিমালয় পর্বতশ্রেণীর কোঁকড়ানো বা কোঁচানো (folded) শিলা উঠেছে এবং আজও নড়ছে চড়ছে।

অনেকের মত এই যে, হিমালয় পর্বতের অভ্যুত্থানের বহুযুগ পর্যন্ত গঙ্গানদী হরিদ্বারের পথে 'আর্যাবর্তে' নামে নি। যুগ যুগ ধরে সময় লেগেছিল হিমালয়ের শৃঙ্গে বরফ জমে উঠার, আর তার পরে ক্রমশঃ একদিন সে-তুষার গলতে আরম্ভ

করেছিল। হিমালয়ের শৃঙ্গে এই সব ঘটনার পূর্বেও দক্ষিণের বিন্ধ্য পর্বতাঞ্চল থেকে অনেক নদী 'আর্যাবর্তে'র সমুদ্রে নামতো। এখনও সেই সব নদীর উত্তর-পুরুষেরা 'আর্যাবর্তে'র দিকে নেমে এসে গঙ্গার সঙ্গে মিশছে।

পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন, এই অতি প্রাচীন আর্যাবর্তের (অর্থাৎ বর্তমান উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ), বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ প্রধানতঃ বিন্ধ্য পর্বত ও ছোটনাগপুরের পার্বত্য উপত্যকায় উৎপন্ন প্রাচীন নদ-নদীগুলির পলি দিয়ে তৈরী হয়েছিল। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে আম্বালা, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, চন্দননগর, কলিকাতা ও ক্যানিং-এ ১৩০০ ফুট গভীর পর্যন্ত নল বসিয়ে (boring) দেখা গিয়েছিল যে, উপরের স্তরের নীলাভ বালি ও পলিমাটির নিচে (যে মাটি হিমালয় পর্বত থেকে গঙ্গা, যমুনা, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কুশী প্রভৃতি নদী দিয়ে বাহিত হয়ে এসেছে) একটি হরিদ্রাভ লালচে বালি ও মাটির স্তর রয়েছে। এই শেষোক্ত বালি ও মাটির জন্মস্থান মধ্যভারত ও ছোটনাগপুরের পার্বত্য উপত্যকা। সেখান থেকেই প্রাচীন যুগের নদ-নদী এই হরিদ্রাভ লাল বালি ও মাটি পূর্বে গাঙ্গেয় উপত্যকার নিচের স্তরটি সৃষ্টি করেছে। কলিকাতার দক্ষিণে কাউখালিতে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে নল বসিয়ে দেখা গিয়েছিল, বর্তমান ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৬০ ফুট নিচেই এই হরিদ্রাভ লাল বালি ও মাটি রয়েছে। নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ার কাছে, মালদহ জেলায়, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলায় কোনও কোনও স্থানে এই মাটি ভূপৃষ্ঠেই দেখতে পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গে এইরূপ ভূপৃষ্ঠের নাম 'বারিন্দ্' মাটি, এই বারিন্দ্ মাটি থেকেই 'বারেন্দ্র' নামটির উদ্ভব হয়েছে। পূর্ববঙ্গে মৈমনসিংহ জেলায় মধুপুরের বনাঞ্চলে যে লাল শক্ত মাটি দেখা যায়, সে মাটির জন্ম পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চল থেকে।

ভূতাত্ত্বিকদের উক্ত গবেষণা থেকে অনেকে মনে করতে পারেন, কৈলাসের মহাদেবের জটাজটে আশ্রিতা স্বর্গের মন্দাকিনী ভগীরথের আরাধনায় যে মর্ত্যে গঙ্গারূপে অবতীর্ণা—এই পৌরাণিক কাহিনীতে ঐতিহাসিক ও পৌর্তিক তথ্যেরই প্রকাশ। যমুনা, ঘর্ঘরা, কুশী প্রভৃতি হিমালয়জাত নদীর জলের আর্যাবর্তে একটি খাত ছিল, যে খাতে বিন্ধ্য ও ছোটনাগপুরের নদীর জলও এসে মিশতো। সেই সময়ে বর্তমান হরিদ্বারের পথে যে গঙ্গা নেমেছে, হয়তো, সে গঙ্গা স্রোতস্বিনীর অস্তিত্ব ছিল না—ভগীরথের পৌর্তিক কাজ গঙ্গাকে বর্তমান রূপ দিয়েছে, এরূপ অনুমান খুব যুক্তিহীন নয়। কিন্তু মাত্র কয়েকস্থানে মাত্র ১৩০০ ফুট পর্যন্ত গভীর নল পুঁতে বালিমাটি সংগ্রহ করে শুধু সেই নিদর্শনগুলির উপর গবেষণা চালিয়ে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণার প্রশ্রয় দেওয়া সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসম্মত নয়। ভবিষ্যতের গবেষণাই এ সম্বন্ধে আরও তথ্য উদ্ঘাটন করে প্রকৃত সত্য নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে অতি গভীর নলকূপ বসানোর প্রস্তাব উঠেছে,—পেট্রোলিয়ামের সন্ধানে। আশা করা যায় এই সূত্রে নিশ্চয়ই অনেক নতুন তথ্য জানা যাবে।

তবে, পৃথিবীতে বড় বড় নদীর আবির্ভাব ও খাত পরিবর্তনের ইতিহাসের অভাব নেই। যে ব্রহ্মপুত্র নদকে আজ আমরা আসামে ও পূর্ববঙ্গে এক সুবিশাল প্রবাহরূপে দেখতে অভ্যস্ত, সেই ব্রহ্মপুত্র তার বর্তমান উৎস তিব্বতে শান্-পো

নদের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। ভূতাত্ত্বিক ও ভূগোলতাত্ত্বিক যুক্তি দিয়ে পণ্ডিতেরা এই রকম সিদ্ধান্ত করেছেন। তখন ব্রহ্মপুত্র অনুপাতে ক্ষীণতোয়া নদীই ছিল, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে (ভূমিকম্পে ?) শান্‌পোর প্রবাহ গতির পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, আর একদিন সে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে গিরিখাতের পথে এসে ব্রহ্মপুত্রের খাতে নেমেছে। ঐতিহাসিক ও আধুনিক কালে উত্তরবঙ্গের তিস্তা, মহানন্দা, আত্রেয়ী প্রভৃতি নদীর প্রবাহখাত পরিবর্তিত হয়েছে। এমন কি, যে কুশী নদী আজ হিমালয় থেকে নির্গত হয়ে উত্তর বিহারে লম্বভাবে এসে গঙ্গার সঙ্গে মিশছে কুর্শেলার কাছে, সেই কুশী নদীই প্রধানতঃ পূর্ববাহিনী নদী ছিল, আর তার গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গম ছিল, পূর্ববঙ্গে পাবনা জেলার কাছাকাছি। উত্তর বিহার ও উত্তরবঙ্গের ভূভাগ এই সব নদ-নদীর জলে বাহিত পলি দিয়ে তৈরী হয়েছে। উত্তরবঙ্গে ঐতিহাসিক যুগে গঙ্গা-পদ্মাও খাত পরিবর্তন করেছে। কুশী, মহানন্দা, গঙ্গা প্রভৃতির খাত পরিবর্তনের ফলেই মালদহ জেলার ঐতিহাসিক গৌড় অঞ্চল আজ জলাভূমিতে পরিণত।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে গঙ্গা নদী ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হয়েছে রামায়ণে বর্ণিত রাজা ভগীরথের চেষ্টায় ; সম্পূর্ণ অমূলক নাও হতে পারে এ কাহিনী। কাহিনীটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। গঙ্গার খাতের নাব্যতার উৎকর্ষ সাধনের জন্যে হরিদ্বারের কাছে ভগীরথের পৌর্তিক কাজ থাকা অসম্ভব কিছু নয়। আজও হিমালয় অঞ্চলে গাড়োয়াল প্রদেশে গঙ্গার একটি প্রবাহের নাম ভাগীরথী। দেশ বিদেশে অভিযানের জন্যে নদীর নাব্যপথের প্রয়োজনীয়তা প্রাচীন কালের ভারতবর্ষীয় রাজারা খুবই অনুভব করেছিলেন। শুধু হস্তী, অশ্ব, রথের সাহায্যে স্থলপথের ব্যবহার করেই তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকেন নি। পরবর্তী যুগে জলপথ ও সমুদ্র-পথ সৃষ্টির কাহিনীই ভগীরথের কপিল মুনির 'আশ্রমে' গঙ্গাজল আনয়নের ইতিহাসই সূচিত করে, আর অগস্ত্যের সমুদ্র-শাসন যে সমুদ্র যাত্রারই কথা, তা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অগস্ত্য ঋষির স্মৃতির প্রাদুর্ভাব দেখলেই বোঝা যায়।

যাই হোক, গঙ্গা আর্যাবর্তে স্বয়ং অবতীর্ণা হয়েই থাকুন অথবা 'স্বর্গ' থেকে তাঁকে নামানো আর্যাবর্তের কীর্তিমান প্রাচীন অধিবাসীদের কৃতিত্বই হোক, এ কথা অবিসংবাদিত বৈজ্ঞানিক সত্য যে, বর্তমান গাঙ্গেয় উপত্যকা গঙ্গা ও তার উপশাখা বাহিত পলি মাটি দিয়ে গঠিত হয়েছে। এই গঙ্গার উপরই গাঙ্গেয় উপত্যকার মানুষের সমস্ত কল্যাণ যুগ যুগ ধরে নির্ভর করে এসেছে। এখানেই একটি প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে যার অবদান মহামূল্য বলেই গণিত হচ্ছে। গঙ্গা নদীর গুরুত্ব ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী এত বেশী অনুভব করে-ছিলেন যে, সমস্ত নদীটিকে একটি পুণ্যপ্রবাহ বলে চিহ্নিত করে মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছিল। আজও ভারতীয় হিন্দুদের মনে গঙ্গা-মাহাত্ম্যের প্রভাব একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নি। আজও ধর্ম, কাব্য, সাহিত্য, দার্শনিক ও রাজনীতিক সজীব চিন্তাধারা গাঙ্গেয় উপত্যকায়, গঙ্গার জলের স্রোতের মতই নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বইছে।

আর বাংলা দেশে,—'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমিতে' (টলেমি ও মেগাস্থিনিস ঐতিহাসিক সুপ্রাচীন যুগে বর্তমান খুলনা জেলার গঙ্গারিডি—Gangeridae-রাজ্যের উল্লেখ করেছেন।)—এখানকার অধিবাসীর সমস্ত ভালোমন্দ যে গঙ্গা-পদ্মা

ধারাকে মেরুদণ্ডরূপে অবলম্বন করে রয়েছে, সুধী ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ্‌গণ সকলেই এ কথা সমর্থন করবেন।

বাংলা দেশের নদ-নদীর শ্রেণীবিভাগ

গঙ্গা-পদ্মাকে মেরুদণ্ড করে যে সব নদ-নদী বাংলা দেশে প্রবাহিত, বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

ভূগোলের ছাত্রেরা এইসব নদ-নদীকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেই নিশ্চিন্ত থাকেন : (১) উপনদী ও (২) শাখানদী। এই হিসাবে উত্তরবঙ্গের সমস্ত নদীই (এমন কি ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত) গঙ্গা-পদ্মার উপনদী। মানচিত্রে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে পর পর সাজানো হিমালয়জাত এইসব প্রধান উপনদীর নাম— মহানন্দা-পুনর্ভবা, আত্রাই, যমুনা-নাগর সংযুক্ত হয়ে বরাল নদী, এবং করতোয়া। মহানন্দা-পুনর্ভবা ছাড়া অপর নদী কয়টি ব্রহ্মপুত্র নদে পড়ে গঙ্গাপ্রবাহে মিলিত হয়েছে। তেমনি দার্জিলিং-জলপাইগুড়ির খ্যাতনামা নদী তিস্তা বা ত্রিস্রোতাও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র তার বিশালতার জন্যে স্বতন্ত্র নদ হিসেবেই পরিচিত—কিন্তু তাকে গঙ্গা-পদ্মার উপনদীরূপে গণ্য করতেও দোষ নেই। ব্রহ্মপুত্র বর্তমানে যে খাতে প্রবাহিত হচ্ছে, তার স্থানীয় নাম যমুনা। এই যমুনা পূর্বোল্লিখিত দিনাজপুর জেলায় প্রবাহিত আত্রাই-এর সহযোগী যমুনা থেকে পৃথক নদী। ঢাকা জেলায় ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত লক্ষ্যা বা শীতলক্ষ্যা নামে পরিচিত। মেঘনা ও গোমতী নদী পূর্বাঞ্চলের পাহাড় থেকে নির্গত হয়ে পদ্মায় মিশেছে। পূর্বাঞ্চলের পাহাড় থেকে আরও কয়েকটি ছোট ছোট উপনদী একেবারে পদ্মার মোহানার কাছে এসে মিশেছে। শুধু চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদী সরাসরি সমুদ্রে পড়েছে।

উত্তর ও পূর্ববঙ্গে গঙ্গা-পদ্মার এইসব প্রধান উপনদীগুলির নিজেদেরও উপনদী আছে। তা ছাড়া তাদের শাখা-প্রশাখা আছে। এইসব শাখা-প্রশাখার বিভিন্ন স্থানীয় নামও প্রচলিত।

পশ্চিমবঙ্গের উপনদীগুলি গঙ্গার শাখা ভাগীরথী-হুগলী নদীতে মিশেছে; এদের উৎস ছোটনাগপুর-সাঁওতাল পরগনার পার্বত্য উপত্যকায়। উত্তর থেকে দক্ষিণে পর পর সাজানো এই নদীগুলির নাম যথাক্রমে, ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ ও কাঁসাই। সুবর্ণরেখা নদী পশ্চিমবঙ্গে অংশতঃ প্রবাহিত। এটি পূর্ববঙ্গের কর্ণফুলীর মত, সরাসরি বঙ্গোপসাগরে পড়েছে উড়িষ্যার উপকূলে।

পশ্চিমবঙ্গের এই প্রধান উপনদীগুলিরও উপশাখা ও বহু শাখা-প্রশাখা আছে। স্থানীয় গুরুত্বের জন্যে, আমাদের আলোচনায় তাদের নামের উল্লেখ করতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে এবং দেশের সাধারণ মানুষের কাছে, আজ এই সমস্ত গঙ্গা-পদ্মার উপনদীগুলির সঙ্গে বিশেষ পরিচয়ের আবশ্যক এইজন্যে যে, এরাই প্রধানতঃ বর্ষাকালে কয়েকদিন প্রচুর জল বহন করে, যদিও বছরের অন্যান্য সময়ে এরা প্রায় শুষ্ক অথবা অত্যন্ত ক্ষীণতোয়া। হিমালয়ে উদ্ভূত নদীগুলি গলিত তুষারের জল পায় বলে, আর ভূগর্ভস্থ জলের সাহায্যে, তবু কিছুটা প্রবাহিত থাকে সারা বছরই। কিন্তু ছোটনাগপুরের পার্বত্য উপত্যকায় জাত নদীগুলির কোন

কোনটি উপরাংশে কখনও কখনও প্রায় সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়, বর্ষাকাল ছাড়া। উত্তরবঙ্গের তিস্তা, মহানন্দা, আত্রেয়ী প্রভৃতি নদীর ভয়াবহ বন্যার কথা সর্বজনবিদিত। আর পশ্চিমবঙ্গের দামোদরের বন্যার কথা কে না শুনেছে? এইসব সাময়িক বন্যাকুপিত নদীই নিয়ন্ত্রিত করে নদী উপত্যকা পরিকল্পনায় কল্যাণমূলক কাজের সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এদের গুরুত্ব।

গঙ্গা-পদ্মার শাখানদীগুলি সকলেই গঙ্গার ব-দ্বীপে প্রবাহিত। এদের মধ্যে প্রধান শাখা সরাসরি বঙ্গোপসাগরে পড়েছে, এরই নাম ভাগীরথী-হুগলী এবং এরই ধারে কলিকাতা বন্দর ও শহর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাগীরথী-হুগলীকেই অবলম্বন করে বাংলা দেশের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। প্রাচীন গৌড় এই ভাগীরথীর পশ্চিম পারে অবস্থিত ছিল, গঙ্গা-পদ্মার খাত পরিবর্তনে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ আজ মালদহ জেলায় পড়েছে। মহাভারতের যুগেও এই ভাগীরথীর উল্লেখ আছে। মুসলমান আমলের মুর্শিদাবাদ শহর, সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী ভাগীরথী তীরেই অবস্থিত। ইউরোপীয় বণিকেরা হুগলী, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, কলিকাতা প্রভৃতি ব্যবসায় কেন্দ্র স্থাপন করেছিল এই ভাগীরথী-হুগলীর কূলেই। আজ পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চল এই ভাগীরথী হুগলীর তীরেই প্রধানতঃ কেন্দ্রীভূত।

গঙ্গা-পদ্মার অপর শাখাগুলি গঙ্গার ব-দ্বীপে যেন একটি মাকড়সার জাল সৃষ্টি করেছে প্রশাখায় পরস্পরকে অবলম্বন করে তাদের বঙ্গোপসাগরের পথযাত্রায়। এদের মধ্যে ভৈরব-জলঙ্গী এবং মাথাভাঙা-চূর্ণী ভাগীরথীতে এসে মিশেছে। তা ছাড়া মাথাভাঙার প্রধান প্রবাহ ইচ্ছামতী নাম নিয়ে বঙ্গোপসাগরে নেমেছে। মধ্যবঙ্গের আরেকটি প্রধান নদীর নাম ভৈরব। গঙ্গা-পদ্মা থেকে নির্গত গড়াই, কুমার, বারাসিয়া, নবগঙ্গা, মধুমতী প্রভৃতি বহু নদী পূর্ববঙ্গে প্রবাহিত।

গঙ্গার এই শাখা নদীগুলির প্রধান সমস্যা, নিম্নতর অঞ্চলে, গঙ্গার ব-দ্বীপে আজও যেখানে নিত্য নতুন ভূভাগ গঠনের কাজ চলেছে (active delta), সেখানে তাদের মজে যাওয়ার প্রবণতা এবং তার ফলে আঞ্চলিক দীর্ঘস্থায়ী জলাভূমির সৃষ্টি। প্রধানতঃ সমুদ্রের জোয়ারের প্রতিকূল গতি এই নদীগুলিতে 'জলের বাঁধ' সৃষ্টি করে নিম্নাভিমুখী প্রবাহের বাধা সৃষ্টি করে। ফলে, প্রবাহে বাহিত পলি নদীর গর্ভমধ্যে পতিত হয়, উৎসের কাছে চর সৃষ্টি করে মূল নদী থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে আর শেষ পর্যন্ত নদীগুলি 'মজে' যায়। নদী মজে যাওয়ার ফলে আবার তাদের জল নিষ্কাশনের শক্তি হ্রাস পায়। কাজেই পাশের ভূমির বৃষ্টির জল আর তাদের খাত দিয়ে সম্পূর্ণ নিষ্কাশিত হতে পারে না। পাড়েও পলি পাতিত হয়ে (বিশেষতঃ ... বর্ষার বন্যায়) স্বাভাবিক সমান্তরাল বাঁধ সৃষ্টি হয় (levee), তারাও জমির জল নিষ্কাশনে বাধা সৃষ্টি করে। সুতরাং আঞ্চলিক দীর্ঘস্থায়ী জলাভূমির আবির্ভাব হয়। মানুষের স্বার্থে ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে এই শ্রেণীর নদীর প্রধান সমস্যা তাদের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করা আর জলাভূমি থেকে নতুন জমি উঠিত করানো। কিন্তু সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার জন্যে, নিম্নাংশে এই নদীগুলি নাব্য।

নদ-নদীর অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ

নাব্যতার মাপকাঠিতেও বাংলা দেশের নদীর শ্রেণীবিভাগ করা যায়। হুগলী নদী কলিকাতা বন্দর পর্যন্ত ১০।১২ হাজার টন সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষেও নাব্য। ভাগীরথী বড় বড় হাজার-মণী নৌকার পক্ষে নবদ্বীপ পর্যন্ত নাব্য। পূর্বে (অর্থাৎ ৩০।৪০ বৎসর আগে) ভাগীরথী পথে গঙ্গা দিয়ে ভাগলপুর, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, কানপুর পর্যন্ত কলিকাতা থেকে নৌকাপথেই এবং স্টীমারে যাওয়া যেত। আজকাল তা আর সম্ভব নয় বর্ষার মাসখানেক সময় ছাড়া। কারণ, ভাগীরথীতে গঙ্গার উৎপত্তিস্থানের নিকটে উঁচু চরের সৃষ্টি হয়েছে, গঙ্গার সঙ্গে ভাগীরথীর বর্ষার একমাস ছাড়া সংযোগ নেই বললেই হয়।

৫০ বছর আগে পদ্মা-গঙ্গা উত্তর প্রদেশের কানপুর পর্যন্ত সহজ নাব্য ছিল—এর অনেকখানি পর্যন্ত বড় বড় মালবাহী ও যাত্রীবাহী স্টীমার যায়। গঙ্গার ব-দ্বীপের নিম্নাংশে অধিকাংশ নদীই নাব্য। ব্রহ্মপুত্র নদ উচ্চ আসামের ডিব্রুগড় পর্যন্ত নাব্য।

কিন্তু উত্তরবঙ্গের তিস্তা, মহানন্দা প্রভৃতি নদী বছরের সকল সময়ে নাব্য নয়, এবং তারা সকল অংশেও নাব্য নয়। পূর্বে পদ্মা-গঙ্গার স্টীমার মহানন্দাপথে মালদহ (ইংরেজ বাজার) পর্যন্ত যেত। বিলাতী স্টীমার কোম্পানির স্বার্থে মালদহের রেলপথ তাই শহর থেকে বহুদূরে নদীর অপর পারে পত্তন করা হয়েছিল। আজ কিন্তু মহানন্দার নাব্যতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দামোদর, রূপনারায়ণ, কাঁসাই প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের নদীও নিম্নাংশে মাত্র নাব্য। হিমালয়ের পর্বতে তিস্তা, মহানন্দা প্রভৃতি যে সকল নদীর উৎপত্তি, গলিত তুষারের জলের আর তরাইএর বনভূমির ভূগর্ভস্থ সঞ্চিত জলের সরবরাহে তাদের নাব্য অংশে সম্বৎসরই কিছু জল থাকে। কিন্তু দামোদর, রূপনারায়ণ, কাঁসাই-হলদি প্রভৃতি নদী, ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে যাদের উৎস, মাত্র জোয়ার-ভাটা খেলার অংশেই সম্বৎসরব্যাপী নাব্য। বর্ষাকালে উপর অংশের কিছুটা নাব্যতা পায়। সে সময়ে বৃষ্টির জল তাদের প্রবাহে জল সরবরাহের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

নদীর জলের গভীরতার উপরেই তার নাব্যতা নির্ভর করে। ছোট বড় হিসাবে নৌকা এক থেকে ছয় ফুট গভীর জলে চলে। স্টীমার-লঞ্চ প্রভৃতি ছয় ফুট থেকে বারো ফুট গভীর জল চায়। সমুদ্রগামী জাহাজগুলির জন্যে অন্ততঃ ২০।৩০ ফুট গভীরতা চাই।

হিমালয়ের গলিত তুষার সম্বৎসরই কিছু কিছু জল সরবরাহ করে বলে, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী সারা বছরই নাব্য। বর্ষাকালে পার্বত্য ও সমভূমির বিশাল অববাহিকার জল এদের গভীরতা বৃদ্ধি করে। পাটনার পশ্চিমে গঙ্গার অববাহিকার আয়তন প্রায় ২ লক্ষ ৭৫ হাজার বর্গমাইল। সুতরাং এই সুবিশাল অববাহিকার জলের সাহায্যে গঙ্গা যে সারা বছরই বহুদূর পর্যন্ত নাব্য থাকবে তা বোঝা যায়। (কিন্তু গঙ্গার সেচ পরিকল্পনার জন্যে গঙ্গার নাব্যতা গত ৫০ বছরে অনেক নষ্ট হয়ে গিয়েছে)। তেমনি ব্রহ্মপুত্র ডিব্রুগড় পর্যন্ত তিব্বত অববাহিকার জলে পুষ্ট বলে সহজনাব্য। ছোটনাগপুরে এবং চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও আসামের পাহাড়ে উৎপন্ন নদীগুলি প্রধানতঃ বর্ষাকালে বৃষ্টির জলের দ্বারাই পূর্ণ

হয়। তাদের অববাহিকাও আয়তনে অনেক ছোট। অপর সময়ে, বর্ষার যে জল এই স্বল্পায়তন অববাহিকার ভূগর্ভে প্রবেশ করে, সেই জলের কিয়দংশ ওই সব নদীপথে নামে। ব-দ্বীপের নিম্নাংশের নদীগুলি সমুদ্রের জোয়ারের জলেই সর্বদা সজীব—কাজেই নাব্যতার হিসাবে এরাই শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ জোয়ার ও ভাটা বিপরীতগামী প্রবাহ সৃষ্টি করে একটা সুবিধা দেয় এই যে, কোনও কৃত্রিমশক্তি ব্যবহার না করেই নৌকা প্রভৃতি জলযান দুই দিকেই যাতায়াত করতে পারে জোয়ার ও ভাটার বিভিন্ন সময়ে। তাই এই শেষোক্ত নদীগুলিতে যাতায়াত সহজ এবং সুলভ।

সেচের কাজে নদ-নদীর জল ব্যবহার

নদীবহুল ও বৃষ্টিবহুল বাংলা দেশে সেচের জন্যে ব্যবহারের চেয়ে নদীর নাব্যতাই ইঞ্জিনিয়ার ও আর্থনীতিকদের মনোযোগ বেশী আকৃষ্ট করা উচিত। যে সব দেশে বৃষ্টি কম হয়, (যেমন পঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশ) অথচ গলিত তুষারের জলে নদী পুষ্ট থাকে, সেখানে নদীর জল কৃষিকার্যে সেচ-ব্যবস্থার প্রয়োজন মেটায়। বৃষ্টিবিরল মধ্যপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের উচ্চভূমিতেও নদীর জলে সেচ-ব্যবস্থা সমীচীন। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতর মালভূমিতে আদিম অধিবাসীরা ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, কাঁসাই প্রভৃতি নদীগুলির জল নদীর পার্শ্ববর্তী অল্প জমিতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই সেচের প্রয়োজনে ব্যবহার করে এসেছে প্রধানতঃ রবিশস্যের চাষে। দামোদরের বন্যার সময়ে প্রচুর পলি বাহিত হয়ে আসে, এই পলি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে খুবই শক্তিশালী সার। দামোদরের বন্যার মারফত ধানের চাষে এই পলির ব্যবহার করতে নিম্ন-দামোদর এলাকার মানুষেরা অভ্যস্ত ছিল বন্যানিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে। কিন্তু বাংলা দেশের উচ্চতর মালভূমি এলাকাতেও বিকল্প সেচ-ব্যবস্থা আধুনিক যুগে খুবই সহজ পন্থায় করা যায়। সুতরাং সেচের জন্যে নদীর জল ব্যবহার করার কোনও প্রয়োজন নেই বাংলা দেশে। এ কথাটা যত শীঘ্র ও ভালোভাবে বাংলা দেশের ইঞ্জিনিয়ারেরা হৃদয়ঙ্গম করবেন, ততই মঙ্গল হবে।

বাংলা দেশের নদ-নদীর বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ

সাম্প্রতিক কালের নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার পটভূমিতে, বাংলা দেশের নদীগুলির বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নদীর জলশক্তির যে অংশকে কার্যতঃ বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করা যায় ও নদীকে বহুমুখী কল্যাণ কার্যে নিয়োগের উপযোগী করবার জন্যে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তারই উপর নির্ভর করে এই শ্রেণীবিভাগ। ব্যবহারোপযোগিতার মাপকাঠিতে দামোদর, কাঁসাই, মহানন্দা, তিস্তা, কর্ণফুলী, মেঘনা, বরাক প্রভৃতি নদী যদিও গঙ্গা অথবা পূর্ববঙ্গে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্রের মত বিপুল জলধারা বহন করে না, তথাপি ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিকের কাছে তাদের গুরুত্ব ঢের বেশী। কারণ তাদের অবস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমরা অতি সহজে তাদের প্রবাহের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জল-বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি, তাদের নাব্যতা নিয়ন্ত্রিত করে স্থায়ী জলপথের

সৃষ্টি করতে পারি, প্রয়োজন হলে তাদের জল অংশতঃ সেচের কাজেও ব্যবহার করতে পারি।

সারার পুলের কাছে গঙ্গা-পদ্মার সর্বোচ্চ বন্যা মেপে দেখা গিয়েছে, সেখানে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ২৫ লক্ষ ঘনফুট জল (২৫ লক্ষ কিউসেক জল) প্রবাহিত হয়। আর দামোদরে অ্যাণ্ডারসন বাঁধে (Weir—হ্বের্) রণ্ডিয়ার কাছে সর্বোচ্চ বন্যায় মাত্র প্রতি সেকেণ্ডে ৬½ লক্ষ ঘনফুট জল প্রবাহিত হয় (৬½ লক্ষ কিউসেক)। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিকের কাছে পদ্মার চেয়ে দামোদরের মূল্য বেশী, কারণ পদ্মার বিপুল জলশক্তিকে সারাপুলের কাছে অথবা বাংলা দেশের কোনও অংশে জল-বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করবার সহজ এবং বাস্তব উপায় জানা নেই।

ষোড়শ পরিচ্ছেদে 'নদী-পরিকল্পনার সাধারণ কথা' আলোচিত হয়েছে, আগ্রহী পাঠক সে পরিচ্ছেদটি আগেই পড়ে নিতে পারেন, ইচ্ছে করলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুগে যুগে বাংলা দেশের নদীর খাত পরিবর্তন

পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছি, বাংলার নদীগুলির খাত ও প্রবাহ চিরকাল একই ভাবে থাকে নি—নানারূপে পরিবর্তিত হয়েছে। নদীর একটা প্রধান কাজ ভূভাগের নৈসর্গিক পরিবর্তনে সহায়তা করা, পার্বত্য ও পুরাতন উচ্চ পলিপড়া ভূভাগের ক্ষয় সাধন করে বৃষ্টির জল নদীতে এনে দেয় আর নদীপ্রবাহের সঙ্গে সেই মৃত্তিকা বহন করে এনে আবার নতুন জায়গায় নতুন ভূভাগ সৃষ্টি করে। কোথাও গর্ভের চর ও পাড় ভেঙে নদী মৃত্তিকা টেনে নিয়ে নতুন চর সৃষ্টি করে, অথবা মোহানার কাছে নতুন ভূমি গঠিত করে। গঙ্গা-পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের মত বড় বড় নদ-নদীতে কয়েক বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যায়, কোথাও পাড় ও চর ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে, আবার নতুন চর সৃষ্টি করছে অপর স্থানে। নিম্ন ব-দ্বীপ অঞ্চলের নদীগুলি সাধারণতঃ নিম্নভূমিগুলিকে ক্রমশঃ উঁচু হতে সাহায্য করছে। যেখানে মানুষ বাঁধ বা ভেঁড়ি বেঁধে এই কাজ ব্যাহত করেছে, সেখানে নদী নিজের মোহানার কাছে নিজের গর্ভই পূর্ণ করে অন্য সমস্যার সৃষ্টি করেছে, নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। আর আজ যে অঞ্চল নদীর মোহানায় সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত, হাজার হাজার বছরে সেই অঞ্চল এই প্রক্রিয়ায় ক্রমশঃ নতুন ভূভাগে পরিণত হতে পারে।

পুরাতন খাতের গর্ভে পলি জমা হয়ে উঁচু হয়ে প্রবাহপথে বাধা সৃষ্টি করলে, নদী নতুন খাতে বইতে পারে; আমরা বাংলা দেশের নদীগুলির যুগে যুগে খাত পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করছি এই পরিচ্ছেদে। বহু ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিত, সুধী ঐতিহাসিক ও ইঞ্জিনিয়ার ইতিপূর্বে এ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা ও আলোচনা করেছেন। তাঁদের গবেষণা ও আলোচনা বহু গ্রন্থে, সমিতির বিবরণী ও সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সহজেই এইসব তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

গঙ্গা-পদ্মার খাত পরিবর্তন

স্পষ্ট কারণেই প্রথমে গঙ্গা-পদ্মা নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। পূর্বোক্ত তথ্যগুলি পাঠ করে দেখা যায়—গঙ্গা নদী হরিদ্বার থেকে রাজমহল পর্যন্ত তার খাতে বহু শতাব্দী ধরে প্রায় একই ভাবে রয়েছে। এই খাত কোনও কোনও স্থলে ১০।১২ মাইল প্রশস্ত। উত্তর-পশ্চিম রাজ্যে ও বিহারে এই প্রশস্ত খাতের স্থানীয় নাম 'খাদির'। খাদিরের মধ্যে গঙ্গা অবশ্য অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণতর খাত বা প্রণালী অবলম্বন করে প্রবাহিত হয়। কোনও কোনও স্থানে 'দিয়াড়া'র দ্বীপ পরিবেষ্টন করে দুইটি খাতেও গঙ্গা প্রবাহিত হয় মূল খাদিরের মধ্যে। তবে, সাধারণতঃ দেখা যায় একটি খাত সমধিক গভীরতর এবং বহু বর্ষ ধরে এই গভীরতর খাতে প্রবাহিত হবার পরে গঙ্গাপ্রবাহ সেটিকে পরিত্যাগ করে এবং

অপর খাতে চলতে শুরু করে। ভাগলপুরের কাছে প্রতি ২০।২৫ বছর অন্তর (যে পর্যন্ত সংবাদ ও তথ্য সংগৃহীত হয়েছে) গঙ্গা এই রকম দুইটি খাত অবলম্বন করছে তার প্রশস্ত খাদিরের মধ্যে। বর্তমানে ভাগলপুর শহরের পার্শ্ববর্তী খাতটিতে শুধু বর্ষাকালেই গঙ্গাজল প্রবেশ করে, প্রধানতঃ দিয়াড়ার ও-পারের খাতেই গঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে এখানে। আমার অনুমান, ভাগলপুরের উত্তর-পূর্বে কুর্শেলার কাছে হিমালয়-নির্গত কুশীর মূল প্রবাহ এসে গঙ্গায় মিশেছে। বিভিন্ন বর্ষে বন্যা কুশীর বিভিন্ন খাতে তার বন্যাপ্রবাহ শক্তি দিয়ে গঙ্গাপ্রবাহে ধাক্কা দেয়, এই সংঘাতের তারতম্যের ফলেই, ভাগলপুরের কাছে গঙ্গার দুইটি খাতে পর পর পরিবর্তিত প্রবাহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে প্রায় প্রতি বিশ বছর অন্তর হিমালয়ের সানুদেশে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয় এবং কুশীতে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

রাজমহলের নিচে গঙ্গা বাংলা দেশে প্রবেশ করে ঐতিহাসিক কালে তার মূল খাত পরিবর্তন করেছে। অর্থাৎ নতুন 'খাদিরে' বইছে। অনেকের মত, বাংলা দেশে প্রবেশ করে গঙ্গার প্রধান প্রবাহ অথবা একমাত্র প্রবাহ প্রথমে ভাগীরথীর খাতেই ছিল। বিখ্যাত সেচ-ইঞ্জিনিয়ার উইলিয়াম উইল্‌কক্‌স (Wilcox) সাহেব বলেন, ভাগীরথী গঙ্গা-পদ্মা থেকে কেটে আনা খাল ছাড়া আর কিছু নয়। গঙ্গার ব-দ্বীপের ভৈরব, জলঙ্গী, মাথাভাঙা প্রভৃতি মধ্যবঙ্গের সমস্ত নদীগুলিকেই তিনি সেচের কাজের জন্যে কাটা খাল ছাড়া আর কিছুই নয় বলে সাব্যস্ত করেছিলেন। বৃষ্টিবহুল বাংলা দেশে এরকম সেচ-ব্যবস্থার জন্যে খাল কাটার প্রয়োজন কেন হল, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি overflow irrigation অর্থাৎ 'উপচানো সেচ-ব্যবস্থা' কথাটি আমদানি করেছেন। মহাভারতে বর্ণিত ভগীরথ-গঙ্গা-পদ্মাবতীর পৌরাণিক কাহিনীটির তিনি ব্যাখ্যা করেছেন ভগীরথকে সেচ-বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররূপে ধরে নিয়ে ভাগীরথীর খাল কাটার ইতিহাস হিসেবে।

বাংলা দেশের মানুষের মনের সংস্কার কিন্তু ভাগীরথীকেই গঙ্গার প্রধান প্রবাহ-খাত বলেই মনে করে। হিন্দু সভ্যতায় গঙ্গা মহাত্ম্যের প্রচারণা এই ভাগীরথীকেই গঙ্গা বলে প্রচার করেছে। উইল্‌কক্‌স সাহেবের পরবর্তী বহু ঐতিহাসিক ও ইঞ্জিনিয়ারাও ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের পর বলতে চেয়েছেন, ভাগীরথীই গঙ্গার প্রথম মুখ্য খাত।

কিন্তু ভূতাত্ত্বিকদের গবেষণা ভাগীরথীই গঙ্গার প্রধান খাত হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ আনে। তাঁরা বলেন ভাগীরথী-হুগলীর নিম্নাংশ প্রথম থেকেই সমুদ্রের খাঁড়ি ছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও বিহারের গাঙ্গেয় উপত্যকায় এবং পশ্চিমবঙ্গে আধুনিক গাঙ্গেয় পলিস্তরের নিচে যে হরিদ্রাভ লাল কংকর প্রস্তর মিশ্রিত মৃত্তিকার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হয়, হিমালয় পর্বত থেকে আজকের এই বিপুলায়তন গঙ্গা সম্পূর্ণ অবতরণ করবার আগে এখানকার সাগরগর্ভ মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুরের পার্বত্য উপত্যকায় উৎপন্ন প্রাচীন বিশালায়তন নদীর জলধারায় বাহিত পলির দ্বারাই পূর্ণ হয়েছিল। দামোদর প্রভৃতি নদের প্রাচীন সংস্করণ নদ-নদীর পলি দিয়েই পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ভাগীরথী উপত্যকার ভূভাগের নিম্নতর স্তর গঠিত। সুতরাং গঙ্গা অবতীর্ণ হয়ে প্রথমেই বর্তমান পদ্মার প্রবাহপথে প্রবাহিত

হত, অথবা ভাগীরথীর পথে প্রবাহিত হত, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে গেলে, সমস্ত গঙ্গা-পদ্মা ও ভাগীরথীর খাতে গভীর নল পুঁতে ওই হরিদ্রাভ লাল মাটির ঢাল (slope) সমীক্ষা করতে হবে।

ভগীরথের কাহিনীটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত ধরে নিলে পদ্মাকেই গঙ্গার প্রধান খাত বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। বাস্তবিক কাহিনীটির মধ্যে অলৌকিক কিছুই নেই, শুধু কাব্যসুলভ ভাষার আশ্রয়ে হিমালয় থেকে সাগর অবধি একটা পৌর্তিক ও ভৌগোলিক ঘটনার পূর্ণাবয়ব বর্ণনাই কাহিনীটির মধ্যে পাওয়া যায়। এর বিপক্ষে আধুনিক কালে যেসব 'ঐতিহাসিক' প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয়েছে, বিশেষতঃ, বাংলা দেশের লোকসাহিত্য থেকে, সেগুলির বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধ সুদৃঢ় কোনও ভিত্তি নেই বলেই মনে হয়। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক যুগ মোটামুটি খৃ. পূ. ৩০০ অব্দ মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে আরম্ভ হলেও রামায়ণ-মহাভারতকেও অনেকে ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ ধরেন। রামায়ণের যুগ খৃ. পূ. ২।৩ হাজার বছর ধরা হয়। আর ভূতাত্ত্বিক যুগ লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে আরম্ভ হয়েছে। বস্তুতঃ উইল্‌কক্‌স সাহেবের সেচ থিওরিরও কোনও প্রয়োজন নেই। সগর রাজার ষাট হাজার সন্তানের কপিল মুনির কোপে ভস্মীভূত হওয়ার এবং ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের বিবরণ মূল সংস্কৃত কাব্যে পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায়, কৈলাস পর্বত থেকে হরিদ্বারের পথে গঙ্গাবতরণ, জহ্নু মুনির আশ্রমে গঙ্গার অবরোধ ও মুক্তি এবং ভাগীরথীর খাতে গঙ্গার সাগর-সঙ্গম নদী উন্নয়নের পৌর্তিক কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। কৈলাসের গঙ্গোত্রীর হিমবাহের কথাই মহাদেবের জটাজূটে গঙ্গার অবস্থিতির কথা, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু চমৎকার একটি প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন। গঙ্গার উৎস আবিষ্কার করে হরিদ্বারের কাছে গাড়োয়ালে কয়েকটি খাত ভগীরথের দ্বারা উন্নীত হয়েছিল। হয়তো, তার আগে গঙ্গার উৎসের গলিত তুষারের জল অপর খাতে মানস সরোবরের হ্রদের দিকে যেত। সেই খাত ঘুরিয়ে হরিদ্বারের পথে নতুন খাত সৃষ্টিই স্বর্গের মন্দাকিনীকে মর্তে আনয়নের ইতিহাস। বর্তমান সুলতানগঞ্জের কাছে জহ্নু মুনির আশ্রম বলে বর্ণিত গঙ্গাগর্ভে পাহাড়টি দেখলেও বেশ বোঝা যায়, এখানে গঙ্গা-খাতের উন্নয়নের জন্যে পৌর্তিক কাজের প্রয়োজন হয়েছিল। রামায়ণ-মহাভারতে কৃষি-কার্যের প্রয়োজনে বৃষ্টির জন্যে যজ্ঞাদির উল্লেখ আছে, কিন্তু সেচ-কার্যের জন্যে খালের উল্লেখ কোথাও নেই। বাস্তবিক নিম্ন-গাঙ্গেয় উপত্যকায় সে যুগে কৃষি-কার্যের জন্যে খালের জল ব্যবহারের কোনও প্রয়োজনই অনুভূত হবার কথা নয়। আলি, বাঁধ প্রভৃতির উল্লেখ আছে আকাশের বৃষ্টির জল কৃষিভূমিতে ব্যবহার উপলক্ষ্যে। বরং সম্রাটগণের সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিগ্বিজয় যাত্রা, অগস্ত্যের বিন্ধ্য-লঙ্ঘন ও সমুদ্র-শাসন প্রভৃতি কাহিনী আছে। যাতায়াতের সুগমতার সমস্যাই বোধ করি তাঁদের প্রধান সমস্যা ছিল। এইজন্যে গঙ্গা নদীর নাব্যতার উৎকর্ষ বিধানই ইক্ষ্বাকু বংশের রাজাদের প্রধান কাজ বলে মনে হয়। ভগীরথ ভাগীরথী খালটি গঙ্গার ধারা থেকে কেটে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ছোটনাগপুর উপত্যকায় উৎপন্ন নদীর মজাখাতগুলি অবলম্বন করে সমুদ্রের খাঁড়ির সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন, সমুদ্র যাত্রাপথের দীর্ঘতা হ্রাস করবার জন্য। পূর্ববঙ্গের সমতটভূমি দুর্ধর্ষ অনার্যদের

বাসভূমি ছিল, আর্য রাজারা ওই দেশ পরিহার করেই চলতেন। বর্তমান চব্বিশ পরগনা, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলা কপিলের রাজ্য ছিল, ভগীরথ তাঁকে সন্তুষ্ট করে তাঁর বন্ধুতার সাহায্যে পৌর্তিক কাজ শেষ করতে পেরেছিলেন। এত বড় পৌর্তিক কাজের যে মাহাত্ম্য কীর্তিত হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

বস্তুতঃ, পদ্মাকে গঙ্গার প্রধান খাত হিসাবে মেনে নিতে বৈজ্ঞানিক কোনও অসুবিধাই হয় না। ভগীরথের কাটাখাল ভাগীরথীর পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বেড়েছিল, তার প্রাচীনতার জন্যে নয়। প্রাচীন বিন্ধ্য পর্বত অথবা সিন্ধু-শতদ্রু নদেরও এত বেশী পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য দেখা যায় না। আর্য পৌর্তিক কীর্তির প্রোপাগাণ্ডার গুণে গঙ্গা-ভাগীথীর মাহাত্ম্য। এই প্রোপাগাণ্ডার জোরেই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, সে যুগের হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্র কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতির স্থান মাহাত্ম্যও বেড়েছে। পরবর্তী বৈষ্ণব যুগে বাংলা দেশে নবদ্বীপ তীর্থ হয়ে উঠেছে, তার প্রাচীনতার জন্যে নয়। সুতরাং ভাগীরথী হিন্দুর কাছে পবিত্র তীর্থ বলেই তার প্রাচীনত্ব প্রমাণ হয় না, অথবা প্রাচীন খাত বলেই তাতে পবিত্রতা সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তাও নয়। ভগীরথের পৌর্তিক কীর্তির নিদর্শন হিসেবেই, ভাগীরথীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছিল। আজও বাংলা দেশের হিন্দুদের মনের সংস্কার ভাগীরথীর মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী, এঁদের সুধী ঐতিহাসিকও এ সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারেন নি, এবং ভাগীরথীর প্রাধান্য প্রমাণ করবার জন্যে তাঁরা সকলে খুবই ব্যগ্র। কিন্তু পদ্মাকেই গঙ্গার প্রধান খাত বলে মেনে নিতে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদীর কোনও অসুবিধা হয় না।

বাংলা দেশের গঙ্গার ব-দ্বীপের উচ্চাবচকতা নির্দেশক মানচিত্র (Relief Map) দেখলে বোঝা যায়, গঙ্গা থেকে ভাগীরথীর উৎপত্তি স্থানটিই সর্বোচ্চ, এবং ভাগীরথী অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে, এর পূর্বদিকস্থ নিম্নাঞ্চলের দিকে ধাবিত হয় নি। ভগবানগোলা থেকে সুন্দরবনের বিদ্যাধরী নদীর মোহানা পর্যন্ত যদি একটি সরল রেখা টানা যায়, তা হলে এই সরল রেখার পশ্চিমের ভূভাগ ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে উঁচু হয়ে ছোটনাগপুরের মালভূমিতে মিশেছে। আর ওই সরল রেখা থেকে পূর্বে ভূভাগ ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গিয়েছে মধ্যবঙ্গে। ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি জেলা নিম্নতম ভূমিতে অধিষ্ঠিত, তারপরে ভূমি আবার পদ্মা-মেঘনার পূর্বপারে ক্রমশঃ উঁচু হয়ে ত্রিপুরা-চট্টগ্রামের পর্বতে উঠেছে। গঙ্গা পদ্মার স্বাভাবিক প্রবাহ যে নিম্নের দিকেই, বর্তমান খাতের কাছাকাছি পথ অবলম্বন করে গিয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ কি? ভাগীথীর প্রাচীনতর খাত যেখানে নির্দিষ্ট হয়, সেখান দিয়ে কাটাখাল ছাড়া স্বাভাবিক নদীর পথ সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। এ বিষয়ে আরও আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

কিন্তু পদ্মা তার খাত, বর্তমান খাতের কাছাকাছি দিয়ে যে বারবার পরিবর্তন করেছে, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলা দেশের উপর নদী-নালা এবং জলা, বিলের ছাপে। ইতিহাসেও অকাট্য প্রমাণ আছে, পদ্মার আধুনিক কালের খাত পরিবর্তনের। স্বাধীন বাংলার রাজধানী মালদহ জেলার গৌড় গঙ্গার পশ্চিম পারে প্রতিষ্ঠিত ছিল, খাত পরিবর্তনের ফলে অপর পারে চলে গিয়েছে। মালদহ জেলার কালিন্দী-মহানন্দাই গঙ্গার প্রাচীন প্রবাহ-পথ। ঢাকার কাছে ধলেশ্বরী-

বুড়ীগঙ্গার খাতে যে গঙ্গা-পদ্মার প্রধান ধারা কোনও কালে বইতো, তাতেও সন্দেহের কারণ নেই। বিশেষতঃ ব্রহ্মপুত্র বর্তমান যমুনার খাতে প্রবাহিত হ'তে শুরু করার আগে পদ্মার ধলেশ্বরী-বুড়িগঙ্গার খাতে প্রবাহের কোনও ভৌগোলিক ও জলের গতিতাত্ত্বিক বাধা ছিল না। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তিস্তা বা ত্রিস্রোতা নদী অকস্মাৎ তার পূর্বতন খাত পরিত্যাগ করে (যে খাতে নদীটি পদ্মায় এসে পড়তো) ব্রহ্মপুত্রের খাতে পড়তে শুরু করে এবং তার বিপুল বন্যার বারিরাশি ব্রহ্মপুত্রের বন্যার জলের সঙ্গে মিশে যমুনার খাতে বইতে শুরু করে দেয় গোয়ালন্দের অপর পারে। এই জলরাশির সংঘাত পদ্মাকে ক্রমশঃ আড়িয়লখাঁ বা ভুবনেশ্বর খাত সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। মহারাজা রাজবল্লভের মন্দির-প্রাসাদ প্রভৃতি কীর্তি ধ্বংস করে পদ্মা 'কীর্তিনাশা' নাম গ্রহণ করে। নিম্নাংশে পদ্মা আজও পরিবর্তনশীল। গত পঞ্চাশ বছরেই ১০০ ফুট পরিসরের আঙ্গারিয়া খাল অর্ধ মাইল প্রশস্ত পালং-নালায় পর্যবসিত হয়ে আবার সঙ্কীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

পদ্মার ভাঙনের ভয় থেকে সারার পুলেরও (হার্ডিঞ্জ ব্রিজ) নিস্তার নেই। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এই সেতু উত্তরবঙ্গের সঙ্গে কলিকাতার রেলপথে সংযোগ স্থাপন করেছিল। ১৮ বছর পরে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে পদ্মার দক্ষিণ তীরের প্রস্তর স্তূপের নদী-শাসন বাঁধ (যা নদীর জলকে শুধু সেতুর মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে নির্মিত হয়েছিল) বন্যার তোড়ে ধসে পড়তে থাকে। কয়েক কোটি টাকা খরচ করতে হয় তার মেরামতের জন্যে। তা ছাড়া সেতুর পোস্তাগুলির সংরক্ষণের জন্যে অনেক পাথর ফেলা হয়েছে নদীগর্ভে। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারত গভর্নমেন্টের সিনিয়র রেলওয়ে ইন্‌সপেক্টার লক্ষ্য করেছেন, মাত্র ২নং থেকে ৬নং পোস্তার মাঝেই নদীর গভীর খাত আশ্রয় নিয়েছে। অন্যান্য পোস্তার কাছে অগভীর জল অথবা চর পড়ে গিয়েছে। নদী-বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারেরা মনে করেন—পদ্মার সেতু ক্রমশঃ একটি ছোটখাটো ব্যারেজ-এ (barrage-বাঁধে) পরিণত হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে পদ্মার প্রবাহ মাথাভাঙা, ভৈরব প্রভৃতি নদী পুনরুজ্জীবিত করে মধ্যবঙ্গের পথে সমুদ্রে নামবে, (এই পথই পদ্মার প্রাচীনতম খাত বলে আমার বিশ্বাস)। অথবা বাম তীরে কোনও স্থানে পাড় ভেঙে উত্তরবঙ্গের চলন বিলের পথে পদ্মার নতুন প্রবাহপথ সৃষ্ট হবে আবার ধলেশ্বরী-বুড়ীগঙ্গার খাত দিয়ে।

কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, যে ইঞ্জিনিয়ারেরা উক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিযুক্ত অভিমত ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রচার করেছেন, এমন কি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে উইল্‌কক্‌স প্রস্তাবিত গঙ্গায় 'নদীয়া ব্যারেজ'-এর বিরোধিতা করেছেন পদ্মার চলনবিলের খাতগ্রহণের ভয়ে, তাঁরাই আজ ফরাক্কায় গঙ্গা-ব্যারেজের প্রস্তাবের গুণগান করছেন পঞ্চমুখে। বস্তুতঃ, উইল্‌কক্‌সের প্রস্তাবিত 'নদীয়া ব্যারেজ'-এর অবস্থান তুলনায় অনেক ভালো জায়গাতেই নির্দিষ্ট হয়েছিল, রাজশাহীর পূর্ব-দক্ষিণে প্রায় ২০ মাইল দূরে, মাথাভাঙার উৎপত্তিস্থানের নিচে। আর বর্তমানের প্রস্তাবিত ফরাক্কা ব্যারেজ পদ্মার খুব দুর্বল স্থানেই নির্দিষ্ট হয়েছে। সারাপুলের কাছে, যেখানে পদ্মার সর্বোচ্চ বন্যার জলপ্রবাহ প্রতি সেকেণ্ডে ২৫ লক্ষ ঘনফুট (২৫ লক্ষ কিউসেক), সেখানে প্রস্তাবিত ফরাক্কা ব্যারেজের অবস্থিতি স্থানের কিছু

উপরেই, রাজমহলের নিচে গঙ্গার সর্বোচ্চ বন্যা প্রায় প্রতি সেকেণ্ডে ৩৫ লক্ষ ঘনফুট জল নিষ্কাশিত করে। (সারাপুলের উপরের দিকে উইল্‌ককৃসের নদীয়া ব্যারেজ প্রস্তাবিত হয়েছিল)। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পরবর্তী এক পরিচ্ছেদে করা হবে।

ভাগীরথী-হুগলীর খাত পরিবর্তন

প্রাচীন কালে রাজা ভগীরথ যে গঙ্গা-পদ্মার প্রধান প্রবাহ থেকে গঙ্গাজল অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে ভাগীরথী খালের সংস্কার করেছেন যাতায়াতের নাব্যপথ স্থগম করবার জন্যে—এ কথা মেনে নিতে কারও আপত্তির কারণ দেখছি না। কিন্তু ভগীরথের দ্বারা সংস্কৃত খালটির প্রাচীন পথেই আজও যে বর্তমান ভাগীরথী-হুগলী প্রবাহিত হচ্ছে, তা নয়। মনে রাখা ভালো, ইংরেজ আমলে ভাগীরথীরই নিম্নাংশ, সমুদ্র থেকে জলঙ্গী নদীর সঙ্গম পর্যন্ত, হুগলী নদী নামে পরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বণিকদের কাছে হুগলী শহরের গুরুত্ব ছিল খুব বেশী। কারণ, সরস্বতীর তীরবর্তী সপ্তগ্রাম এলাকার হুগলী শহর থেকেই মুসলমান রাজত্বের ফৌজদার তাঁর শাসন পরিচালনা করতেন। মহারাজা নন্দকুমার এই হুগলীরই ফৌজদার ছিলেন।

গঙ্গা থেকে ভাগীরথী নদী পূর্বকালে বাংলার রাজধানী গৌড় নগরকে পশ্চিমে (দক্ষিণ পারে) রেখে তার প্রবাহ শুরু করেছিল। পুর্নিয়ার দক্ষিণ সীমান্ত থেকে আরম্ভ করে রাজমহল-সাঁওতাল পরগনা, ছোটনাগপুরের মানভূম, ধলভূমের নিম্নতর সমভূমি ঘেঁসে দক্ষিণে প্রায় সমুদ্র পর্যন্ত ঝিল আর নিম্ন জলাভূমিময় একটি রেখা আজও দেখা যায়। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, এই পথেই উত্তর ভাগে ভাগীরথী আর দক্ষিণ ভাগে সরস্বতী-দামোদর-রূপনারায়ণের প্রাচীন প্রবাহের খাত ছিল। এ অনুমান যদি ঠিক হয়, তা হলে ভাগীরথী নদী ভগীরথ কর্তৃক কাটা খাল বলে ধরে নিতে আপত্তি থাকতেই পারে না। পূর্বের এই ভাগীরথী তাম্রলিপ্ত বা তাম্বোলি বন্দরের পার্শ্বেই প্রবাহিত হত। টলেমি, মেগাস্থিনিস প্রভৃতি এর মোহানার উল্লেখ করেছেন। পরে ভাগীরথীর পরিত্যক্ত নিম্ন পথটি সরস্বতী নামে পরিচিত হয়, ত্রিবেণী গ্রামের কাছ থেকে। এই গ্রাম থেকেই অধুনা বিলুপ্ত যমুনার খাত পূর্বে-দক্ষিণে প্রবাহিত হত। তাম্রলিপ্ত বন্দর বহু যুগ পর্যন্ত সরস্বতীর খাত-পথে ও উত্তরে ভাগীরথীর খাত-পথে উত্তর ভারতের বহির্বাণিজ্যের দ্বাররূপে কাজ করে এসেছে। ইতিহাস, পুরাণ ও লোককাব্যের পাঠকগণের কাছে এ কথা খুবই স্থবিদিত। সমৃদ্ধিশালী উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় ও তাম্বোলি রাজ্যের সে যুগে উন্নতির প্রধান কারণ এই তাম্রলিপ্ত বন্দর। আজকের দিনের পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা বন্দরের মত।

ত্রিবেণীর কাছ থেকে আর একটি নদী চব্বিশ পরগনা জেলার পূর্ব অংশ দিয়ে দক্ষিণ-পূর্বে সমুদ্রে মিশতো—তার নাম ছিল যমুনা। পঞ্চদশ শতাব্দীতেও এই 'যমুনা বিশাল অতি'। এই ত্রিবেণী তাই মুক্তবেণী—গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীকে তিন দিকে মুক্ত করে দিয়েছিল। ছোটনাগপুরের উপত্যকার প্রাচীনতর নদীর খাত ধরেই যে এই যমুনার ধারা বইতো, তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ

পাওয়া যায়। 'গঙ্গা' অর্থাৎ পরিবর্তিত খাতের ভাগীরথী তখন কলিকাতার পথে চলতে শুরু করেছে এবং কালীঘাটের আদি গঙ্গার (Tolly's Nulla) পথে সোনারপুর-বারুইপুর দিয়ে সাগরে মিশছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই আদিগঙ্গার পথে দক্ষিণে গিয়ে রূপনারায়ণের মোহানা ধরে তমলুকের গড়মন্দিরে পূজা করে উড়িষ্যার সড়ক ধরে পুরীর তীর্থে পৌঁছেছিলেন। ক্রমশঃ আদিগঙ্গা মজে আসে। ওদিকে সরস্বতীর উত্তর অংশও মজে আসে। ইউরোপীয় বণিকদের সুবিধার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে (নবাব আলিবর্দির আমলে) বর্তমান বটানিকাল গার্ডেনের কাছে (হাওড়ার বেতড়ের পাশে) হুগলী নদী আর সরস্বতীর সংযোগপথটি আবার কেটে সুসংস্কৃত করা হয়। আজও হুগলী এই পথে প্রবাহিত।

ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, মহানন্দা, কুশী প্রভৃতি উত্তরবঙ্গের নদীর খাত পরিবর্তন

'ব্রহ্মপুত্র মহাভাগো শান্তনু কুলনন্দন'—মন্ত্রটির মধ্যেই ব্রহ্মপুত্র নদীর ইতিহাস রয়েছে,—তার 'শান্তনু-পুত্র' অর্থাৎ তিব্বতের 'শান্‌-পো'র সঙ্গে সংযোগের ইতিহাস।

ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, এই শান্‌-পোর সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের সংযোগ ভূতাত্ত্বিক বর্ষ হিসেবে মোটেই প্রাচীন নয়। কারণ শান্‌-পো-ব্রহ্মপুত্রের সংযুক্ত বিপুল জলরাশি যদি বহু প্রাচীনকাল থেকে বয়ে আসতো, তা হলে আসাম রাজ্যকে আমরা বর্তমান ভৌগোলিক উচ্চতায় পেতাম না।

পূর্বেকার ব্রহ্মপুত্র মাত্র আসাম অঞ্চলের অববাহিকার জল নিয়েই প্রবাহিত হত, আর তখন তার খাত ধুবড়ীর কাছে দক্ষিণাভিমুখী বাঁক নেয় নি, অনেক পশ্চিমে এসে প্রায় দিনাজপুর-মালদহ জেলায় পৌঁছেছিল। শান্‌-পোর সঙ্গে সংযোগের পরবর্তী যুগেই ব্রহ্মপুত্র খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পর্বতমালাকে পশ্চিমে দক্ষিণে বেষ্টন করে শীতলক্ষ্যার খাতে গঙ্গা-পদ্মার সঙ্গে মিশতো। নিকটেই সমুদ্র ছিল তখন এবং চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থিতি বর্তমান অবস্থিতি থেকে অনেক উত্তরে ছিল বলেই ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন। পূর্ববঙ্গের ঢাকা, বরিশাল, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট 'সমতট'-ভূমি নামে প্রসিদ্ধ। এখানকার ভূপৃষ্ঠ সমুদ্রজলপৃষ্ঠ থেকে বিশেষ উঁচু ছিল না। হালে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উঠেছে, আজও এ অঞ্চলের উচ্চতা অতি সামান্যই এবং বঙ্গোপসাগরের জোয়ারের বন্যা ও ঘূর্ণাবর্তের প্রকোপে এ অঞ্চল আজও জর্জরিত হয় মাঝে মাঝে।

বিহারের কুশী নদী পূর্বকালে আরও পূর্ববাহিনী ছিল এবং উত্তরবঙ্গের আত্রেয়ী নদীর সঙ্গে এককালে মিশতো। সে সময়ে তিস্তা নদীও তাদের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এই কুশী-আত্রেয়ী-তিস্তার সংযুক্ত প্রবাহ একসঙ্গে পদ্মায় পড়তো। মাত্র ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তিস্তা অনেক উত্তরে, খাসিয়া পর্বতের পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রে এসে মিশেছে। আর তারপর থেকেই ব্রহ্মপুত্র 'যমুনা'র খাতটি গ্রহণ করে গোয়ালন্দের অপর পারে পদ্মায় তার বিপুল জলরাশি ঢালতে শুরু করেছে।

মহানন্দা ও কুশী ক্রমশঃ পশ্চিমে সরে গিয়েছে, আর ছেড়ে গিয়েছে সমস্ত উত্তরবঙ্গ ও বিহারে অসংখ্য 'ধার' বা খাত। প্রবল বন্যায় এইসব খাত পুনরুজ্জীবিত হয়ে প্রলয় সৃষ্টি করে প্রায়ই।

গঙ্গার ব-দ্বীপের নদী

পশ্চিমে ভাগীরথী-হুগলী, উত্তরে আর পূর্বে পদ্মা-মেঘনা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, এই ত্রিভুজাকৃতি ভূখণ্ডই গঙ্গার ব-দ্বীপ। আয়তনে এত বড় এবং এত সমতল ব-দ্বীপ গঙ্গা ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও নদীরই নেই।

গঙ্গার ব-দ্বীপের নদীগুলির খাত পরিবর্তন প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বর্তমানে এদের অধিকাংশেরই গঙ্গা-পদ্মার সঙ্গে সংযোগ প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মাথাভাঙা নদীর পদ্মার নিকটে মাথাভাঙা, তাই বুঝি এই নামকরণ হয়েছে। অতি আধুনিক কালেই কলিকাতার কাছে বিদ্যাধরী ক্রমশঃ মজে আসছে। এই সেদিনও মাতলা অতি বিশাল নদী ছিল, তার খাতও ভরাট হয়ে আসছে। ইচ্ছামতীর উপর অংশেরও সেই অবস্থা। সুন্দরবন অঞ্চলে, সমুদ্রের জোয়ারের জলে নিম্নাংশে এদের জীবন রক্ষা পেয়েছে। এইসব নদীর জীবনরক্ষা আজ ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে মহা সমস্যা। ভাগীরথী-হুগলী নদী এদিক দিয়ে এদেরই স্বগোত্র।

মুর্শিদাবাদ-নদীয়া জেলার জলঙ্গী, ভৈরব, মাথাভাঙা, চূর্ণী প্রভৃতি নদী ভাগীরথীতে মিশেছে। একদিন এই ভৈরব তার স্বনামের গৌরব রক্ষা করতো, মহাপরাক্রান্ত নদ হিসেবে, আজ সামান্য একটি প্রণালী মাত্র। বছরের মধ্যে প্রায় ১০।১১ মাস এদের পদ্মার সঙ্গে সংযোগ না থাকায় এরা প্রায় মজে এসেছে। এদের ক্ষীণ খাতে আজ আর এ অঞ্চলের বৃষ্টির জলও এরা ভালো করে বহন করে নিষ্কাশন করতে পারছে না। কাজেই এ অঞ্চলে নদীতে জলাভাব আর জমিগুলি জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। পূর্ববঙ্গের যশোহর জেলারও এই একই অবস্থা। নদীর এই বৈজ্ঞানিক দিকগুলো আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করবো। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পঞ্চদশ শতাব্দীতেও ত্রিবেণীর নিকট থেকে বহির্গত যে 'যমুনা বিশাল অতি' নদী ছিল, আজ তার খাতের চিহ্ন খুঁজে বার করাও জরিপ-ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষে শক্ত। ওদিকে পূর্ববঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীতেও আজকের সুবিশাল গড়াই নদের অস্তিত্বই ছিল না।

ভাগীরথী-হুগলীর পশ্চিম পারের নদ-নদীর খাত পরিবর্তন

সরস্বতী ছাড়া, ভাগীরথী-হুগলীর পশ্চিম পারের সব নদ-নদীই পশ্চিমে ছোটনাগপুরের মালভূমিতে জন্ম নিয়েছে। মজা সরস্বতীর ক্ষীণ খাতই শুধু আজ হুগলী শহরের উত্তরে, ভাগীরথী-হুগলী থেকে বেরিয়ে আবার হুগলী নদীতেই এসে মিশেছে, কলিকাতার কিছু দক্ষিণে। অথচ পূর্বে, এমন কি ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতেই হুগলী নদীর চেয়ে এই সরস্বতীর খাতই প্রশস্ততর ও গভীরতর ছিল। ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকদের জাহাজ এই সরস্বতী বেয়েই ত্রিবেণী ঘুরে কাশিমবাজার, ব্যাণ্ডেল, হুগলী, চন্দননগর, শ্রীরামপুরে পৌঁছেছিল ষোড়শ শতাব্দীতে। তারপরে সম্ভবতঃ সরস্বতীর উপরের অংশ বিশেষভাবে মজে আসতে থাকে, কাজেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে, মোটামুটি ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সরস্বতীর নিম্নাংশের সঙ্গে কলিকাতার নদীটির (ভাগীরথী-হুগলী) সংযোগের উন্নতি সাধন করা হয়, পূর্বেকার মজাখাতে খাল কেটে। (এই 'খাল

কাটা'র ঘটনা থেকেই ইংরেজরা 'ক্যাল কাট্টা'—Calcutta—নাম দিয়ে সমসাময়িক সময়ে কলিকাতার পত্তন করেছে কিনা কে জানে)? ইতিপূর্বেই এ পথে ইউরোপীয় বণিকের জাহাজ যাতায়াত শুরু করেছিল। এর পর থেকেই সরস্বতীর পথ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয় এবং ক্রমে তার বর্তমান দুরবস্থা হয়ে যায়। তার নিম্নাংশ আজ (কলিকাতার দক্ষিণ থেকে সাগর অবধি) ভাগীরথী-হুগলীর নামে বেঁচে রয়েছে, প্রধানতঃ সমুদ্রের জোয়ারের আর দামোদরের বন্যার সহায়তায়। অবশ্য, পূর্বেই বলেছি, এই পথেই পূর্বতনকালে ভাগীরথীর আদি পথ ছিল, তার আদিগঙ্গার পথ ধরবার আগে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভগীরথের যুগ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলায় সাগরগামী এই নাব্য পথটি সমস্যাসঙ্কুল হয়েই রয়েছে। আজ আবার দামোদরের উচ্চ এলাকার বন্যা নিরোধের ফলে এই নাব্যপথ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে অদূর ভবিষ্যতে।

ছোটনাগপুরের মালভূমিতে উৎপন্ন নদ-নদীর প্রধানগুলির নাম মৌর বা ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দ্বারকেশর-রূপনারায়ণ, কাঁসাই-হলদি ও সুবর্ণরেখা। অপর নদীগুলি হয় এই সব প্রধান নদীর উপনদী নতুবা তাদের শাখা অথবা পরিত্যক্ত খাত। এক দামোদরেরই অনেকগুলি পরিত্যক্ত খাত রয়েছে। এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই দামোদর নিম্নাংশে প্রধানতঃ রূপনারায়ণের খাতের নিম্নাংশ ধরেই প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। দামোদরের পরিত্যক্ত খাত 'কানা' নদীগুলি স্থানীয় জনস্বাস্থ্যের উপর এক দুর্বিষহ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

পূর্বেই বলেছি, ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গের এই নদীগুলি এবং মহানন্দা ও তিস্তা প্রভৃতি 'প্রথম শ্রেণী'র নদী। কারণ, এদের জলশক্তিকে সহজেই জল-বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করা সম্ভব।

এক দামোদর ছাড়া, ময়ূরাক্ষী, অজয় প্রভৃতি ছোটনাগপুরের নদী বিশেষ খাত পরিবর্তন করে না অথবা বড় প্লাবনও সৃষ্টি করে না। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে রাস্তা, রেলপথের বাঁধের প্রাচুর্যে অজয় প্রভৃতির অববাহিকায় প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। তাই এরা এবং দামোদরের কয়েকটি পরিত্যক্ত খাত অত্যন্ত ক্ষীণকায় হয়ে গিয়ে অত্যন্ত সর্পিল পথ নিয়েছে। ময়ূরাক্ষী, অজয় ও পূর্বেকার বেহুলার পথের দামোদর তাদের বন্যার জলের সংঘাত দিয়ে ভাগীরথী নদীকে ক্রমশঃ পূর্ব দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে। পূর্বেই বলেছি, ভগীরথের ভাগীরথী পত্তনের পূর্বে এই সব নদী বাংলা দেশে আরও পূর্ব দিকে প্রবাহিত হত।

ছোটনাগপুর উপত্যকায় উৎপন্ন নদীগুলির মধ্যে দামোদর বহুদিন ধরে জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করে আসছে। এই সব নদীগুলি সকলেই কম বেশী দুর্দান্ত প্রকৃতির। অর্থাৎ বর্ষায় অববাহিকার জলে স্ফীত হয়ে নিম্নাংশে এরা কমবেশী কূল প্লাবিত করে। দামোদরের নিম্নাংশ হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ সমভূমি, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতাও বেশী নয়, উপরের উচ্চ পার্বত্য-থেকে তাই বর্ষায় স্ফীত দামোদর হুড় হুড় করে নেমে দুকূল ভাসিয়ে দিত। পাড়ে সমান্তরাল বাঁধ (embankment) দিয়ে বন্যার কবল থেকে জনপদ রক্ষা করবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সে বাঁধও মাঝে মাঝে ভেঙে যেত। সম্প্রতি

'দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা' রূপ পরিগ্রহ করছে। পৃথক পরিচ্ছেদে আমরা তার আলোচনা করবো।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনাও রূপ গ্রহণ করছে। কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা পরিকল্পনারও জল্পনা-কল্পনা শোনা যাচ্ছে। ঠিক এমনি উত্তরবঙ্গের তিস্তা নদীরও মাপজোক হচ্ছে এবং জলঢাকা নদীর মাপজোকের কাজ শেষ হয়েছে।

আমার মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশের সমস্ত নদীগুলির মধ্যে দামোদরের প্লাবনের প্রধান কারণ তার উচ্চ উপত্যকার আয়তন অপেক্ষাকৃত বড়। আর এই অববাহিকা অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের জল এ অঞ্চলকে ভীষণ ভাবে ক্ষয় করে আর শিলা, বালি, মাটি বহন করে নামায়। এই বাহিত শিলা, বালি, পলি দামোদরের মধ্য ও নিম্ন প্রবাহে, তার ঢালের বিশিষ্টতার জন্যে, সহজেই অবক্ষেপিত হয়ে এই অংশে দামোদরের গর্ভকে ক্রমশঃ এত উঁচু করেছে। প্রত্যেক প্লাবনের পরে, এই পলি অবক্ষিপ্ত হয়ে দুই পাড়ে স্বাভাবিক সমান্তরাল বাঁধ (levee) সৃষ্টি করেছে (পরে মানুষ সে বাঁধ আরও দৃঢ় করেছে, দামোদরের গর্ভ উচ্চতর ও বন্যার উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে)। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দামোদরের দক্ষিণ তীরের বাঁধ (embankment) ভেঙে দেওয়ার পরে আবার স্বাভাবিক উপায়ে বাম তীরের বাঁধের সমান উঁচু বাঁধ গড়ে উঠেছে সেখানে। ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করে বেশ বোঝা যায়, মানুষে বাঁধ না দিলেও, দামোদরের ঢালের ও উচ্চ অববাহিকার ক্ষয়প্রবণতার জন্যে, মধ্য ও নিম্নপ্রবাহে দামোদর স্বাভাবিক ভাবেই তার গর্ভ উঁচু করতো। 'মানুষে বাঁধ দেওয়ার ফলে দামোদরের গর্ভ উঁচু হয়েছে'—এ ধারণা ভুল। এর প্রতিকারের একমাত্র উপায় ছিল দামোদরের উচ্চ উপত্যকায় অববাহিকা অঞ্চলে বৃষ্টির জল দ্বারা ভূমির ক্ষয় নিবারণ করা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নদী সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা

নদীর সৃষ্টি

ভূগোলের ছাত্র মাত্রই জানেন, পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের শতকরা ৭১.৪ ভাগই সমুদ্রের জল (১৪ কোটি ১০ লক্ষ বর্গমাইল) আর শতকরা ২৮.৬ ভাগ মাত্র (৫ কোটি ৫৫ লক্ষ বর্গমাইল) স্থল।

সূর্যের উত্তাপে পৃথিবীর এই সমুদ্রের জল (এবং তার নদী, হ্রদ, আর্দ্রভূমি ও বস্তু, গাছপালার জলও) কেবলই বাষ্পে পরিণত হচ্ছে। আর যেহেতু বাষ্প বায়ুর চেয়ে ওজনে হালকা, সেইজন্যে বাষ্প উপরে উঠে বায়ুর সঙ্গে মিশছে। অপর দিকে আবার বায়ুর চাপ ও উত্তাপ পরিবর্তনের সঙ্গে এই বাষ্প পুনরায় জলকণায় পরিণত হচ্ছে। উচ্চ পর্বতের মাথায় এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর হিমমণ্ডলে এই জল জমে তুষার ও বরফে পরিণত হয়। কোথাও বা কুয়াসার সৃষ্টি করে, শিশিরের সৃষ্টি করে, আবার কোথাও বা মেঘ হয়ে উড়তে থাকে এবং সময়ে সময়ে বৃষ্টিরূপে পড়তে থাকে।

পৃথিবীর বার্ষিক গতি অনুযায়ী সূর্যের উত্তাপের প্রবলতায় গ্রীষ্মপ্রধান মাসগুলিতে পর্বতশৃঙ্গের তুষার আবার গলে যায় আর জলে পরিণত হয়ে ঝরনার আকারে নামে, হিমবাহ আকারে তুষার পর্বতের সানুদেশ অবলম্বন করে নেমে এসে উত্তপ্ততর অংশে প্রবেশ করে জলে পরিণত হয়েও ঝরনার আকারে নামে। এই জলের কতকাংশ, বিশেষতঃ পৃথিবীর উচ্চ পার্বত্য ও বন্য অঞ্চলে, আবার শিলার ভিতরে প্রবেশ করে, কিছু অংশ আবার বাষ্পে পরিণত হয়। এইভাবে একটা নৈসর্গিক চক্র ঘুরছে।

উচ্চতর পার্বত্য অংশের যে জল শিলার ভিতর প্রবেশ করে, তার কিছুটা, প্রাকৃতিক জলশক্তির নিয়ম অনুযায়ী, নিম্নতর অংশে সুবিধা পেলে প্রস্রবণের আকারে বেরিয়ে আসে। এই প্রস্রবণের স্রোতধারা মিলিত হয়ে নদীর সৃষ্টি হয়। যে জল মেঘ থেকে বৃষ্টিরূপে অথবা কুয়াসা শিশির জমে পাহাড়ের গায়ে নামে, তারাও প্রস্রবণ সৃষ্টি করে অথবা সরাসরি নদীর জল বৃদ্ধি করে। কোথাও পর্বতশৃঙ্গের তুষারগলা জল সেই সব স্রোতধারার সঙ্গে সোজাসুজি মিশে নদীর জলের পুষ্টি বৃদ্ধি করে, কোথাও পর্বতমালায় ঘেরা নিম্নতর ভূমি জলে ভরে হ্রদের সৃষ্টি করে (যেমন মানস সরোবর) এবং সেই হ্রদের জল উপচিয়ে নদীতে এসে পড়ে (যেমন সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র)। একটা নিম্নতম হারের বেশী বৃষ্টিপাত হলেই, আর জল শিলার মধ্যে প্রবেশ না করে সোজাসুজি নদীতে এসে পড়ে।

পার্বত্য অঞ্চলে, হিমবাহ, প্রস্রবণ অথবা হ্রদ যেখান থেকে নদীর উৎপত্তি, তাকেই নদীর উৎস বলে। গঙ্গার উৎস গঙ্গোত্রী হিমবাহ ('মন্দ' অর্থাৎ

ধীরে ধীরে বয় বলে এরই নাম স্বর্গের 'মন্দাকিনী'), দামোদরের উৎস খামারপাৎ পাহাড়ের প্রস্রবণ, আর ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধুর উৎস মানস সরোবর হ্রদ। এইরূপে উৎপন্ন অনেকগুলি ছোট ছোট নদী বড় নদীতে এসে মিলিত হয়ে বড় নদীর আয়তন আরও বৃদ্ধি করে। এই ছোট ছোট নদীগুলিকে মূল নদীর উপনদী বলে।

সকলেই জানেন, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষের ফলে সকল জিনিসই উপর থেকে নিচের দিকে নামে। কাজেই নদীও উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল থেকে ক্রমশঃ নিচে নেমে এসে ক্রমোনিম্ন ভূমি দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত নিম্নতম স্থানে এসে পৌছায়। উপনদীগুলির ক্ষেত্রে এই নিম্নতর স্থান মূল নদী। মূল নদীর শেষ আশ্রয় কোনও কোনও ক্ষেত্রে হ্রদ। যেমন, আফ্রিকার চাদ হ্রদে দু-একটি নদী পড়েছে এবং মধ্য এশিয়ার কাস্পিয়ান সাগর হ্রদেও কয়েকটি নদী এসে পড়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পৃথিবীর নিম্নতম অংশ সমুদ্রের জলেই নদ-নদীরা তাদের শেষ আশ্রয় গ্রহণ করে।

কিন্তু নদী শুধু জলই বহন করে আনে, এ ধারণা মনে বদ্ধমূল হয়ে গেলে, ভুল হবে। নদী তার জলের পরিমাণ ও প্রবাহের গতি অনুযায়ী—আর উৎস প্রদেশের অববাহিকার শিলার গুণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী পাথর, কাঁকর, নুড়ি, মোটা দানা বালি, মিহি বালি, মাটি, গাছপালা প্রভৃতিও বহন করে নামিয়ে আনে। তা ছাড়া তার জলের সঙ্গে মিশে যায় অনেক দ্রাব্য রাসায়নিক পদার্থ, সাধারণ লবণ প্রভৃতি। সজীব জলচর মাছ প্রভৃতিও নদীর জলের সঙ্গে যাতায়াত করে। নানা জীবাণুও নদীর জলে থাকতে পারে। 'বন্যা-নিয়ন্ত্রণ' প্রভৃতি সম্বন্ধে ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে নদীবাহিত পাথর, কাঁকর, নুড়ি, বালি, পলির গুরুত্বই বেশী।

পাথর, কাঁকর, নুড়ি, মোটাদানা বালি প্রভৃতি নদীর প্রবাহের গতি অনুযায়ী তার গর্ভের পথে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে, কিছুদূর পর্যন্ত আসতে পারে আর নদীর তলাতেই, গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করে তার প্রবাহের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। অপেক্ষাতর কম ঢালের ভূমিতে প্রবাহের সময়ে নদীপ্রবাহের গতি আরও কমে যায়, তখন কিছু কিছু মোটা ও মিহি বালি এবং মাটি পলির আকারে জমা হতে থাকে। আরও মিহি বালি ও সূক্ষ্মতর মাটি আরও নিচের সমতল ভূমির দিকে যায় আর নিম্নভূমি অঞ্চলে নদীর গর্ভে সঞ্চিত হতে থাকে। বন্যার সময়ে, জল উপচিয়ে কূল প্লাবিত করলে, এই পলির কিয়দংশ দুই পাড়ে জমা হবার সুযোগ পেয়ে একপ্রকার স্বাভাবিক সমান্তরাল বাঁধের সৃষ্টি করে (levee)।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিহি বালি ও পলিমাটিকে নদী সমুদ্র বা হ্রদ পর্যন্তই বহন করে নিয়ে যায়। বিশেষতঃ বর্ষাকালে, বৃষ্টির জল ভূপৃষ্ঠ ক্ষয় করে অনেক মাটি নদীতে এনে তার জল ঘোলা করে এবং নদীবাহিত সেই মাটির বহুলাংশ সমুদ্রে আশ্রয় পায়।

নদীবাহিত যে পলি শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে মোহানা পর্যন্ত পৌছায়, সেই পলি সমুদ্রের কিছু দূর পর্যন্ত গর্ভে জমা হয়ে উঁচু হতে থাকে আর শেষ পর্যন্ত সমুদ্র-পৃষ্ঠের সমান উঁচু হয়। তখন নদীর গতিপথ সেখানে ব্যাহত হতে থাকে এবং নদী অন্যপথ কাটতে চেষ্টা করে শাখা-নদীর সৃষ্টি করে। এ দিকে অবিরত পলি আমদানির ফলে নদী ও শাখা-নদীর মধ্যেকার ভূমি উচ্চতর হতে

থাকে—এই মধ্যেকার ভূমিই নদীর ব-দ্বীপ। এই ব-দ্বীপ সৃষ্টির কথা আরেক পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে। সমুদ্রের জোয়ার-ভাটাও ব-দ্বীপ সৃষ্টির কাজে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

নদীর অংশ বিভাগ

নদীপ্রবাহের চরিত্র অনুযায়ী যে কোনও বড় নদীকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (১) উর্ধ্ব বা পার্বত্য প্রবাহ, (২) মধ্য বা সমভূমি প্রবাহ, এবং (৩) নিম্ন বা ব-দ্বীপ প্রবাহ।

উর্ধ্ব বা পার্বত্য প্রবাহ

নদীর উৎস থেকে পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশ পর্যন্তই নদীপ্রবাহের উর্ধ্ব প্রবাহ। দামোদর নদের উৎস খামারজাৎ (পালামৌ জেলার টোরির নিকট) পাহাড় থেকে আসানসোলের নিকট বরাকর নদের সঙ্গমস্থলের কাছাকাছি অবধি অংশই দামোদরের উচ্চাংশ। তিব্বতের মানস সরোবর থেকে সমস্ত শান্‌-পো ও আসামের সদিয়ার কাছে ডিহং নদী পর্যন্তই ব্রহ্মপুত্রের উচ্চাংশ। গঙ্গোত্রীর হিমবাহ থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত অংশই গঙ্গার উর্ধ্ব প্রবাহ।

এই উর্ধ্বপ্রবাহে বা উচ্চাংশে নদী নাব্য নয়। কোনও কোনও নদীতে বৎসরের কয়েকমাস উচ্চাংশে খুবই কম জল থাকে। তা ছাড়া জলের গতির অত্যন্ত তীব্রতা এবং মাঝে মাঝে শিলার প্রতিবন্ধক, জলপ্রপাত প্রভৃতিও নদীর উচ্চাংশের সাধারণ প্রকৃতি।

জলের প্রবল বেগ, উর্ধ্ব থেকে পতনের আঘাত তার আপেক্ষিক নির্মলতার জন্যে অত্যধিক দ্রাবকশক্তি, ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় এই অংশে নদী প্রচুর শিলা ক্ষয় করে, পাথর, নুড়ি, বালি ভাসিয়ে ঠেলে নামায়। অপেক্ষাকৃত কোমল শিলাস্তর কেটে গভীর খাত সৃষ্টি করে, এইরূপ দুই দিকে উঁচু পাহাড়ের খাতের নদীকে গিরিখাত (gorge) বলে। আমাদের তিস্তা নদীর গিরিখাত সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলে একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য।

আবার নদীস্রোত ভূপৃষ্ঠের কঠিন শিলাস্তর থেকে কোমল শিলাস্তরের উপর প্রবাহিত হবার সময়ে কোমল স্তরটি অধিক ক্ষয়িত হয়। কঠিন স্তর উঁচু থেকে যায়। কোমল স্তরের ক্ষয়াবশিষ্ট অংশ ক্রমশঃ আরও ক্ষয়িত হয়ে নিচু হতে থাকে আর নদীর জল তখন প্রবল বেগে উপর থেকে নিচে পড়ে আর জলপ্রপাতের (waterfall) সৃষ্টি করে। এই সব স্বাভাবিক জলপ্রপাতের অবস্থিতি স্থানেই খুব সহজে ছোট ছোট জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা করা যায়। নায়াগ্রার জলপ্রপাতের কাছে জলবিদ্যুৎ ঘাঁটি প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষে কাবেরীর জলপ্রপাতের কাছে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

ভূত্বকে ফাটল (fault) দেখা দিলেও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে জলপ্রপাতের সৃষ্টি হতে পারে।

নদীর মধ্য বা সমভূমি প্রবাহ

পার্বত্য উচ্চভূমি থেকে নেমে সমভূমির উপরে চলবার অংশটুকুই নদীর মধ্য বা সমভূমি প্রবাহ। বরাকরের সঙ্গম থেকে বর্ধমান শহরের নিকট কিছুদূর পর্যন্ত

(যেখানে ভূপৃষ্ঠ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০০ ফুট উঁচু) দামোদরের সমভূমি প্রবাহ। হরিদ্বার থেকে রাজমহল অবধি গঙ্গার এই অবস্থা। সমস্ত আসাম প্রদেশে আর পূর্ববঙ্গে মৈমনসিংহ জেলার উত্তর সীমানা পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের মধ্য প্রবাহ। এই অংশে নদীতে প্রবাহ বেগ উচ্চাংশের চেয়ে কমে যায়, তার ক্ষয়ক্রিয়াও অনেকটা কমে যায়। বহু যুগ ধরে নদী স্থির খাতে (fixed regime) বইতে পারে এই সমভূমি প্রবাহে। বন্যার বাড়তি ও কমতির ফলে দুই কূলে আর গর্ভে শিলা, বড় বড় দানার বালি আর কাদা জমে পলিভূমি (alluvial plain) গড়ে উঠতে থাকে। বৃষ্টির জল আবার এই অঞ্চলের মাটি ক্ষয় করে নদীতে এনে ফেলে। মিহি বালি ও মাটির কণিকা কিন্তু সমুদ্রাভিমুখে বাহিত হতে থাকে। দামোদর সাধারণতঃ তার উৎস-দেশের বর্ষার বৃষ্টির উপরে নির্ভরশীল, অন্য সময়ে ভূগর্ভের জল সামান্যই দামোদর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাই জলের গভীরতা থাকে না এবং এ অংশে দামোদর নাব্য নয়। তা না হলে অন্যান্য নদ-নদী (যাদের উৎস বিশেষতঃ তুষারের হিমবাহে) এই মধ্য অংশে সচরাচর নাব্য। দামোদরের ঢালের বিশেষত্বের জন্যেই এই অংশে এবং এর নিচে কিছুদূর পর্যন্ত প্রচুর বালি, পলি অবক্ষেপিত হয়ে গর্ভ ক্রমশঃ উঁচু হয়েছে।

এই মধ্যপ্রবাহে ভূপৃষ্ঠের উঁচু নিচু স্থানে প্রতিরোধ পেলে নদী বেঁকে যায়। বাঁক ঘোরবার সময়ে নদীর যে কূল বাইরের দিকে, সেইখানে শ্রোতের আঘাত পড়ে বেশী (centrifugal force)। তাই সেই অংশের পাড় ভাঙতে থাকে এবং গর্ভ গভীরতর হতে থাকে। বিপরীত তটে স্রোতের বেগ কম, সেখানে তলানি জমে চর পড়ে। এমনিভাবে বাঁক ক্রমশঃ ছোট আয়তন থেকে বৃহত্তর হতে থাকে। ছোট বাঁকটির ব্যাসার্ধ কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই নদীর খাতের প্রশস্ততার চেয়ে ছোট হয় না। জলের পদার্থতাত্ত্বিক প্রকৃতি (physical properties of water) এর জন্যে দায়ী। নদীপ্রবাহ গতিতত্ত্বের এই নিয়মটি বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে নদী-শাসনের কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

নদীর বাঁক বড় হতে হতে বৃত্তাংশ থেকে নদী ক্রমশঃ বৃহত্তর বৃত্তের আকার ধারণ করে—অনেকটা ঘোড়ার পায়ের নালের মত। যখন দুই দিকের মধ্যবর্তী স্থান খুব ছোট হয়ে আসে, তখন সেই সঙ্কীর্ণ ব্যবধান ভেদ করে (সাধারণতঃ বর্ষার বন্যার সময়ে) নতুন সোজা পথ সৃষ্টি করে নিতে নদীর অসুবিধা থাকে না। পুরাতন খাত তখন অশ্ব-খুরাকৃতি হ্রদে (horse-shoe lake) পরিণত হয়। গঙ্গা এবং উত্তরবঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় এই রকম অনেক জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছে। প্রবল বন্যায় যখন নদীর খাতে জল ধরে না, তখন উপচানো জল এই সব জলাভূমিতে (spill area) আশ্রয় গ্রহণ করে আর পলি পাতিত করে ক্রমশঃ তাদের উঁচু করতে চেষ্টা করে। উত্তরবঙ্গের অনেক বিল এইরূপ জলাভূমি। ভাগীরথীর তীরে এদেরই নাম 'ঝিল' (সিরাজ-উদ্-দৌলার মুর্শিদাবাদের 'মোতি-ঝিল')। সুন্দরবনের কাছে এরাই 'বাওড়' আর 'বাদা'।

নদীর নিম্ন বা ব-দ্বীপ প্রবাহ

মোহানার কাছাকাছি স্রোতের বেগ যখন খুব কমে যায়, তখনই নদীর এই প্রবাহ। এই অংশে প্রথম থেকেই নদী শাখা ছাড়তে আরম্ভ করে। সমুদ্র থেকে

আরও ভূমি উঠিত করে নিয়ে শাখাগুলি আবার প্রশাখা বিস্তার করে। তাদের কোনটি আবার মজে যায় ক্রমশঃ। এমনিভাবে ব-দ্বীপ এলাকা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

রাজমহল থেকে সমুদ্র অবধি গঙ্গার ব-দ্বীপপ্রবাহ। তেমনি যমুনা-ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম থেকে নিম্নাংশ ব্রহ্মপুত্রের নিম্নপ্রবাহ। বর্ধমান থেকে রূপনারায়ণ-হুগলীর সঙ্গম পর্যন্ত দামোদরের নিম্নপ্রবাহ।

ব-দ্বীপপ্রবাহে স্রোতের বেগ অত্যন্ত কম বলে নদীবাহিত বালি ও কাদামাটি জমে জমে নতুন ভূমি সৃষ্টির কাজ দ্রুততর। ঐ ভূমি জীবন্ত ব-দ্বীপ অঞ্চলে (active delta) ক্রমশঃ বছরে বছরে উঁচু হয়ে ওঠার কথা—মানুষের ক্রিয়াকলাপে আর জনপদ গড়ে ওঠার তাগিদে গঙ্গা ও দামোদরের ব-দ্বীপে এ স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে যেখানে জমি ক্রমশঃ উঁচু হয়ে ওঠে, সেখানে নদীস্রোত তার দুই পাশে প্রবাহিত হয়ে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়। পরবর্তী পরিচ্ছেদে ব-দ্বীপ সম্বন্ধে আরও বিশদ আলোচনা হবে, কারণ বাংলা দেশের অধিকাংশ ভূভাগই ব-দ্বীপ অঞ্চল।

নদীর দ্বারা গঠিত নতুন জমি সাধারণতঃ মাত্রাহীন 'ব'-এর আকার ধারণ করে বলেই এই ভূমির ব-দ্বীপ নামকরণ হয়েছে। এই 'ব'-এর একদিকে সমুদ্রের জল আর দুই দিকে নদীপ্রবাহের জল, তার মাঝের জমিটুকু 'দ্বীপ'। গ্রীক অক্ষর Δ (ডেল্‌টা)-র আকার বলেই মিশরের নীল নদের ব-দ্বীপের প্রথম ডেল্‌টা (delta) নামকরণ হয়েছিল। তারপর থেকে ভূগোলশাস্ত্রবিদেরা ওই নামটি সকল নদীর নিম্নাংশের ভূভাগেই ব্যবহার করছেন। কিন্তু সকল নদীর নিম্ন অঞ্চলই ওই রকম Δ-র আকার ধারণ করে না, অন্য আকৃতিও নেয়। মিসিসিপি নদীর ব-দ্বীপ পাখির পায়ের ছাপের মত, তাই তার নাম bird's foot delta.

উর্ধ্বপ্রবাহে নদী ভূপৃষ্ঠের ক্ষয় সাধন করে আর ক্ষয়িত পাথর ও মাটি এবং তার সঙ্গে বৃষ্টির জলে নামানো বালি মাটি বহন করে নিচে নামায়। মধ্যপ্রবাহ বর্ষাকালে বন্যার সময়েই কিছু কিছু মাটি কাটে আর বর্ষার জলে আনীত মাটি বহন করে। অন্য সময়ে নিজের খাত কাটে না। বন্যা যখন কমে যায় তখন খাতে বালিমাটি অবক্ষেপণ করে। দেখা গিয়াছে পূর্ণ বন্যার সময়ে যখন জল উপচিয়ে প্লাবন হয়, ঠিক তখনই বন্যার জল নদীর গর্ভদেশে অল্প হারে মাটি কাটে, বন্যা একটু নামতে আরম্ভ করার সময়ে অনেক নদীর গর্ভ স্থানে স্থানে দ্রুততর ও গভীর হারে কাটে। বন্যা আরও কমলে আবার পলির অবক্ষেপণে চরের সৃষ্টির কাজ শুরু হয়। বন্যা কমবার সময়ে অনেক নদীর স্থানে স্থানে গর্ভ কেন দ্রুততর ও গভীরতর হারে কাটে, সে বিষয়ে পরে আলোচনা করবো।

নিম্নপ্রবাহে নদীর প্রধানতম কাজ পলি অবক্ষেপণ ও নতুন ভূমি উঠিত করানো। বন্যার সময়ে সাময়িকভাবে গর্ভ কেটে গভীরতা বাড়ালেও, অব্যবহিত পরেই আবার পলির অবক্ষেপণে ভরে যায়। নদীর নিম্নতম অংশে যেখানে সমুদ্রের জোয়ারের জল আসে, সেখানে অবক্ষেপণের কাজ নিয়ত চলছে নদীর গর্ভে। কারণ জোয়ারের গতির চেয়ে ভাটার গতি সাধারণতঃ মন্দ, তাই জোয়ার

ভাটার ফলে নতুন চরের সৃষ্টির কাজই বেশী। ব-দ্বীপপ্রবাহে জোয়ার-ভাটার অংশের নদী-সমস্যার জটিলতা বাংলা দেশের ইঞ্জিনিয়ারদের আজ বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। গঙ্গার ব-দ্বীপের মুখে জোয়ারের বেগ খুব বেশী, উচ্চতায় প্রায় ১৮ ফুট থেকে ৩০ ফুট হয় জোয়ার। যদিও বঙ্গোপসাগরের মাদ্রাজ অঞ্চলের জোয়ারের জল মাত্র পাঁচ ফুট উঁচু হয়। গঙ্গার মোহানাগুলির এইসব বৈশিষ্ট্য মনে রাখতে হবে, এর ব-দ্বীপের নদী সমস্যার সমাধানে। মোহানাগুলির দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন অংশে জোয়ারের আর ভাটার গতির হারের তারতম্যও বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। ডায়মণ্ডহারবার থেকে নিচে, হুগলীর মোহানায় ভাটার টান দামোদরের বন্যার সময়ে খুব বেশী থাকে, এমন কি জোয়ারের সময়েও অনেকটা সমুদ্রাভিমুখী টান থাকে। দামোদরের বন্যার সময় ছাড়া বছরের অন্যান্য সময়ে ভাটার টানের চেয়ে উর্ধ্বাভিমুখী জোয়ারের টান বেশী। বছরের এই সব সময়ে, জোয়ারের সঙ্গে আনীত সমুদ্রের নিমজ্জিত পলিমঞ্চের মণ্ডপলি, ভাটায় হুগলী নদীর গর্ভে অবক্ষেপিত হয়ে জমা হয়—দামোদরের প্রবল বন্যার ভরবেগ আবার তাদের কেটে দেয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ব-দ্বীপের কথা

ব-দ্বীপ কিভাবে গড়ে ওঠে

পূর্বেই বলেছি, নদী কেবল জলই বহন করে না, তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পাথর, কাঁকর, বালি, মাটিও বহন করে। লবণ, ফটকিরি প্রভৃতি দ্রাব্য পদার্থও নদীর জলের সঙ্গে দ্রব অবস্থায় মিশে থাকে। জলের সঙ্গে বায়ুও থাকে প্রচুর।

এই নদী যখন কোনও হ্রদে অথবা সাগরে এসে পড়ে, তখনই তার ব-দ্বীপ সৃজনের কাজ আরম্ভ হয়। মধ্যপ্রবাহে নদীর দৈর্ঘ্য যদি বেশী হয় (যেমন গঙ্গা নদীর), তা হলে অপেক্ষাকৃত ভারী পাথর, নুড়ি, মোটাবালি ওই মধ্যপ্রবাহের প্রথম অংশের মধ্যেই তার গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করে আর শুধু সূক্ষ্ম বালি ও মাটি বাহিত হয়ে হ্রদে অথবা সাগরের মুখ পর্যন্ত পৌছায়। দামোদর সাগরে পড়ে আজ আর নতুন ভূভাগ সৃষ্টির কাজে সাহায্য করছে না বলে তার নিম্নপ্রবাহ বৈজ্ঞানিকের ভাষায় ঠিক ব-দ্বীপপ্রবাহ বলা যায় না। তার নিম্ন-প্রবাহিত অঞ্চলের ভূভাগের মৃত্তিকাস্তরের গঠন, ব-দ্বীপের স্তরের থেকে একটু ভিন্ন-প্রকৃতির।

হ্রদে অথবা সাগরে পৌছেই নদীর স্রোত তৎক্ষণাৎ থেমে যায় না, জলের গতির জন্যে momentum (ভরবেগ) নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত, সাগরের মধ্যেও কিছুদূর নদীর স্রোত অব্যাহত থাকে এবং ভরবেগ নিঃশেষিত হলে নদীর স্রোত থামে। সেইস্থানে সাগরের স্রোত যদি অপেক্ষাকৃত স্থির হয়, তা হলে নদীবাহিত বালি মাটি অবক্ষিপ্ত হয়ে সাগর গর্ভে থিতায়। সাগরের লবণাক্ত জলের সংমিশ্রণ এবং রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়াতে এই পলির অবক্ষেপণে বিশেষ সাহায্য করে।

প্রথম দফায় সমতল স্তরে সাগরগর্ভে অবক্ষিপ্ত পলি ক্রমশঃ উঁচু হতে থাকে। এই সমতল প্রকৃতির স্তর খানিকটা উঁচু হওয়ার পরে আর একটা স্তর জমা হতে থাকে তার উপরে। এই স্তর নদীর মুখ থেকে সমুদ্রের দিকে বেশী ঢালু। এই ঢালু স্তরের উপর আবার একটি সমতল স্তরের আবির্ভাব হয়। নদী সাগরে পৌছে, যুগ যুগের প্রক্রিয়ায় তার মুখে সাগরতলে এমনি তিনটি স্তরে গঠিত পলির একটি নিমজ্জিত মঞ্চ বা পাটাতন (platform) গঠন করে।

তাই বলে এ কথা সত্য নয়, সকল নদী মোহানায় ঠিক একই ভাবে তিনটি স্তরের পলির মঞ্চ তৈরী হয়। সমুদ্রের গর্ভের গঠন, সমুদ্রের স্রোত, নদীটির প্রকৃতি প্রভৃতি অবস্থার বিভিন্নতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন নদীর ব-দ্বীপ গঠনে ভিন্ন প্রকার স্তরের অস্তিত্বও দেখা যায়।

মোহানার কাছে প্রবাহিত নদী একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, তার জলধারার মধ্যভাগেই স্রোতের বেগ অত্যধিক, দুই পাশে স্রোতের বেগ অপেক্ষাকৃত কম। সুতরাং মধ্যভাগের জলের ভরবেগ (momentum) দুই পাশের চেয়ে বেশী। এই কারণে নদীর জল সাগরে প্রবেশ করলে, তার

মধ্যভাগের জলই সাগরের মধ্যে বেশীদূর অবধি বাহিত পলি নিয়ে যায়, দুই পাশের জলের পলি অপেক্ষাকৃত অল্পদূর অবধি যায়। সেইজন্যে সাগরের তলে যে পলি জমা হতে থাকে, তার শেষ দিকটা সরল রেখা নয়। সে পলির স্তরের আকার অনেকটা জিহ্বার মত হয়।

সাগরে পলির মঞ্চটি যখন সমুদ্রপৃষ্ঠের সমান উঁচু হয়ে ওঠে, তখন নদীর জল সেই নিমজ্জিত মঞ্চ-পৃষ্ঠের অবলম্বন পেয়ে তার উপর দিয়ে বইতে থাকে এবং সমুদ্রের ভিতরে নদীপ্রবাহের গতি দীর্ঘতর হয়ে যায়। কিন্তু এদিকে মোহানার কাছে নদীগর্ভেও পলির অবক্ষেপণ হতে থাকে। ক্রমে ক্রমে, বছরে বছরে, মোহানার কাছে, নদীগর্ভের এই অবক্ষিপ্ত পলি খুব উঁচু হয়ে ওঠে আর নদীর প্রবাহপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। নদীপ্রবাহ তখন নতুন একটি শাখা পথে প্রবাহিত হতে শুরু করে সমুদ্রের দিকে। এই প্রক্রিয়াতেই আবার কয়েক যুগে নতুন প্রশাখারও সৃষ্টি হয়।

সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা যে এই নদী-মোহানার পলির অবক্ষেপণে একটা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে, তা পূর্বেই বলেছি। জোয়ারের জলের সঙ্গে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত পলিমঞ্চের পলি ফিরে নদীর মোহানায় প্রবেশ করে। সুতরাং নদীর উপর দিক থেকে আনীত জলে কোনও সময়ে পলির ভাগ কম থাকলেও, জোয়ারের পলি ভাটার সন্ধিসময়ে মোহানার গর্ভে পতিত হতে পারে। এই কারণে বিদ্যাধরী প্রভৃতি সুন্দরবনের নদী, যদিও উপরাঞ্চল থেকে কোনও পলি আনছে না, সাগরের জোয়ারের জলের আনীত পলি দিয়েই তাদের গর্ভ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এইরূপে পিয়ালি নদী কয়েক বছরেই সম্পূর্ণ ভরাট হয়ে গিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। সুন্দর-বন অঞ্চলের নদী মজে যাওয়ার ব্যাপারে সেটির বিশেষ হাত আছে। গঙ্গার মোহানা ভাগীরথী-হুগলীর মোহানা থেকে পদ্মা-মেঘনার মোহানা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মোহানাগুলির সামনে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে পলির নিমজ্জিত মঞ্চের উপরিভাগের কয়েক ফুট অপেক্ষাকৃত নরম জলমিশ্রিত গলিত মণ্ডের মত পলি দিয়ে তৈরী। এই মণ্ডবৎ অর্ধতরল পলি বঙ্গোপসাগরের স্রোতের সঙ্গে এবং জোয়ার-ভাটার টানে নদীর মুখে চলাফেরা করে। সুযোগ পেলে, অর্থাৎ উপরের জলের প্রবাহ মন্থর হলে সেই মণ্ডপলি মোহানায় জমা হতে থাকে ও চর সৃষ্টি করে।

মোটামুটি ব-দ্বীপ গঠনের নিয়ম হল এই। এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, সমুদ্রের স্রোত আছে, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা আছে। তা ছাড়া বঙ্গোপসাগরের মত সাগরের উপকূলে প্রবল ঝড়ঝাপটা এবং অত্যধিক বৃষ্টিপাত (বার্ষিক ৭০"।৮০" ইঞ্চি, তার মধ্যে বেশীর ভাগ বর্ষার দুই মাসে) আছে। এদেরও নদীর নিজস্ব প্রবাহ ব্যতিরেকে ব-দ্বীপ গঠনে বা ভাঙনে, যথেষ্ট হাত আছে। ভূমধ্য-সাগরের স্রোত নীল নদের ব-দ্বীপ আর বাড়তেই দিচ্ছে না। বঙ্গোপসাগরের জোয়ার-ভাটা, স্রোত আর ঝড়-বৃষ্টি পদ্মা-মেঘনার মোহানার দিকের গঙ্গার ব-দ্বীপের বৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করছে, বরং ক্ষয় সাধনই করছে—যদিও চট্টগ্রামের উপকূলে সমুদ্র থেকে নতুন জমি উঠিত হচ্ছে, আর মেদিনীপুরের উপকূলেও জমি উঠিত হচ্ছে। ফলে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত আজ সমুদ্রোপকূল থেকে অনেক ভিতরে

চলে এসেছে। চব্বিশ পরগনার উপকূলে ব-দ্বীপের বৃদ্ধি হচ্ছে, এই অঞ্চলের সাগর দ্বীপ প্রভৃতি সন্দীপ, হাতিয়া দ্বীপের চেয়ে উচ্চতরও হয়ে যাচ্ছে।

নিম্নপ্রবাহে নদী মোহানার কাছে নিমজ্জিত মঞ্চ সৃষ্টি করে আর খাতের গর্ভে চর সৃষ্টি করে ক্রমশঃ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেই নিশ্চিন্ত থাকে না। প্রত্যেক বন্যার অব্যবহিত পরে একটু উপরিভাগের অংশের গর্ভে পলি পরিক্ষেপণ করে আর দুই ধারে পাড়ের কাছেও পলি পাতিত করে। বছরে বছরে নতুন পলিপাতনের ফলে নদীর দুই পাড়ের জমি আরও উঁচু আর শক্ত হয়ে নদীর স্বাভাবিক বাঁধ বা levee-র সৃষ্টি করে। আবার এই স্বাভাবিক বাঁধ দুটি সকল অংশে সমান শক্ত হয় না। কাজেই কোনও এক প্রবল বন্যায় বাঁধের দুর্বলতর অংশ ভেঙে যাওয়াও অসম্ভব নয়। এই ভাঙা বাঁধের পথে নদী breach channel অর্থাৎ 'হানা' সৃষ্টি করে নতুন প্রবাহখাত তৈরি করে নেয়। মাত্র ৩০।৪০ বছর আগে বেগোর হানা-পথে দামোদর নতুন খাতে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছে। ওই খাতে রূপনারায়ণ নদের নিম্নাংশ দিয়েই আজ দামোদরের হুগলী সঙ্গমের প্রধান প্রবাহপথ। গড়াই, মধুমতী, আড়িয়াল খাঁ, কুমার প্রভৃতি গঙ্গা-পদ্মার হানা-পথ। অবশ্য, এ বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত অসম্ভব। ওইগুলির কোনটি হয়তো প্রধান খাত ছিল আর বর্তমান পদ্মা-মেঘনার পথ নতুন হানা-পথ, এও হতে পারে। বিভিন্ন খাত সৃষ্টির ফলে নদীর 'স্বাভাবিক বাঁধে' ঘেরা নিম্নভূমি অঞ্চল ব-দ্বীপে জলাভূমির সৃষ্টি করে। ফরিদপুর জেলার বিলগুলি এই রকম জলাভূমি। নদীয়া, যশোহরেও এরকম অনেক বিল আছে। চব্বিশ পরগনার 'লবণ-হ্রদ' প্রভৃতি এইরূপ জলাভূমি, 'বাদা'।

ব্রহ্মপুত্র, কুশী, মেঘনা, অজয়, দামোদর প্রভৃতি উপনদী মূল নদীর সঙ্গে মেশবার সময়ে যে ভূমির সৃষ্টি করেছে, ভূগোল-বিজ্ঞানীরা সেইসব ভূমির স্তরের ও আকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের ব-দ্বীপ সংজ্ঞা দিতে নারাজ। 'পাললিক পাখা' (পলি পড়ে পাখার ন্যায় আকৃতির ভূমিখণ্ড), 'পাললিক শঙ্কু' (alluvial cone) 'পর্বত সানুদেশ' প্রভৃতি নামে, এই সব ভূখণ্ডের পরিচয় তাঁরা দিয়ে থাকেন। তবে ভাগীরথীর জন্মের আগে, অজয়-ময়ূরাক্ষী-দামোদর-রূপনারায়ণের পূর্বপুরুষ ছোটনাগপুরের পার্বত্য নদীগুলি প্রাচীনকালে, বর্তমানের গাঙ্গেয় পাললিক স্তরের নিচে, পশ্চিমবঙ্গে একটি রাঙামাটির পাললিক স্তর সৃষ্টি করেছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সেই প্রাচীন পাললিক স্তর সেই নদীগুলির ব-দ্বীপই ছিল।

গঙ্গার ব-দ্বীপের বৈশিষ্ট্য

গঙ্গার ব-দ্বীপের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় নিতে হলে, সর্বাগ্রে প্রশ্ন ওঠে, এর গঠন কোন্ অংশ থেকে আরম্ভ হয়েছিল। প্রশ্ন ওঠে, ভাগীরথী, পদ্মা-মেঘনা, ভৈরব-মাথাভাঙা, গড়াই প্রভৃতির মধ্যে কোন্‌টি গঙ্গার প্রাচীনতম খাত। [২নং চিত্র]

কিন্তু এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হবার কোনও উপায় জানা নেই। পূর্বগামী সুধীগণ নানা কারণে ভাগীরথীকেই গঙ্গার প্রাচীনতম খাত বলে নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন। উইল্‌কক্‌স সাহেব তাঁর সেচ থিওরির সামঞ্জস্য সাধনের জন্য পদ্মাকেই গঙ্গার প্রাচীন খাত এবং ভাগীরথী, জলঙ্গী, মাথাভাঙা প্রভৃতিকে সেচের খাল

ছাড়া আর কিছু নয় দেখেছেন। সকল রকম বৈজ্ঞানিক যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া খুবই শক্ত। বিশেষতঃ প্রাচীনকালে গঙ্গার ব-দ্বীপে খালের জলের সেচের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, তারই কোনও প্রমাণ নেই। স্বাভাবিক শাখা-প্রশাখায় স্বাভাবিক বা কৃত্রিম বাঁধে (levee) মাঝে মাঝে ফুটো করে উপচানো জলের (overflow irrigation) পলির সার ব্যবহারের রীতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এর থেকে প্রমাণ হয় না, এতগুলি কৃত্রিম খাল গঙ্গার ব-দ্বীপে কাটানো হয়েছিল। পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতে দেশে, ধানই যে দেশে প্রধান শস্য, সেখানে খালের জলের সেচ-ব্যবস্থা, জনসংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও আজও শখের ব্যবস্থা। এ দেশে উইল্‌কক্‌স্ সাহেবের সেচের জন্যে খাল কাটার থিওরি টেঁকে না। এমনও হতে পারে, প্রধানতঃ প্লাবনের প্রকোপ কমাবার জন্যেই দামোদরের 'স্বাভাবিক বাঁধে' অনেক ফুটো করে দেওয়ার রেওয়াজ প্রবর্তিত হয়েছিল, নতুবা সহসা দুর্বল স্থান ভেঙে ভীষণ প্লাবন মানুষের ক্ষতি করতো। এই 'বন্যা নিয়ন্ত্রণে'র অনুসিদ্ধান্ত (corollary) হিসাবে উপচানো জলের পলির ব্যবহার পাওয়া গিয়েছিল।

সুপ্রসিদ্ধ নদী-বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ার শ্রী এস. সি. মজুমদার ভাগীরথীকেই গঙ্গার প্রধান ও প্রাচীনতম খাত বলে সিদ্ধান্ত করতে ঐতিহাসিক প্রমাণের অবতারণা করেছেন কিছু কিছু। কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক প্রমাণগুলি থেকে শুধু বোঝা যায় যে, ঐতিহাসিক কালে ভাগীরথী-প্রবাহের অস্তিত্ব ছিল, আর কিছু নয়। সেই সময়ে যে পদ্মাখাতের অস্তিত্ব ছিল না, তা মোটেই প্রমাণ করে না। ভাগীরথীর 'গুরুত্ব' ও মাহাত্ম্যই যে তার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে পারে না, সে কথা আগেই বলেছি। দুঃখের বিষয় আর্যদের বিজয় অভিযানে ও হিন্দু সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রচারে গঙ্গা ও ভাগীরথী এমনই এক প্রাধান্য পেয়েছে যে, তার সংস্কার থেকে মনকে মুক্ত রাখতে সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক সমীক্ষকগণ সমর্থ হন নি। কাজেই প্রাগৈতিহাসিক কালে যখন পদ্মার অস্তিত্ব ছিল তখন ভাগীরথীর ছিল না, এ কথা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন না।

পদ্মার চেয়ে ভাগীরথীর প্রাচীনতা প্রমাণের জন্য শ্রীমজুমদার তাঁর নিজস্ব একটি বৈজ্ঞানিক 'যুক্তি'র অবতারণা করেছেন : পদ্মা-মেঘনার দিকের অপেক্ষা ভাগীরথীর দিকে গঙ্গার ব-দ্বীপ বঙ্গোপসাগরের অভিমুখে দৈর্ঘ্যে বড়। শ্রীমজুমদার মনে করেন, এই থেকে প্রমাণ হয়, ভাগীরথীর অংশে গঙ্গার ব-দ্বীপ প্রাচীনতর, সুতরাং ভাগীরথীই গঙ্গার প্রাচীন ও প্রধান প্রবাহপথ। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরও কতকগুলি বৈজ্ঞানিক কারণের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি।

বর্তমান ভাগীরথী-হুগলীর দিকে গঙ্গার ব-দ্বীপ সৃষ্টিতে দামোদর, রূপনারায়ণ, কাঁসাই প্রভৃতি বহু প্রাচীন নদ-নদীর হাত রয়েছে। সত্য বটে, তাদের অববাহিকা গঙ্গার অববাহিকার তুলনায় অনেক ছোট, কিন্তু এরা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভূখণ্ড ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে উদ্ভূত হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ওই অঞ্চলকে ক্ষয়িত করে বঙ্গোপসাগরে মাটি ফেলেছে। তারা যখন কাজ করেছে, তখনও হিমালয়ের জন্ম হয় নি। জন্মগ্রহণ করে হিমালয়ের পর্বতশৃঙ্গের তুষার জমে উঠতেও বহুশত বছর লেগেছে, তারপরে সেই সব গলিত তুষারের জল

ক্রমশঃ হিমালয়ের প্রস্রবণ ও নদীগুলির সৃষ্টি করেছে। গঙ্গা-যমুনা-ঘর্ঘরা-কুশীর জন্ম হয়েছে আরও পরে।

পরবর্তী যুগে, ভাগীরথীর সৃষ্টির পরে, সেই পূর্বতন ব-দ্বীপের উপরে ভাগীরথীর পলি পড়েছে। গভীর নল পুঁতে সেই প্রাচীন মৃত্তিকার স্তরের সন্ধান পাওয়া যাবে ভাগীরথীর মোহানায়। কারণ কলিকাতার দক্ষিণে কাউখালিতে মাত্র ৬০ ফুট নিচেই সেই মৃত্তিকা-স্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

গঙ্গার ব-দ্বীপ সৃষ্টি হবার বহু পূর্বেই হুগলী নদীর বর্তমান মোহানার একটি খাঁড়িরূপে অস্তিত্ব ছিল—ভূতাত্ত্বিকদের এই মত। সেই মোহানায় রূপনারায়ণ, কাঁসাই বা অপর প্রাচীন নদী সাগর-সঙ্গম লাভ করতো।

সুতরাং এদিকে গঙ্গার ব-দ্বীপের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিতে ভাগীরথী-হুগলীর যতটা হাত ছিল বলে শ্রীমজুমদার ধরে নিয়েছেন, তা ঠিক নয়।

আরও একটা কথা লক্ষ্য করতে হবে। মেঘনা-পদ্মার মুখের অঞ্চলে গঙ্গার ব-দ্বীপের দৈর্ঘ্য অন্যান্য নৈসর্গিক ও প্রাকৃতিক কারণে. যথেষ্ট বাড়তে পায় নি। চট্টগ্রাম উপকূল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু বরিশাল জেলা ও নোয়াখালির উপকূল বহুকাল ধরে বৃদ্ধি পায় নি, বরং ভাঙনের লক্ষণ আছে। পরের মানচিত্রের সঙ্গে রেনেলের মানচিত্রের তুলনা করলেও তাই দেখা যায়। অবশ্য, রেনেলের মানচিত্র সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নাও হতে পারে। কিন্তু এখনই যদি বঙ্গোপসাগরের উপকূলের জরিপ করা হয়, তা হলে গত সার্ভের মানচিত্রের সঙ্গে পার্থক্য দেখা যাবে বলেই আমি মনে করি। বঙ্গোপসাগরের স্রোত ও ঝড়বৃষ্টির সংঘাতগুলি মনে রাখলেই বোঝা যায়, বরিশাল, নোয়াখালির উপকূলে কেন ভাঙন হচ্ছে। ওই স্থানে সমুদ্রতলের গঠনও (ব-দ্বীপের নিমজ্জিত পলির মঞ্চের ভিত্তি) ওখানে ব-দ্বীপের ভূভাগ সৃষ্টির পরিপন্থী বলে মনে হয়। এই স্থানে নিমজ্জিত পলিমঞ্চের অংশ মাঝে মাঝে ধসে যায়, সেই জন্য বরিশাল 'গান্'-এর আওয়াজ শোনা যায়। কতকগুলি কারণে বহুকাল ধরে মিশরের নীল নদের ব-দ্বীপ যেমন ভূমধ্যসাগরের দিকে আর বাড়ছে না, তেমনি পদ্মা-মেঘনার মুখেও গঙ্গার ব-দ্বীপের বৃদ্ধি নানা করেণে প্রতিহত হয়েছে। এই অংশে সমুদ্রাভিমুখে গঙ্গার ব-দ্বীপের দৈর্ঘ্য বাড়ে নি। অথচ পূর্বাংশে ব-দ্বীপ উচ্চতর ও দীর্ঘতর হয়েছে। [চিত্র নং ২ ক]

ভারত মহাসাগরের অন্তর্গত বঙ্গোপসাগর, মার্তাবান সাগর ও শ্যাম সাগরে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-ইরাবতী-সিটাং ও মেনাম-চাও-ভ্রায়া নদীর মোহানাগুলির মানচিত্র একটু নিবিষ্টভাবে দেখলে একটি বিষয়ে তাদের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। তিনটি মোহানাই উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত নদীর মোহানা। তিনটি মোহানারই পূর্ব দিকের অংশে ব-দ্বীপ পশ্চিম দিকের অংশের চেয়ে ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে বেশী দূর ঢোকানো। আমার মনে হয়, যুগ যুগ ধরে জোয়ারের জলের দৈনন্দিন দুই বারের ক্রিয়া তাদের তিনটিকেই এই এক রকম আকৃতি দিয়েছে। পৃথিবী তার মেরুদণ্ডে পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘোরে, কাজেই জোয়ারের গতি পূর্ব থেকে পশ্চিমে। তাই পূর্বের ব-দ্বীপের মুখ ভেঙে এনে সমুদ্রের জল ব-দ্বীপের পশ্চিমাংশে মুখের বৃদ্ধি সাধন করে। তাই পশ্চিমাংশে সাগর দ্বীপ প্রভৃতি গঙ্গার মোহানার দ্বীপগুলি পূর্বাংশের সন্দ্বীপ, হাতিয়া প্রভৃতি দ্বীপের চেয়ে সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতর। এই সব কথা

প্রণিধান করতে পারলে, পদ্মা-মেঘনা এবং কুমার-আড়িয়ল খাঁ-এর খাত ভাগীরথীর চেয়ে গঙ্গার প্রাচীনতর খাত হওয়াই বেশী যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

নদীর উৎস প্রদেশের শিলার (rock) প্রকৃতির উপর নির্ভর করে নদীবাহিত পলির পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য। কোনও কোনও শিলা সহজেই ক্ষয়শীল, যদিও উদ্ভিদ, ঘাস প্রভৃতি বনের গাছপালাও ক্ষয় নিবারণে প্রচুর সহায়তা করে, তবু এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে, গ্রানাইট জাতীয় কঠিন প্রস্তর 'হিমালয়ের পাললিক শিলার চেয়ে কম ক্ষয়শীল। দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতাঞ্চলে আমাজন নদের (৪০০০ মাইল দীর্ঘ) জন্ম। এই আমাজন এত বিরাট নদী, কিন্তু ব-দ্বীপ গঠন করতে পারে নি বললেই চলে। মোহানার কাছে তার বিস্তার ৫০।৬০ মাইল, গভীরতাও যথেষ্ট, মোহানা থেকে প্রায় ২৬০০ মাইল পর্যন্ত আমাজন নাব্য। উৎস প্রদেশের অববাহিকায় শিলার প্রকৃতি অনুযায়ী সে শিলা কম ক্ষয়িষ্ণু, তাই আমাজনের জলে যথেষ্ট পলি আসে নি ব-দ্বীপ গঠনের জন্য। মেঘনার জলও বেশী পলি আনে না অথচ প্রচুর জল নামায় আর সমবেত শক্তিতে গঙ্গার আনীত পলি বঙ্গোপসাগরে ১০০ মাইল পর্যন্ত নিয়ে যায়। কাজেই পদ্মা-মেঘনার মুখে নানা কারণে গঙ্গার ব-দ্বীপের বৃদ্ধি প্রতিহত হয়েছে, এ কথা খুবই যুক্তিসিদ্ধ।

আমার মনে হয়, মাথাভাঙা এবং গড়াই-এর উৎসের কাছে কোনও প্রাচীন নদীর খাতই গঙ্গা-পদ্মার সমুদ্রগামী প্রাচীনতম খাত ছিল। এই খাতে গঙ্গা মধ্যবঙ্গের মাটি সৃষ্টি করবার পরে, পদ্মা-মেঘনার খাতের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু শেষোক্ত খাতে, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি বাহিত পলির ভাগ বেশী থাকায়, বন্যার উৎক্ষেপণে, পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-বাহিত অঞ্চল আজ মধ্যবঙ্গের চেয়ে উচ্চতর ভূমি। আর সবচেয়ে শেষে ভগীরথের আমলে ভাগীরথীর নাব্য পথ তৈরী হয়েছিল গঙ্গা থেকে সমুদ্রে যাবার জন্যে, ছোটনাগপুর থেকে আগত কয়েকটি খাতের অবস্থিতির সুবিধা নিয়ে। ভাগীরথীর প্রাচীন খাতে গঙ্গার সন্নিকটে উৎসের কাছে গভীর নল প্রোথিত করে এ কথা যাচাই করা যেতে পারে।

নদীয়া, যশোহর ও আংশিক ফরিদপুর জেলার মুমূর্ষু ব-দ্বীপ অঞ্চলে আপেক্ষিক উচ্চতার দিকে নজর দিলে সহজেই বোঝা যায়, ব-দ্বীপের এই অংশ সৃষ্টি করেছিল মাথাভাঙা-গড়াই-এর পূর্বতন কোনও প্রাচীন নদী এবং সেটিই গঙ্গার প্রধান প্রবাহপথ ছিল বঙ্গোপসাগরের দিকে। পদ্মা-মেঘনার খাত অথবা কুমার-আড়িয়ল খাঁ-এর খাত তার পরবর্তীকালে বিপুল আকার ধারণ করাতে গঙ্গার এই প্রাচীনতম ও প্রধান খাত পরিত্যক্ত হয়। আর সেইজন্য মধ্যবঙ্গে খুলনা জেলার সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত একটা ক্রমোনিম্নভূমি আজও ব-দ্বীপ নির্মাণের কাজে পরিত্যক্ত হয়ে রয়ে গিয়েছে, যদিও এর উত্তর অংশ যথেষ্ট উঁচু এবং সে অঞ্চলে মাথাভাঙা, ভৈরব প্রভৃতি নদীর গর্ভও পদ্মার জলের চেয়ে উঁচু। এই অঞ্চলই ব-দ্বীপ বাংলার প্রাচীনতম ভূমি। ১৫০ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ভূগোলশাস্ত্রবিদ্ টলেমি তাঁর ভূগোল লিখেছিলেন। তখন তিনি বর্তমান 'রায়মঙ্গলে'র মোহানার কাছাকাছিই গঙ্গার Mega অর্থাৎ প্রধান মোহানা নির্দিষ্ট করেছিলেন। খৃ. পূ. ৩০০ অব্দে মেগাস্থিনিস-উল্লিখিত গঙ্গারিডি (Gangeridæ) রাজ্য ও বন্দর টলেমিও দেখেছিলেন। খুলনা জেলার বর্তমান বাগেরহাটের কাছে টলেমি-উল্লিখিত

সমৃদ্ধিশালী গঙ্গারিডি বন্দর ছিল বলেই আমাদের ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করেছেন। যশোহরের কাছে প্রাচীনকালে বড় বড় জাহাজ নির্মাণের কারখানা ছিল। গঙ্গার প্রধান মোহানা এবং প্রধান ও প্রাচীনতম খাত যে এই পথেই ছিল, তার সমর্থনে আরও অনেক বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক যুক্তি আছে, বাহুল্য ভয়ে এখানে উল্লেখ করছি না। এই অঞ্চলে ঐতিহাসিক কালে প্রতাপাদিত্য তাঁর স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। বর্তমান সুন্দরবনের পরিত্যক্ত অংশে এখনও সেই সময়কার জনপদের গৃহমন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। প্রাচীন গৌড়ের মত সুন্দরবনের এই অঞ্চলও খুব প্রাচীন। আর গঙ্গার সবচেয়ে প্রাচীন প্রধান শাখা এইখান দিয়ে প্রবাহিত বলেই এ অঞ্চলের প্রাচীনত্ব। তাই প্রতাপাদিত্য পরবর্তীকালে তাঁর রাজধানী এখানে স্থাপন করেছিলেন।

গঙ্গার ব-দ্বীপের পশ্চিম ও পূর্বভাগের মাটি মধ্যভাগের চেয়ে উচ্চতর, কাজেই ওই দুই দিকের ভূগর্ভস্থ জল চুয়ে চুয়ে মধ্যবঙ্গের ভৈরব প্রভৃতি নদীর নিম্নাংশের খাত দিয়ে সাগরে যায়। তাই খুলনার কাছে ভৈরবের জল এত মিষ্ট। খুলনার নিচে রূপসা, পশোর প্রভৃতি সমুদ্রোপকূলস্থ সুন্দরবনের খাঁড়িগুলির জলও অপেক্ষাকৃত মিষ্ট। বর্ষায় পদ্মার সঙ্গে সাময়িক পুনঃসংযোগে ভৈরবের নিম্নাংশে প্রচুর জল যায় আর তার সঙ্গে সমগ্র মধ্যবঙ্গের অববাহিকার বৃষ্টির ও ভূগর্ভের চোয়ানো জল প্রবাহিত হয়। ফলে, বর্ষাকালে রূপসা, পশোর প্রভৃতি কিছুদিনের জন্য একটানা নদীতে রূপান্তরিত হয়, জোয়ারের জল স্ফীত হয় কিন্তু উত্তরাভিমুখী হয় না। এইসব নদীতীরের জমি লোনা নয়, ফলে চাষের পক্ষে খুবই উপযোগী। বাংলার ব-দ্বীপের বিশিষ্ট প্রাকৃতিক গঠনই এর জন্যে দায়ী।

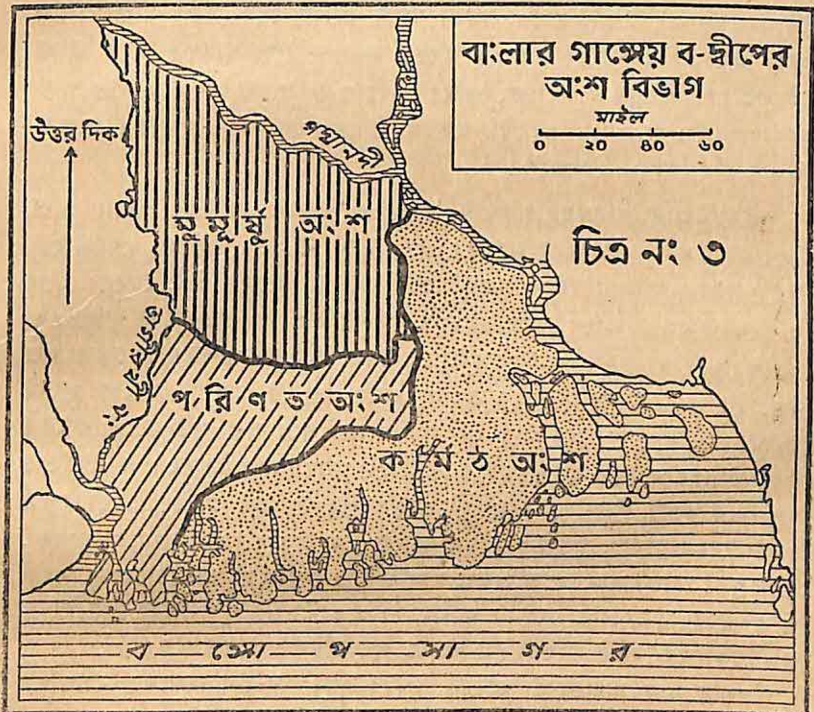
সুন্দরবনের পূর্ব ও পশ্চিম অংশে গঙ্গার মোহানাগুলির গর্ভ খুলনা জেলায় অবস্থিত মোহানার চেয়ে ভরাট হয়ে যাবার প্রয়াসই বেশী। বিশেষতঃ চব্বিশ পরগনার নদীর গর্ভই সবচেয়ে বেশী ভরাট হয়ে আসতে চাইছে প্রাকৃতিক কারণে।

ভৈরব প্রভৃতি, পদ্মার সঙ্গে সারা বছর সংযোগ না থাকা সত্ত্বেও, অববাহিকার বৃষ্টির জল ও ভূগর্ভস্থ জলের সাহায্যে নিম্নাংশে খুবই সজীব। তাই পশোরের উপর, খুলনার নিচে, চালনায় সমুদ্রগামী জাহাজ আসতে পারছে। কিন্তু অন্যান্য কারণে এখানে একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দর পত্তন করা যায় না।

সুন্দরবনের পশ্চিমাংশের অন্যান্য নদীর মত ভাগীরথী-হুগলীর মোহানাও এতদিনে ভরাট হয়ে যেত, যদি না দামোদর-রূপনারায়ণ ও কাঁসাই-হলদির বন্যার জলের ভরবেগ (momentum) তাদের গর্ভের পলি প্রতি বছর পরিষ্কার করে দিত। পদ্মা-মেঘনার মোহানায় আজ ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা-মেঘনার সমস্ত জল নামে, তবুও সে মোহানা পূর্ণগর্ভ, সমুদ্রের জাহাজ চলতে পারে না। গভীরতার অভাবে সমুদ্রের জাহাজের পদ্মা-মেঘনায় ওঠার উপায় নেই। দামোদরের বন্যার জলের ভরবেগের মত আকস্মিক ভরবেগের সংঘাত না পাওয়াতে পদ্মা-মেঘনার মুখের পলি সমুদ্রে বিতাড়িত হয় না। আর হুগলীর উপরে কলিকাতা বন্দর অবধি সমুদ্রগামী জাহাজ আসতে পারে প্রধানতঃ দামোদরের বন্যার বিশিষ্টতার কৃপায়। মেঘনা প্রচুর জল নামায় বটে, কিন্তু দামোদরের ক্ষণস্থায়ী বন্যার বিশিষ্টতা তার নেই।

ব-দ্বীপে জলনিকাশের সমস্যা

গঙ্গার ব-দ্বীপের কোন্ খাতটি প্রাচীনতর—সে প্রশ্নের চেয়ে খাতগুলির বর্তমান অবস্থা ও ব-দ্বীপ অঞ্চলের ভূমির জলনিকাশের সমস্থার গুরুত্বই আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে বেশী। আর সেই জন্য ব-দ্বীপটির প্রাকৃতিক গঠনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া উচিত। গঙ্গার ব-দ্বীপকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়: ১] কর্মঠ, ২] মুমূর্ষ ও ৩] পরিণত। (৩নং চিত্র দেখুন।)



চিত্র নং ৩

গঙ্গার ব-দ্বীপের 'কর্মঠ' অংশে আজও সমুদ্র থেকে নতুন জমি উদ্ধারের স্বাভাবিক চেষ্টা চলেছে। এ অংশের ভূমিও ক্রমশঃ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতর হয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। যদিও মানুষের জনপদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস কিছু কিছু ওই কাজের পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে, তবুও মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সংঘাতে প্রকৃতির অমোঘ শক্তি অব্যাহতভাবে কাজ করবেই। বাংলা দেশের সমস্ত সুন্দরবন অঞ্চল, খুলনা জেলার দক্ষিণাংশ, সমগ্র বরিশাল, নোয়াখালি ও ফরিদপুর জেলা গঙ্গার ব-দ্বীপের 'কর্মঠ' অংশের অন্তর্ভুক্ত।

চব্বিশ পরগনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চল ছাড়া বাকি অংশ আর খুলনা জেলার উত্তরাংশ ব-দ্বীপের 'পরিণত' অংশে পড়ে। এই অংশে নদীগুলি সজীবভাবেই সারা বছর প্রবাহিত হচ্ছে বটে, আর বর্ষার বন্যায় তাদের পাড়ের কাছে ভূমি অল্পবিস্তর উচ্চতরও হয় বটে, কিন্তু সাধারণভাবে বাকি জমিটুকুর উপর পলি পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

ভাগীরথীর পূর্ব পারের মুর্শিদাবাদ জেলার অংশ, নদীয়া ও যশোহর জেলার ভূমি গঙ্গার ব-দ্বীপের 'মুমূর্ষু' অংশে পড়ে। এখানকার নদীর সঙ্গে পদ্মার সংযোগ না থাকায় (বর্ষাকালের দু-এক মাস ছাড়া) তারা সংকীর্ণতর হয়ে আসছে আর তাদের গর্ভও উচ্চতর হয়ে যাচ্ছে। তাদের দুই পাড়ের জমি আশপাশের ভূমির চেয়ে উঁচু আর তাদের খাত, নদী-বিজ্ঞানের অমোঘ নিয়ম অনুসারে, সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ার ফলে তারা পাশের ভূমিগুলির বৃষ্টির জল আর সুষ্ঠুভাবে নিকাশ করে দিতে পারে না। ভূমি ক্রমশঃ জঙলা জলায় পরিণত হয়ে শোল, মাগুর, শিঙ্গি, কই প্রভৃতি 'জাওলা' (জলা ?) মাছের ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, দেশের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে, ভূমির উর্বরাশক্তি ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে উত্তরোত্তর কম ফসল উৎপন্ন হচ্ছে ; এমন কি গত আশি বছরে লোকসংখ্যার হারও বাড়ে নি অথবা কমে এসেছে এ অঞ্চলে।

ইঞ্জিনিয়ারিং পরিকল্পনায় গঙ্গার 'মুমূর্ষু' ও 'পরিণত' অংশের প্রধান সমস্যা সেখানকার জল নিষ্কাশনের সমস্যা। সে কাজ না হলে, সহজেই বোঝা যায়, 'পরিণত' অংশ দিনে দিনে 'মুমূর্ষু' হয়ে যাবে। অনেক ইঞ্জিনিয়ারের মতে ব-দ্বীপের 'কর্মঠ' অংশে তাড়াতাড়ি মানব-বসতির প্রতিক্রিয়াতেই 'পরিণত' অংশের ক্ষতি হচ্ছে। কেননা 'কর্মঠ' অংশের খাঁড়ি নদীগুলির ধারে চাষের জন্য বাঁধ, ভেড়ি নির্মাণের ফলে মোহানার কাছে তাদের গর্ভ যথাসময়ের পূর্বেই তাড়াতাড়ি পলিতে ভরে উঠে জল নিষ্কাশনের পথে বাধা সৃষ্টি করছে, কাজেই তারা উপরের পরিণত অংশের জল আর টানতে পারছে না সুষ্ঠুভাবে। কলিকাতার পূর্ব দিকে কুলটি, পিয়ালি, বিদ্যাধরী, মাতলা প্রভৃতি নদী নষ্ট হয়েছে সুন্দরবনে চাষাবাদের জন্য বাঁধ, ভেড়ির কাজ হওয়াতে ; আর তারই ফলে বাগজোলা জলা, লবণ হ্রদ (Salt Lake) প্রভৃতি জলায় আজ আর জোয়ারের জল ঢোকে না কিংবা পলি পড়ার 'কর্মঠতা'ও নেই। কলিকাতা ও ভাগীরথীর পূর্ব তীরের শিল্পাঞ্চলের জল নিকাশের বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে গত চল্লিশ পঞ্চাশ বছরে।

পদ্মার জল অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে, গঙ্গার 'মুমূর্ষু' ব-দ্বীপ অঞ্চলের নদীগুলির খাতের উন্নতিসাধনই ইঞ্জিনিয়ারদের পরিকল্পনার প্রধান কথা।

কিন্তু আমার মনে হয়, সুন্দরবন অঞ্চলে মানুষের ক্রিয়াকলাপকে যতটা দায়ী করা হয়েছে, আসলে তা সত্যি নয়। বঙ্গোপসাগরের বিশিষ্ট প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়াকলাপেই সুন্দরবন অঞ্চলের নদী নষ্ট হয়, মানুষের কাজের কুফল নৈসর্গিক বিপর্যয়ে সহজেই মাঝে মাঝে সংশোধিত হয়ে যায়। কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তি সুন্দরবনের পশ্চিম অংশের নদীগুলিকে ধ্বংস করতে চায়। যতক্ষণ সেই প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া না হচ্ছে ততক্ষণ 'পদ্মার জল অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের নদীগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে বেশী দিন জীবিত রাখা যাবে না। সুন্দরবন অঞ্চলে বাঁধ, ভেড়ি নির্মাণ প্রভৃতি কৃত্রিম ক্রিয়াকলাপকে দায়ী করা অত্যন্ত ভুল। প্রাকৃতিক শক্তিই প্রধানতঃ দায়ী। এই প্রাকৃতিক শক্তির পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করাই হবে বাংলা দেশে সুষ্ঠু নদী-পরিকল্পনার লক্ষ্য। তা না হলে বাংলা দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গঙ্গার ব-দ্বীপের 'কর্মঠ' অঞ্চল ও সুন্দরবনের কথা

সুন্দরবন লোকশূন্য হয়েছিল কেন?

সমস্ত সুন্দরবন অঞ্চল যে এক সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। মাটির ভিতর থেকে এখনও অনেক প্রাচীন নিদর্শন পাওয়ার আশা আছে, যা থেকে ভূগোলশাস্ত্রবিদ্ টলেমি বর্ণিত বিভিন্ন নগরের অবস্থিতিস্থান নির্দিষ্ট করা যাবে।

রেনেলের মতে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মগেদের অত্যাচারে সুন্দরবন জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হয়।

অধ্যাপক নলিনীকান্ত ভট্টশালী কিন্তু সিদ্ধান্ত করেছেন, ষোড়শ শতাব্দীতে সমস্ত সুন্দরবন এলাকায় মাটি ধসে বসে যায় আর সেই সঙ্গে ওখানকার জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বাস্তবিক সুন্দরবনে ভূপ্রোথিত অট্টালিকা ও বৃহৎ বৃক্ষের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

প্রবল ঘূর্ণীবাত্যা ও সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস সুন্দরবনের বসতি অঞ্চল ধ্বংস করে দিয়েছে, এ কথাও অনেক সুধী মনে করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের আশ্বিনে ঝড়ের সময়ে বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলায় নাকি প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে ডুবে মরেছিল। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের জৈষ্ঠ্যের ঝড় ও প্লাবনের ধ্বংসলীলাও বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালির যথেষ্ট ক্ষতি করেছিল। ১৯৪২-এর আশ্বিনে মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রোপকূল অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাসের ইতিহাসও সকলের জানা আছে।

কিন্তু ভূগোলশাস্ত্রবিদ্ টমাস ওল্ডহ্যামের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল, সুন্দবরন অঞ্চলের জনশূন্য হয়ে যাবার প্রধান কারণ, ক্রমশঃ সেখানকার পানীয় জল সরবরাহের অবনতি। মোহানায় নদীগুলির (বিশেষতঃ সুন্দরবনের মধ্যে ও পশ্চিমাংশে) জলে সমুদ্রের জোয়ারের প্রাবল্যই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে গিয়েছে ও জল লবণাক্ত হয়ে গিয়েছে।

পূর্বাংশে নদীর উপর দিক থেকে প্রচুর পরিমাণে মিঠা জল সরবরাহের ফলে এখনও সেরূপ অবস্থা অসে নি। যেখানে পানীয় জল নেই, সেখানে মানুষের বসতি থাকতে পারে না। ওল্ডহ্যাম এই সব যুক্তি দিয়েছেন।

আমার কিন্তু মনে হয়, একটি বিষয়ের উপর ওল্ডহ্যামের দৃষ্টি যথেষ্ট আকৃষ্ট হয় নি। সেটি সুন্দরবন অঞ্চলের প্রচুর বৃষ্টিপাত, বছরে প্রায় ৭০"/৮০" ইঞ্চি। সচরাচর দেখা যায়, নদীর তীর থেকে আধমাইল, এক মাইল দূরে অবস্থিত মাঠের গ্রামগুলিতে, এমন কি ভাগীরথী-হুগলী প্রবাহিত অঞ্চলেও, মানুষ প্রধানতঃ বৃষ্টির জলই পানীয় জলরূপে ব্যবহার করে। কোথাও বৃষ্টির জল পুকুরে-দীঘিতে সঞ্চিত করা হয়, কোথাও বা অগভীর কূপ খনন করে বৃষ্টির জলের যে অংশ মাটির ভিতরে প্রবেশ করে, তাই সংগ্রহ করে মানুষ পানীয় জলের প্রয়োজন মেটায়। সুন্দরবনের যে অংশের ভূমি অপেক্ষাকৃত উঁচু, সেখানে এইভাবে পানীয় জলের

ব্যবস্থা হতে পারতো। বস্তুতঃ, আজ আবার সুন্দরবনের যেখানে পুনর্বসতি গড়ে উঠেছে, সেখানে এই বৃষ্টির জলই মানুষ পানীয় জলরূপে ব্যবহার করে। সুতরাং 'সুন্দরবনে পানীয় জলের অভাব হয়েছিল'—এ যুক্তি খুব সমীচীন মনে হয় না।

মগেরা প্রধানতঃ লুটপাট ও ক্রীতদাস ব্যবসায়ের জন্যে নারী ও সমর্থ পুরুষদের হরণ করে যে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল এ অঞ্চলে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও অবস্থাপন্ন শ্রেণীর মানুষ প্রথম দফাতেই মগপীড়িত এলাকা ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করে। বাংলার শাসকগণ ওই অঞ্চলের মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করবার কোনই ব্যবস্থা করতে পারে নি। অন্য দিকে মগেরাও (পর্তুগীজ জলদস্যু) সুন্দরবনে কোনও 'রাজ্য স্থাপন' করে শাসনপ্রণালীর প্রবর্তন করে নি। সুতরাং প্রথম শ্রেণীর মানুষ পলায়ন করবার পরে সাধারণ মানুষ আর কোনক্রমেই চাষাবাদের কাজ চালাতে পারলো না, অথবা মৎস্য শিকার প্রভৃতি কাজে লেগে থাকতে পারলো না। ক্রমে অঞ্চলটি পরিত্যক্ত হয়ে গেল। 'মগের মুল্লুক' থেকে পলাতক মানুষ বাংলা ভাষার চলিত কথায় তাদের মনের ইতিহাস রেখে গিয়েছে, আজও আমরা সে ইতিহাস ভুলি নি। (পর্তুগীজ কারভেলো, রডা প্রভৃতির সুন্দরবনের মধ্যে দুর্গের কথা শোনা যায়, পরবর্তীকালে ইংরেজদের কুঠির মত। কিন্তু পর্তুগীজরা, ইংরেজদের মত বাণিজ্য করতো না, প্রধানতঃ লুঠতরাজই করতো ওই সব দুর্গ থেকে)। এর সঙ্গে বর্তমানকালে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হিন্দু পল্লীর উচ্ছেদ অথবা পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলমান পল্লীর উচ্ছেদের তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু পরিত্যক্ত পল্লী ভিন্নধর্মীয় মানুষের দ্বারা অধিকৃত হওয়ায় পূর্ববঙ্গের হিন্দু পল্লীর অথবা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান পল্লীর অবস্থা ঠিক সুন্দরবনের মত হতে পারে নি। কারণ, এসব জায়গায় শাসনযন্ত্র রয়েছে (তা সে শাসনযন্ত্র যত স্বৈরতান্ত্রিকই হোক না কেন), যা মগেরা সুন্দরবন অঞ্চলে মোটেই প্রয়োগ করে নি। তারা শুধু ধনসম্পদ ও মানুষ লুটে নিয়ে চলে যেত, বিভীষিকা সৃষ্টি করে, 'মগের মুল্লুক' সৃষ্টি করে।

মগ-অত্যাচারের 'রাজনৈতিক' কারণ বসবাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী না হলে সুন্দরবন অঞ্চল কখনও মানুষ এভাবে পরিত্যাগ করতো না, এই আমার বিশ্বাস। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে যোঝাই মানুষের স্বভাব। ঘূর্ণীবাত্যা, জলোচ্ছ্বাস যতই ধ্বংস সাধন করুক না কেন, অবশিষ্ট মানুষ আবার নতুন উদ্যমে বেঁচে থাকার তাগিদে নতুন গঠন চালায়। সুন্দরবনের কোনও কোনও অংশ ধসে জলনিমজ্জিত হয়ে গেলেও বাকি অংশে আবার বসবাসের অসুবিধা ছিল না। আর সমস্ত অংশ এক সঙ্গে ধসে জলে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল, এ কথা মনে করবার কোনও সঙ্গত প্রমাণ নেই। সুতরাং মগ-অত্যাচারের 'রাজনৈতিক' কারণই সুন্দরবনের জনহীনতা ও শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে পরিণত হওয়ার প্রধানতম এবং হয়তো একমাত্র হেতু, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকে না। রেনেল প্রায় অব্যবহিত পরেই, স্থানীয় মানুষের কাছে অনুসন্ধান করেই বলেছেন, মগের অত্যাচারে সুন্দরবনের অঞ্চল জনহীন। তাঁর অঙ্কিত মানচিত্রে তিনি সুন্দরবন অঞ্চলের উপর ওই কথাটি লিখে দিয়েছিলেন, ঘটনাটি তাঁর মনে এমনই দাগ কেটেছিল। এ কথাটির গুরুত্ব ভোলা উচিত নয়।

সুন্দরবনে পুনর্বসতির বৈজ্ঞানিক দিক

নোনাজলের প্লাবন বাঁধ-ভেড়ির সাহায্যে সরিয়ে রেখে, শুধু বৃষ্টির জলের সহায়তায় চাষাবাদের কাজ সুন্দরবনের মানুষ চালিয়ে নিতে পারতো। বৃষ্টিজলেই পানীয় জলের অভাব সহজেই মিটতো। আজ সুন্দরবনের পুনর্বসতির কাজে এই বৃষ্টির জলই প্রধান অবলম্বন। বাঁধ ও ভেড়ি বেঁধে জোয়ারের জল জমিতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। খাল ও 'বাক্‌সোকল'-এর সাহায্যে অতিরিক্ত জল জমি থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়, ভাটার সময়ে। বৃষ্টির জল অতিরিক্ত লোনা জমি ২।৩ বছর ধরে 'ধুয়ে ধুয়ে চাষোপযোগী করে তোলে, তারপরে চাষ হয় বৃষ্টির জলের সাহায্যেই। অনেকদিন চাষ হওয়ার পর সামান্য জোয়ারের জলে আবার জমি ধুয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হয়, কারণ ধানের ফসলে সামান্য লবণ জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করে। অতিরিক্ত লবণই অপকারক। (বর্ধমান জেলায় ধানজমিতে কিছু কিছু লবণ ছড়ানোর রেওয়াজ আছে)।

কিন্তু মানুষের কৃত এই কৃত্রিম প্রক্রিয়াই সুন্দরবনের নদীগুলির প্রবাহ ও স্বাভাবিক কার্যের উপর প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করছে বলে অনেক ইঞ্জিনিয়ারের সুন্দরবনে পুনর্বসতি হতে দিতে আপত্তি।

আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। সুন্দরবনে পুনর্বসতির চেষ্টায় বাঁধ-ভেড়ি না বাঁধলেও ওখানকার নদীগুলিকে এক অবস্থায় রক্ষা করা যেত না, বঙ্গোপসাগরে জোয়ারের প্রাকৃতিক শক্তির দরুনই। কাজেই, আমি এ কথা মোটেই বলবো না, সুন্দরবনে বসতির চেষ্টা বন্ধ করা হোক, আর নদীগুলি তার 'স্বাভাবিক কাজ' করে চলুক। সভ্যতার অবদানে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে বশ করে সর্বত্রই বায়ু-জলের 'স্বাভাবিক কাজে' বাধা দিচ্ছে। সুন্দরবন অঞ্চলের নদীগুলির স্বাভাবিক কাজগুলিকে বশে আনার চেষ্টাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রকৃতির সঙ্গে যুঝে আর তাকে নানাভাবে বশ্যতা স্বীকার করিয়ে নিয়ে, মানুষের উপকারে লাগানোই হচ্ছে বিজ্ঞান ও টেক্‌নিকের কাজ। কিন্তু বিজ্ঞান ও টেক্‌নিকের সম্যক্ ব্যবহার করতে হলে, নদীর 'স্বাভাবিক কাজে'র সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় ও সেই 'কাজের' বৈজ্ঞানিক ভিত্তির অনুসন্ধান করতেই হবে প্রথমে। Scale Model Experiment—স্বল্পায়তনের নকল প্রতিকৃতি গড়ে কোনও কোনও নদীর (যেমন হুগলী নদীর) কাজের পর্যবেক্ষণ করবার চেষ্টা চলেছে আমাদের দেশের সরকারী মহলে। এই রকম নকলের উপর পরীক্ষা দ্বারা নদীতত্ত্বের কোনও কোনও দিকের স্বরূপ জানা যেতে পারে বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক নদীটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান সম্ভব নয়। কারণ প্রাকৃতিক নদীর, বিশেষতঃ সুন্দরবন অঞ্চলের নদীর, স্বল্পায়তন নকল তৈরি করানো আদপেই সম্ভব নয়। ঘূর্ণীবাত্যা, মাটি ধসে যাওয়া, জোয়ার ভাটার জটিল গতি, সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত পলিমঞ্চের উপরে জলের গতি ও পলিমঞ্চের পরিবর্তন, ঋতু অনুযায়ী তাপ প্রভৃতির পরিবর্তন, পৃথিবীর মেরুদণ্ডে আহ্নিক গতি প্রভৃতি বহু প্রাকৃতিক অবস্থায় সুন্দর-বনের নদীর অবস্থিতি। কাজেই সর্বাগ্রে প্রয়োজন এই নদীর স্থানীয় সংবাদের। আর সেইজন্যই সুন্দরবন অঞ্চলের নদীর ইতিহাস সমীক্ষা করে দেখবার প্রয়োজন বোধ করেছি। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন স্থানীয় সমস্ত তথ্যের সন্ধান। সরকারী মহল

'প্রতিকৃতি পাগল (model maniac) হয়ে ভ্রান্তপথে চলেছেন, ফলে সমস্যা দিন দিন জটিলতর হয়ে আসছে।

সংগৃহীত স্থানীয় সমস্ত পরিজ্ঞাত তথ্যের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মূলসূত্রের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারলেই, আমরা সুন্দরবনে 'নদী-শাসন' করতে পারবো। আর তাতে ক্ষতি না হয়ে, সমগ্র বাংলা দেশের কল্যাণ সাধনের কাজে তারা অংশ গ্রহণ করতে পারবে। অন্যথায়, বিপরীত ফলই ফলবে।

আজ তরল ও বায়বীয় গতি ও বলবিদ্যায় অনেক নতুন নতুন তত্ত্ব বৈজ্ঞানিকদের আয়ত্তে এসেছে। বিশেষতঃ আকাশপথে বিমান চালানোর টেক্‌নিকের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। অপরদিকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রেও অনেক নতুন তথ্য ও তত্ত্বের অধিকারী আমরা। বাংলা দেশের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের 'কর্মঠ' অংশের নদীগুলিকে বশে আনতে হলে, এই সব বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে অন্ধ থাকলে চলবে না। পরন্তু জ্ঞাত তথ্য ও তত্ত্বের জন্য আবার নিরর্থক পণ্ডশ্রম করে 'স্বল্পায়তন প্রতিকৃতি'র পর্যবেক্ষণ চালাবারও প্রয়োজন নেই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশের বর্তমান তথাকথিত গবেষণা বস্তুতঃ এই রকম পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছু নয়।

বৈজ্ঞানিক সমস্ত ব্যবহার্য তথ্য ও তত্ত্বের সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার না করেই সমস্যার সমাধানের যে উপায়ের সুপারিশ করেছেন সম্প্রতি গঠিত 'সুন্দরবন বিশেষজ্ঞ কমিটি', তাতে শুধু সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলা হবে সে সুপারিশ অনুযায়ী কাজ হলে। এই তদন্ত কমিটি তথাকথিত তদন্ত করে রায় দিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে যে সব ভূমি নদীর বুকে জেগে উঠেছে সেই সব জমিকে আবার লোনাজলে ডুবিয়ে দিতে হবে! পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যার অনুপাতে কর্ষণযোগ্য জমির অভাবটাই প্রধান সমস্যা, এ কথা তাঁরা মনে রাখেন নি। বোধ করি, মৎস্যচাষী বৃহৎ লাটদারদের স্বার্থই এই কমিটির কাছে প্রধান বিবেচ্য হয়ে উঠেছিল।

গত পঁচিশ বছর ধরে কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার ধুয়া তুলেছেন, এইরূপে ভূমি লোনাজলে ডুবিয়ে দেওয়াতেই সুন্দরবন অঞ্চলের নদীর খাত উন্নয়নের একমাত্র উপায়। তাঁরা কিন্তু এই পরিচ্ছেদের প্রথম অংশে বর্ণিত অন্যান্য কারণগুলির দিকে নজর রাখেন না। বাঁধ, ভেড়ি প্রভৃতি কৃত্রিম প্রক্রিয়া অনেকটা দায়ী হলেও, অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণের হাত সুন্দরবনের নদী মজানোর ব্যাপারে অনেক বড় ভূমিকা গ্রহণ করে, এ কথা তাঁদের মনে রাখা উচিত। আর যতক্ষণ পর্যন্ত এইসব কারণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ও সমীক্ষা করে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত, শুধু উঠিত জমি আবার লোনাজলে ডুবিয়ে দিয়ে সুন্দরবনের নদীদের সামলানো যাবে না।

সুন্দরবন উত্তর সমাক্ষরেখা ২১°-৩১´ মিনিট ও ২২°-৩৮´ মিনিটের মধ্যে ও পূর্ব দ্রাঘিমারেখা ৮৮°-৫´ ও ৯০°-২৮´ মিনিটের মধ্যে অবস্থিত প্রায় ৬,৫২০ বর্গমাইল পরিমাণ ভূমি। তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩০০০ বর্গ মাইল পড়েছে। পূর্বেই বলেছি, মাকড়সার জালের মত নদী নালায় এই অঞ্চল ভরা। অনেক

জায়গায় নদীগুলি এমনভাবে এঁকেবেঁকে পরস্পর কাকাকাটি করেছে যে, ফলে অনেক ভূমি দ্বীপের আকার ধারণ করেছে।

ব্রিটিশ আমলে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সুন্দরবন 'হাসিল' হতে আরম্ভ হয়। এই পুনর্বসতি পরিকল্পনা প্রধানতঃ বড় বড় ইংরেজ ও দেশীয় 'লাটদারদের' সহায়তায় শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত প্রায় ২২০০ মাইল বাঁধ বা ভেড়ি দেওয়া হয়েছে, নদীগুলির ধারে। তার মধ্যে মাত্র ২৬৫ মাইল বাঁধ সরকারী আর বাকি ১৯৩৫ মাইল বে-সরকারী, লাটদারদের দায়িত্বে রক্ষিত হয়। এই মাটির বাঁধ, সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রায়ই 'ঘোঁগ্' হয়ে ভেঙে যায় আর উঠিত চাষের জমিতে লোনাজল প্রবেশ করে কৃষকের সর্বনাশ করে। এই বাঁধগুলি যে, সুন্দরবনের নদীর গর্ভ উঁচু করার কাজ ত্বরান্বিত করেছে, সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই, আমরাও অস্বীকার করি না। তবে, আমার বক্তব্য এই যে, এই বাঁধ না দেওয়া হলেও, অপর স্বাভাবিক কারণ যেগুলি রয়েছে, তারই ফলে সুন্দরবনের পশ্চিমাংশের নদীর অবস্থা অবনত হয়ে যেতেও বিলম্ব হত না। জমিদারি উচ্ছেদের পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বাঁধগুলির রক্ষণের কাজে যদি ত্বরান্বিত না হন, তা হলে সমূহ ক্ষতি হতে পারে।

লক্ষ্য করবার মত এই যে, পশ্চিমবঙ্গেরই পূর্বাংশে রায়-মঙ্গল, কালিন্দী, পুরন্দর প্রভৃতি নদী অপেক্ষাকৃত সজীব রয়েছে আজও। কিন্তু পশ্চিমাংশে পিয়ালি, বিদ্যাধরী, বোয়ালিয়া, মাতলা, কলাগাছি, বৌঠাকুরুণ ও হাসনাবাদ থানার প্রায় সমস্ত নদীর গর্ভ আশপাশের ভূপৃষ্ঠ থেকে উঁচু হয়ে গিয়েছে। এখনও যদিও এই সব নদীতে জোয়ার-ভাটা খেলে, তা কিন্তু মুমূর্ষু রোগীর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মত দুর্বল। অথচ, মাতলা এই কিছুদিন পূর্বেও এক বিশাল ও গভীর নদী ছিল এবং এরই তটে পোর্ট ক্যানিং বন্দরের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল, কলিকাতা বন্দরের নাব্যপথের চেয়ে উন্নততর নাব্যপথ দেখে।

আরও পূর্ব দিকে, পাকিস্তানের নদীগুলি অপেক্ষাকৃত সজীব। তার মধ্যে পদ্মা-মেঘনার মোহানা যদিও সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে যথেষ্ট গভীর নয়, প্রসারে কিন্তু বিশালায়তন, প্রায় ১০।১২ মাইল।

খুলনা জেলায়, বিশেষ কারণে, সুন্দরবনের কোনও কোনও নদী আজও সমুদ্র-গামী জাহাজের পক্ষে নাব্য রয়েছে। বঙ্গোপসাগরের নিমজ্জিত পলির মঞ্চ যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ না করে, বলা শক্ত, কতদিন এই নদীগুলি এ রকম নাব্য থাকবে। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ করে, বিজ্ঞান ও টেক্‌নিকের সাহায্যে চালনার বন্দরের নাব্যপথ বজায় রাখা হয়তো অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। কিন্তু অন্যান্য প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণের জন্যে চালনায়, প্রথম শ্রেণীর বন্দর হওয়া খুবই শক্ত।

সুন্দরবনের পশ্চিম অংশের নদীগুলির অবস্থা খুবই হীন। বিশেষ কারণে ভাগীরথী-হুগলীই একমাত্র নদী যা আজও নাব্যতায়, গঙ্গার মোহানাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করবো পরবর্তী এক পরিচ্ছেদে।

পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সমস্ত নদীর পুনরুজ্জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করবে এখানকার সুন্দরবন অঞ্চলের নদীগুলির সমস্যার সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক সমাধানের উপর।

বাংলা দেশে নদীর মোহানাই সমস্ত নদীর ভিত্তি। মোহানার উন্নতি না হলে উচ্চতর অংশে নদী-পুনরুদ্ধারের কোনও আশা নেই। মোহানার উন্নতির সুব্যবস্থা না করে উচ্চতর অংশে নদীর পুনরুজ্জীবনে অর্থব্যয় সম্পূর্ণ অপব্যয় হবে। তাই সকলেরই দৃষ্টি প্রথমেই আকৃষ্ট হওয়া উচিত সুন্দরবনের নদীর উপর। আর সুন্দরবনের নদীর সুব্যবস্থা হলে, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও চব্বিশ পরগনার সমস্ত নদীর পুনরুজ্জীবনের কাজ সহজ হবে।

অনেকে মনে করেন, পদ্মা থেকে জল অনুপ্রবিষ্ট করাতে পারলেই সুন্দরবনের নদী পর্যন্ত সমস্ত নদীই আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে যাবে। তাঁদের এ ধারণা ভ্রমাত্মক। তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, গঙ্গা-পদ্মার সঙ্গে নদীর সংযোগ নষ্ট হয়ে গিয়েছে মোহানা নষ্ট হয়ে যাবার জন্যেই। ব-দ্বীপ গঠনের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে আর গঙ্গার ব-দ্বীপের বৈশিষ্ট্যের জন্যেই এরূপ ঘটেছে। গঙ্গার ব-দ্বীপের নিচে, নিমজ্জিত পলির মঞ্চটির স্বরূপ সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের সাহায্যেই সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব।

সপ্তম পরিচ্ছেদে ব-দ্বীপের 'কর্মঠ' অংশের প্রধান নদী হুগলীর প্রসঙ্গ আলোচিত হবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের 'মুমূর্ষু' ও 'পরিণত' অংশের নদীগুলি

পূর্ব-পাকিস্তানের ব-দ্বীপের নদী

ক্রমশঃ আমাদের আলোচনা পশ্চিমবঙ্গেই নিবদ্ধ করছি এই কারণে যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভুক্ত পূর্ববঙ্গের নদীগুলির সমস্যা সমাধান অপেক্ষাকৃত সহজই হবে। মূলসূত্র ধরতে পারলে, পশ্চিমবঙ্গের নদী সম্বন্ধে আলোচনা করেই, পূর্ববঙ্গের নদীর সমস্যা সমাধানের নির্দেশ পাওয়া যাবে। তিস্তা-ব্রহ্মপুত্রের বন্যার বিপুল জলপ্রবাহ আর মেঘনার স্বচ্ছ জলের খরতর স্রোতের সম্যক্ ব্যবহারে অতি সহজেই প্রায়-জীবন্ত পূর্ববঙ্গের ব-দ্বীপের নদী-শাসন করা যায়।

ব-দ্বীপের সর্বনিম্নভূমিতে খুলনা অবস্থিত। প্রাকৃতিক কারণেই ব-দ্বীপের মৃৎ-অভ্যন্তরের জল এখানকার নদীপথে এসে পড়ে, এ কথা পূর্বেই বলেছি। পশোর প্রভৃতি সুন্দরবনের নদীর উন্নয়ন করাও শক্ত নয়। পূর্বেই বলেছি, প্রাচীন মিশরীয় ও গ্রীক পর্যটকগণ ও বৈজ্ঞানিকগণ এখানেই গঙ্গার প্রধান মোহানা লক্ষ্য করেছিলেন এবং গঙ্গারিডি বন্দর দেখেছিলেন। খুলনার নদীর প্রাচীন গৌরব ফিরিয়ে আনা মোটেই শক্ত নয়।

সেই সঙ্গে পাকিস্তানের ভাগের 'মুমূর্ষু' ব-দ্বীপের, নদীয়া জেলার পূর্বাংশের ও যশোহর জেলার নদীর উৎকর্ষবিধানও করা যায় অপেক্ষাকৃত সহজেই। শুধু পাকিস্তানের উদ্যোগ ও আর্থিক সামর্থ্যের উপরই পূর্ববঙ্গের নদী সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে।

পশ্চিমবঙ্গের ব-দ্বীপের 'মুমূর্ষু' ও 'পরিণত' অংশের নদী

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের 'মুমূর্ষু' ও 'পরিণত' অংশে প্রবাহিত নদীর সমস্যা অপেক্ষাকৃত জটিলতর।

ভাগীরথীর পূর্ব পারে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও চব্বিশ পরগনা জেলার অধিকাংশ উত্তরভাগ নিয়ে এই অঞ্চল। ভাগীরথী, ভৈরব, জলঙ্গী, মাথাভাঙা, চূর্ণী, শিয়ালমারা প্রভৃতি নদী পদ্মা থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু বর্ষাকালে কয়েক সপ্তাহ ছাড়া, তাদের পদ্মার সঙ্গে সংযোগ নেই, এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। প্রাচীন যমুনার পরিত্যক্ত খাত (আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন) ত্রিবেণীর নিকট ভাগীরথী থেকে আরম্ভ। তেমনি ইচ্ছামতীর নামেমাত্র উৎস মাথাভাঙা নদীতে। যমুনার খাতটি ইচ্ছামতীর সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। মুখ্যতঃ জোয়ারের জলের উপর নির্ভর করে ইচ্ছামতী বেঁচে রয়েছে।

এই সমস্ত শাখা নদী প্রধানতঃ মাটির ভিতরে চোয়ানো জলের প্রণালীতে পর্যবসিত হয়েছে। স্বাভাবিক বাঁধ (levee) অথবা মানুষের হাতের কৃত্রিম বাঁধের বাধায় তারা এই অঞ্চলের ভূমির উপরের বৃষ্টির জলও টানতে পারে না। কাজেই এ অঞ্চলের ভূমি জলা ও অনুর্বর হয়ে যাচ্ছে। অনুর্বর হয়ে পড়ার প্রধান কারণ অবশ্য পদ্মা নদীর বন্যায় বাহিত পলির অভাব, কারণ পদ্মা আর তার বন্যার জল

এই সব নদীপথে পাঠাতে পারে না। এই সব শাখা নদীর উৎসের কাছে ও পরবর্তী অংশেও গর্ভ পার্শ্ববর্তী ভূপৃষ্ঠের চেয়ে উচ্চতর হয়ে গিয়েছে—তাদের ভিতরে বালি আর পলি জমে উঠে। কাজেই ওই সব খাতে বাহিত জলের পৃষ্ঠও পার্শ্ববর্তী ভূপৃষ্ঠের অনেক উপরে। বর্ষায় যখন পদ্মার সঙ্গে এদের সংযোগ হয়, তখন নদীর জল মাটির ভিতর দিয়ে চুয়ে নিম্নতর ভূমিতে দাঁড়ায়। ভূ-নিম্নস্থ জলপৃষ্ঠ (underground water table) এ অঞ্চলে উঁচু হয়ে গিয়ে নিম্নভূমিতে ভূপৃষ্ঠের উপরেই দেখা দিয়েছে। এরাই এ অঞ্চলের স্থায়ী জলাভূমি। এই সব জলাভূমি উঠিত করানোর কাজ এক সঙিন ব্যাপার এবং অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলেই মনে হয় আপাতদৃষ্টিতে। কিন্তু সুন্দরবন অঞ্চলের নদীগুলির খাতের গর্ভ যদি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় নিচু করিয়ে নেওয়া যায়, তা হলে, এই সব মুমূর্ষু নদীর পুনরুদ্ধার ও জলাজমি উঠিতের কাজ কঠিন হবে না বলেই আমি মনে করি।

মুমূর্ষু ভাগীরথী নদী

প্রথমেই মুমূর্ষু ভাগীরথীরই পরিচয় নেওয়া যাক। প্রাচীনকালে গঙ্গা নদী থেকে কেটে আনা খালপথে জল প্রবাহিত করে প্রাচীনতর কয়েকটি নদীর খাতে চালিয়ে ভাগীরথীর নাব্যপথের সৃষ্টি হয়েছিল বলেই আমার বিশ্বাস। পরে অবশ্য, ছোটনাগপুরের নদীগুলির বন্যার জলের সংঘাতে, পুরানো খাত থেকে ভাগীরথী অনেক পূর্ব দিকে হটে এসেছে এবং পূর্বতটবর্তী নবদ্বীপকে আজ পশ্চিমতটে নিয়ে গিয়েছে।

এই ভাগীরথী ক্রমশঃ ধীরে ধীরে মজে আসতে আরম্ভ করেছে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বেই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয় বছরও ভাগীরথী থেকে গঙ্গায় যাবার নাব্যপথ ছিল, আজ তা নেই। শুধু বর্ষাকালের কয়েকদিন ছাড়া গঙ্গাজলই আর ভাগীরথীতে প্রবাহিত হয় না। শুষ্ক ঋতুতে গঙ্গার জলপৃষ্ঠ থেকে ভাগীরথীর উৎসস্থানে তার গর্ভপৃষ্ঠ (bed-level) প্রায় ২০ ফুট উঁচু হয়ে গিয়েছে। চরের ভিতরে দিয়ে চুয়ে চুয়ে গঙ্গাজল অবশ্য আজও খানিকটা পৌঁছায় ভাগীরথীর খাতে, নতুবা হয়তো, ভাগীরথীর 'পবিত্রতা' সম্পূর্ণ ই বিলুপ্ত হয়ে যেত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতেও গঙ্গার বন্যা প্রবল প্রবাহে ভাগীরথীতে প্রবেশ করতো আর তার বাম তীরের পরপর ছয়টি স্বাভাবিক অথবা মনুষ্যনির্মিত বাঁধ ভেঙে দিয়ে দেশ প্লাবিত করে দিত। প্রসিদ্ধ ম্যালেরিয়াবিদ্ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : "একটা বাঁধ, বন্যার তোড়ে প্রায় আধমাইল দীর্ঘ স্থানে ভেঙে গিয়েছিল, আর প্রায় ৫০,০০০ কিউসেক জল প্রবাহিত হয়ে বনগ্রাম পর্যন্ত অঞ্চল প্লাবিত করে দিয়েছিল। প্রায় ২৮০০ বর্গ মাইল ভূমি প্লাবিত হয়েছিল।"

এই রকম প্লাবনের ফলে একটা সুফল পাওয়া যেত। সে সুফল প্রায় সকল সময়েই বন্যার কুফলের চেয়ে বেশী কাম্য ছিল পূর্ব যুগে। কারণ, দেশ তখন একমাত্র কৃষির উপরেই প্রধানতঃ নির্ভরশীল হতে বাধ্য ছিল। বন্যার জলের সঙ্গে প্রচুর পলিমাটি এসে জমিতে জমতো আর তাতে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পেত। বন্যা অবশ্য প্রতি বছর আসতো না। সাধারণতঃ ৪।৫ বছর অথবা ৯।১০ বছর অন্তর বড় বড় বন্যার জল দেশ প্লাবিত করতো। কাজেই এক প্লাবনে মাঠের

ফসল নষ্ট করলেও যে পলির সার জমিতে এসে পড়তো, পরের কয়েক বছরে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে মোটের উপর কৃষকের লাভই হত। তা ছাড়া ডাঃ বেণ্ট্লি, অ্যাডাম্স উইলিয়াম্স, ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সুধী গবেষণা করে প্রমাণিত করেছিলেন যে, বন্যার পলি ম্যালেরিয়ার মশককুল ধ্বংস করে দেশের ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করতো। উলিয়াম উইল্‌কক্‌স বলেছেন, বন্যার জলের সঙ্গের মাছের ছানারাই মশকের ডিম খেয়ে মশকবৃদ্ধি হতে দিত না। বন্যার ফলে ঠিক কোন্ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ম্যালেরিয়া প্রতিরুদ্ধ হত, তা আজও ঠিক জানা যায় নি। তবে সাধারণ একটা অভিজ্ঞতা বাংলা দেশে লক্ষ্য করা হয়েছে যে, বন্যার পরে কয় বছর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ঢের কমে যেত। হতে পারে, ফসলের সুবৃদ্ধির জন্যে, আর প্রচুর মৎস্য বৃদ্ধির ফলে পুষ্টিকর প্রোটিন খাদ্য খেয়ে দেশের মানুষের সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ার দরুনই তাঁরা ম্যালেরিয়া ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধ করবার বল পেতেন শরীরে, স্বাভাবিক প্রতিরোধ-শক্তি (immunity) গড়ে উঠতো হয়তো। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আরও গবেষণা না হলে সঠিক সিদ্ধান্ত দুরূহ।

মানুষের তৈরী করাই হোক, অথবা নদীর কার্যকারিতার স্বাভাবিক নিয়মেই হোক, নদীর তীরের ক্রমশঃ উঁচু করা বাঁধ এই সব বন্যা বন্ধ করেছে আর নদী-গর্ভেই পলি জমতে শুরু করেছে। তার পরে ক্রমশঃ নদীর গর্ভ উঁচু হয়ে আজ ভাগীরথী, জলঙ্গী-চূর্ণী প্রভৃতি নদী মজে এসেছে।

ভাগীরথীর নিম্নাংশে, হুগলী নদীতে কলিকাতার বন্দর ও শিল্পাঞ্চল তৈরি করতে নদীর জোয়ারের জল উপচানোর ভূমি (spill area) উঠিত করা হয়েছে আর নদীর পরিসর সঙ্কীর্ণতর করা হয়েছে। কলিকাতার স্ট্রাণ্ড রোড হুগলীর নদীগর্ভ থেকেই উঠিত করা হয়েছে, প্রায় দেড় শত গজ নদীর পরিসর সঙ্কীর্ণ করে। এই সঙ্কীর্ণতার ফলে জোয়ারের জলের গতিবেগ বৃদ্ধি পেয়ে ভাগীরথীর বহু দূর পর্যন্ত উঠতে আরম্ভ করে। এই জোয়ারের জল 'জলের বাঁধ' সৃষ্টি করে উপর থেকে জল নামবার পথে বাধা সৃষ্টি করে। দুই বিপরীতগামী স্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রবাহবাহিত পলি নদীগর্ভে থিতিয়ে পড়তে শুরু করে নবদ্বীপ থেকে উত্তরে নদীর অংশে। উচ্চতর অংশে ভাগীরথী, চূর্ণী-জলঙ্গী প্রভৃতির গর্ভে এইরূপে চরের সৃষ্টি হয়েছে। ভাগীরথীতে জোয়ার না থাকলে, কোনদিনই সে পদ্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হত না।

এই শতাব্দীর প্রথম বিশ বছরে লক্ষিত হয়েছিল যে, বছরে প্রায় তিন ইঞ্চি করে ভাগীরথীর গর্ভ উঁচু হয়ে যাচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। উচ্চাংশে ভাগীরথী, জলঙ্গী প্রভৃতি ক্রমশঃ মজে আসার ফলে, নদীবিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী তাদের খাত খুবই সর্পিল পথে পরিণত হয়েছে। ভাগীরথীতে জোয়ারই প্রধানতঃ এই ঘটনার জন্যে দায়ী। ১৯৫৯-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের প্লাবনের সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগীরথীর জল উজানে পদ্মার দিকে প্রবাহিত হয়েছে!

সম্প্রতি প্রস্তাব উঠেছে, ফরাক্কার কাছে বড় গঙ্গায় বাঁধ নির্মাণ করে, একটি নতুন খালপথে গঙ্গার জল ভাগীরথীতে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে বছরের সকল সময়ে অন্ততঃ ২০ হাজার কিউসেক (20,000 Cusecs) জলের প্রবাহ বৃদ্ধি করানো হবে। প্রস্তাবকদের বিশ্বাস, তার ফলে ভাগীরথীর খাতের উৎকর্ষ সাধিত হবে, তার

নাব্যতার উন্নতি হবে, কলিকাতা থেকে উত্তরে ভাগীরথী দিয়ে আর এই নতুন খালপথে বড় গঙ্গায় আবার নৌকা যাতায়াত করতে পারবে। তা ছাড়া তাঁরা মনে করেন, কুলটি, বিদ্যাধরী প্রভৃতি নিম্নাঞ্চলের মজা নদীগুলিরও পুনরুজ্জীবন সাধন করানো যাবে ভাগীরথীর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জলপ্রবাহের সাহায্যে। ফরাক্কা ব্যারেজ আদৌ নির্মাণ করা উচিত কিনা এবং তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে। পৃথক পরিচ্ছেদে ফরাক্কা ব্যারেজ সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম উইল্‌কক্‌সও পদ্মায়, রাজশাহী শহরের কয়েক মাইল পূর্বে, মাথাভাঙার উৎসস্থানের অব্যবহিত পরেই, 'নদীয়া ব্যারেজ' বাঁধ পরিকল্পনার সুপারিশ করেছিলেন, ভাগীরথী, জলঙ্গী, মাথাভাঙা, ভৈরব প্রভৃতি নদীর খাতের এবং প্রবাহের উন্নতি সাধন করবার জন্যে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের 'কর্মঠ' অংশের ভাগীরথী-হুগলী নদী ও কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা

হুগলীর নাব্যতার কথা

স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার ২১-৪-৫৩ তারিখের খবরে জানা যায় Norscot (নর্স্‌কট্) নামক তৈলবাহী জাহাজ কলিকাতা বন্দরে পৌঁছেছিল তার আগের দিন। জাহাজটি ১২,৭০৯ টনের; লম্বায় ৫৩৮ ফুট ও চওড়ায় ৭৩ ফুট। ১৪ নট্ (Knot) গতিতে চলতে পারে, আর ১৭,০০০ টন তৈল বহন করতে পারে। সাধারণতঃ মাত্র পূর্ণ জোয়ারের সময়েই সমুদ্রগামী জাহাজ কলিকাতা বন্দরে আসে। এই জাহাজটি পূর্ণ জোয়ারের সময়ে কলিকাতা বন্দরে আসবার সময়ে তার নিম্নের ২৬ ফুট অংশ ডুবে ছিল। 'বালারিবার' চরের কাছে প্রণালীর গর্ভ থেকে জাহাজের তলদেশে দু ফুটেরও কম 'পরিষ্কার' (clearance) ছিল। হুগলী পয়েন্ট থেকে আসতে অন্যান্য চরের কাছে মাত্র তিন ফুটেরও কম 'পরিষ্কারে' (clearance) জাহাজটিকে আসতে হয়েছে।

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে পি. এণ্ড ও. (P. & O.) কোম্পানির দুটো বড় জাহাজ (Norscot-এর চেয়ে বড়) কলিকাতা বন্দরে এসেছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান টুরিস্ট নিয়ে ৩০,০০০ টনের 'বেলজিয়ান ল্যাণ্ড' (Belgian Land) জাহাজ ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত আসতে পেরেছিল।

উপরোক্ত সংবাদ পড়লে সহজেই বোঝা যায়, হুগলী নদীর নাব্য প্রণালীতে, চরগুলির কাছে আর ২।৩ ফুট উঁচু পলি জমলেই 'নর্স্‌কটে'র মত ২৬ ফুট ড্রাফটের জাহাজ হুগলী নদী দিয়ে চলাফেরা করতে এবং কলিকাতা বন্দরে আসতে পারবে না। ৪।৫ ফুট উঁচু পলি জমলেই, আজকের দিনের অধিকাংশ ছোট জাহাজের পক্ষেই কলিকাতা বন্দর নিষিদ্ধ হবে।

নবদ্বীপের কাছে জলঙ্গী নদীর সঙ্গম থেকে ভাগীরথীর নিম্নভাগ হুগলী নদী নামে পরিচিত হয়েছে ইউরোপীয় বণিকদের এদেশে আগমনের সময় থেকে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ নদী, অন্ততঃ হুগলী শহর পর্যন্ত খুবই ভালো নাব্য ছিল। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে, মহারাজা নন্দকুমার যখন মুসলমান নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার অধীনে হুগলীর ফৌজদার, ইংরেজের **যুদ্ধের জাহাজ** ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে তোপ দেগে এসেছিল হুগলী নদী বেয়ে। সুতরাং সে সময়ে চন্দননগরের কাছে হুগলী নদীতে, তখনকার যুদ্ধের জাহাজের নাব্য গভীরতার উপযোগী অন্ততঃ ১৫।২০ ফুট গভীর জল ছিল। আজ ৫।৬ ফুট গভীর জলও চন্দননগরের কাছে হুগলীর নাব্য প্রণালীতে পাওয়া যায় না। ১৯৪২।৪৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান আর্মির ইঞ্জিনিয়ারেরা কাঁচড়াপাড়া থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিকল্প পথের সন্ধানে জল মেপে দেখেছিলেন, উপযুক্ত গভীরতা পান নি, চন্দননগরের কাছে, এমন কি মাঝারি স্টীমারের উপযোগীও। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে

ইংরেজের ফরাসী-চন্দননগর আক্রমণের পূর্বেই, সরস্বতীর নাব্যপথ মজে এসেছিল। তাই কয়েক বছর আগে, আলিবর্দীর সময়ে, কলিকাতার নিচে, সরস্বতীর মোহানার সঙ্গে হুগলীর প্রবাহপথ জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এ কথা পূর্বেই বলেছি। সরস্বতীর এই মোহানা, অর্থাৎ মোটামুটি ডায়মণ্ডহারবার থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত অংশ ছোটনাগপুর থেকে উদ্ভূত প্রাচীন নদীর সমুদ্র-সঙ্গমের মোহানা, এ কথাও পূর্বে বলেছি। বহু প্রাচীনকালেই তাম্রলিপ্তি বন্দর (বর্তমান তমলুক শহর) এই মোহানার উপরে একেবারে সমুদ্রের কূলেই অবস্থিত ছিল। বর্তমান তমলুক সমুদ্র থেকে ৫০ মাইল হটে এসেছে। অর্থাৎ নদীগুলির ব-দ্বীপ গঠনের ফলে গত দুই হাজার বছরেই এখানে এতটা নতুন ভূমির সৃষ্টি হয়েছে। তমলুক থেকে রূপনারায়ণ নদের খাত মানচিত্রে একটু নিরীক্ষণ করে দেখলেই বোঝা যায়, এটি আজ মুখ্যতঃ রূপনারায়ণ নদেরই মোহানা। হুগলী নদী প্রায় লম্বভাবে এসে এই রূপনারায়ণের মোহানায় পড়েছে। শুধু হুগলীর আভিজাত্যের দরুন রূপনারায়ণের প্রকৃত মোহানাকে হুগলী নদী বলা হচ্ছে।

হুগলী নদীতে জোয়ার-ভাটা

আজ ভাগীরথীর এই হুগলী নদী অংশ প্রধানতঃ বঙ্গোপসাগরের জোয়ার-ভাটার প্রবাহেরই বাহক হয়ে রয়েছে। ভাগীরথীর পশ্চিম পারের উপনদীগুলি, অর্থাৎ ময়ূরাক্ষী, অজয় এবং বাঁকা, বেহুলা প্রভৃতি ছোট ছোট নদী, শুধু বর্ষা-কালেই খানিকটা জল সরবরাহ করে হুগলী নদীতে। মাটির নিচে জমা বৃষ্টির জল, আর অববাহিকার বর্ষার জলও আসে। কিন্তু এই সব শেষোক্ত জলের পরিমাণ সামান্যই, তার জোরে হুগলী নদীর প্রবাহ বেঁচে থাকতে পারতো না। মূল গঙ্গার আংশিক জলও আসে। আর জোয়ার-ভাটার প্রবাহই হুগলী নদীকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এর ফলে হুগলী নদীর জল দিন দিন অধিকতর লোনা হয়ে যাচ্ছে। বিশেষতঃ কলিকাতার কাছে এর জলের লবণের পরিমাণ গত ৩০।৪০ বছরে অনেক বেড়ে গিয়েছে। পূর্বে কলিকাতা করপোরেশনের পলতার জলকলের কাছে দশ লক্ষ ভাগ হুগলী নদীর জলে সর্বোচ্চ লবণের পরিমাণ (মে মাসের শেষে) হত ২০০ ভাগ। গত ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন সেই পরিমাণ বেড়ে ২০৭৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে। (এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভালো, সমুদ্রের জলে লবণের পরিমাণ দশ লক্ষ ভাগে প্রায় ৩০,০০০ ভাগ)। বর্ষার জল ঢুকতে আরম্ভ করলেই লবণের পরিমাণ কমতে থাকে। ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ মাসে সর্বনিম্ন অর্থাৎ জলের দশ লক্ষ ভাগে মাত্র ৮ ভাগ লবণ পাওয়া যায়। পূর্বে যখন গঙ্গা থেকে হিমালয়ের গলিত তুষারের জল গ্রীষ্মকালে হুগলী নদীতে পৌছতো, তখন জল খুবই সুস্বাদু এবং কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ হত—এ কথা আজও অনেকের মনে আছে।

সমুদ্রের লোনা জল সাধারণ জলের চেয়ে ওজনে ভারী। তাই আজ হুগলী নদীর গর্ভের কাছের জল উপরের জলের চেয়ে বেশী লোনা। কলিকাতার কাছে হুগলী নদী জোয়ারের সময় সবচেয়ে গভীর গর্তে (deepest scour) গভীরতা পায় প্রায় ষাট ফুটের কাছাকাছি।

হুগলী নদীর চর

কলিকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত অনেকগুলি চর পড়েছে, হুগলী নদীতে। পোর্ট কমিশনারকে সমুদ্রগামী জাহাজের নাব্যপথ পরিষ্কার রাখবার জন্যে এই চর খনন কার্যে (dredging, ড্রেজিং-এ) বাৎসরিক প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয়। এই চরগুলির মধ্যে জেম্‌স মেরির চর প্রসিদ্ধ। পোর্ট কমিশনার সব সময়েই জলের গভীরতা মেপে জাহাজওয়ালাদের জানান, তবু মাঝে মাঝে দু-একটি জাহাজ চরে আটকে যায়। সংবাদপত্রের অনুসন্ধিৎসু পাঠক সে সংবাদ জানেন। তা ছাড়া পাইলট পাঠিয়ে সাগরের মুখ থেকে জাহাজ আনা হয় আর পাইলট জাহাজ সাগর পর্যন্ত নিয়ে যায়।

ডায়মণ্ডহারবার থেকে নিচে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত তিনটি চর আছে হুগলী নদীতে। এ চরগুলি এ যাবৎ নাব্যপথে বিশেষ বিঘ্নের সৃষ্টি করে নি।

হুগলী নদীর জলের পলি কোথা থেকে আসে?

স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, গঙ্গার সঙ্গে ভাগীরথীর আজ আর যখন সংযোগ নেই বর্ষাকাল ছাড়া, তখন গঙ্গার পলি তো আজ আর হুগলী নদীতে বিশেষ নীত হচ্ছে না। তখন কেন কলিকাতা বন্দরের নাব্যপথে এইসব চর বৃদ্ধি পায়। অবশ্য দামোদর-রূপনারায়ণ এবং কাঁসাই-হলদি বর্ষার বন্যায় কিছু বালি আর পলি হুগলী নদীর নিম্নাংশে এনে ফেলে, কিন্তু সেই পলি কি এইসব চর বৃদ্ধি করে হুগলীর নাব্যপ্রণালীর গভীরতা হ্রাস করতে যথেষ্ট? নিম্নাংশে হুগলী-প্রবাহের বৈশিষ্ট্যের কারণে দামোদর-রূপনারায়ণ, কাঁসাই-হলদি'র বন্যার পলি আদপেই হুগলী গর্ভে অবক্ষেপিত হয় না, পর্যবেক্ষণ করলেই তা বোঝা যায়।

দামোদরের সর্বোচ্চ বন্যা মেপে দেখা গিয়েছে, প্রায় ৬½ লক্ষ কিউসেক। তাও মাত্র বছরে ২।১ দিন দামোদর এই হারে পাহাড়ের জল নামায়। এ দিকে নিত্যই প্রায় বিশ লক্ষ কিউসেক জোয়ারের জল হুগলীতে প্রবেশ করছে। সুতরাং এ কথা নিশ্চিত যে বঙ্গোপসাগরের নিমজ্জিত পলির মঞ্চ থেকে জোয়ারবাহিত পলি এসে হুগলীর নাব্যপ্রণালীতে জমা হয় এবং চর সৃষ্টি করে।

প্রতিদিন দুইবার জোয়ার আসে আর দুইবার ভাটা। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, জোয়ারের গতি ভাটার গতির চেয়ে বেশী, আর বারো ঘণ্টার মধ্যে সাত ঘণ্টা ভাটার টান থাকে, কিন্তু জোয়ারের টান মাত্র প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। সুতরাং দীর্ঘস্থায়ী ভাটার মন্দগতির সময়ে, জোয়ারের জলের সঙ্গে সাগর থেকে আনা পলি হুগলীর গর্ভে থিতিয়ে পড়ে। শ্রী এস. সি. মজুমদার প্রমুখ ইঞ্জিনিয়ারেরা স্থির করেছেন, এই কারণেই সুন্দরবন অঞ্চলের নদীগুলির মোহানার গর্ভে পলি পড়ে মজে যাচ্ছে। হুগলী নদীও এইভাবে ক্রমশঃ মজে আসবে। আর এর প্রতিকারের জন্য ফরাক্কা ব্যারেজ পরিকল্পনায় বড়গঙ্গায় বাঁধ বেঁধে অন্ততঃ ২০,০০০ কিউসেক গঙ্গাজল ভাগীরথী-হুগলীতে অনুপ্রবিষ্ট করাতে হবে। তাঁদের ধারণা, সেই জলের সাহায্যে হুগলী নদীর পলি ভাটার সময়ে সমুদ্রে চলে যাবে আর সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে হুগলীর নাব্যপ্রণালী অব্যাহত থাকবে। বিশেষ পর্যবেক্ষণ ও বিচার করেই আমার সিদ্ধান্ত কিন্তু এই যে, মজুমদার মহাশয়ের সমস্যার বিশ্লেষণ মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়।

দামোদরের উচ্চ উপত্যকার বন্যা নিরুদ্ধ হলে অনতিবিলম্বে হুগলী নদীর নাব্যতা ধ্বংস হবে

দামোদর পরিকল্পনার কাজ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে, গত ৬।৭ বছর ধরে আমি বার বার কর্তৃপক্ষকে নানা পন্থায় জানাতে থাকি, দামোদর নদের পার্বত্য অংশের বন্যা মাইথন, পাঞ্চেৎ প্রভৃতি বাঁধে নিরুদ্ধ হলে, হুগলীর নাব্যপ্রণালী অতি অল্প সময়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি বলেছি, **যদি ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে মাইথন ও পাঞ্চেৎ-এর বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে যায় আর দামোদরের বন্যা হয়, তা হলে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই অর্থাৎ ৫ বছরেই কলিকাতা বন্দরের সমুদ্রগামী জাহাজের নাব্যপথ ধ্বংস হয়ে যাবে।**

কর্তৃপক্ষকে পত্রাঘাত ও সংবাদপত্রে লেখালেখির ফলে ভারত গভর্নমেণ্ট 'হুগলী বিশেষজ্ঞ কমিটি' নিযুক্ত করেন ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে। সেই বছর জুলাই মাসে উক্ত কমিটি তাঁদের অভিমত জানান যে, জোয়ারের জল এত প্রচুর যে, দামোদরের জল না এলেও হুগলীতে **জলের অভাব হবে না**। তবে স্বাভাবিক যে সব কারণে কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে আসছে, তার প্রতিবিধানের জন্য, কতকগুলি নদী-শাসনের কাজ (River Training Works) করা দরকার। পুণার জল সম্বন্ধে গবেষণা কেন্দ্রে ক্ষুদ্রায়তন প্রতিকৃতিকে পরীক্ষা করে এইসব নদী-শাসনের কাজ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে। তাঁরা ফরাক্কা ব্যারেজ পরিকল্পনা কার্যকরী করবারও সুপারিশ করেন—প্রধানতঃ ভাগীরথীতে গঙ্গা অবধি নাব্যপথের উৎকর্ষ সাধন, কলিকাতা অঞ্চলের পানীয়জলের উন্নতি প্রভৃতির জন্য।

আমার বক্তব্য শোনবার জন্য উক্ত 'কমিটি' অবশ্য আমায় আহ্বান করেন নি। হুগলীতে **জলের অভাব** আছে অথবা হবে, এ কথা আমি কখনও বলি নি। বন্যার জলের বলবিদ্যা সম্বন্ধীয় যে প্রশ্ন আমি তুলেছি, কমিটির প্রকাশিত সিদ্ধান্তে সে প্রশ্ন সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ অথবা তার কোনও উত্তর দেখতে পাওয়া যায় না। সংবাদপত্রে কমিটির অভিমত ও সুপারিশ অবগত হয়ে দৃঢ় ভাষায় আমি জানাতে থাকি, **দামোদরের বন্যা নিরুদ্ধ হলেই প্রায় ৫ বছরের মধ্যে কলিকাতা বন্দরের নাব্যপথ ধ্বংস হয়ে যাবে**। আর ফরাক্কায় ব্যারেজ বেঁধে ২০,০০০ কিউসেক গঙ্গাজল অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে এই নাব্যপথের ধ্বংস রোধ করা যাবে না।

সম্প্রতি দেখতে পাচ্ছি, উক্ত 'হুগলী বিশেষজ্ঞ কমিটি'র অন্যতম সভ্য শ্রীমজুমদার ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে একটি লেখা ছাপিয়ে প্রচার করেছেন যে, তিনিও মনে করেন, দামোদরের বন্যা নিরুদ্ধ হলে **সম্ভবতঃ** কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর মত হচ্ছে, ফরাক্কা ব্যারেজ নির্মাণ করে গঙ্গাজল অনুপ্রবিষ্ট করাতে পারলেই এর প্রতিবিধান হবে। তিনি মনে করেন যে, বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রস্তাবিত হুগলী-শাসনের কাজের দ্বারা হুগলীর নাব্যতা রক্ষা করা যাবে না।

কেন্দ্রীয় জল ও শক্তি কমিশন (Central Water and Power Commission)-এর চেয়ারম্যান শ্রীকানোয়ার সইন গত ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে

অক্টোবর কেন্দ্রীয় সেচ ও শক্তি বোর্ডের (Central Board of Irrigation and Power) চতুর্বিংশতিতম সভায়, প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর উপস্থিতিতে নয়াদিল্লীতে বলেছেন, নদীর উপরি অংশে বন্যাবিরোধী বাঁধ নির্মিত হলে তার **নিম্নাংশের নাব্যতা রক্ষা করা মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে পড়বার কথা**। দামোদরের বন্যাবিরোধী বাঁধের ফলে কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা, আমার ভবিষ্যৎ উক্তি মত, ধ্বংস হয়ে গেলে, পাছে দেশের লোক পরে এঁদের নিন্দা করেন, তাই বোধ করি, সাবধানী ভাষায় শ্রীকানোয়ার সইন উক্তরূপ উক্তি করে নিজের দোষ কাটিয়ে রাখছেন। স্বল্পায়তনের প্রতিকৃতির উপর পরীক্ষা চালিয়ে যে এইরূপ সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ বোঝার উপায় নেই, সে কথাও তিনি স্বীকার করেন।

দেখা যাচ্ছে, শ্রীমজুমদার ও শ্রীসইন আমার অভিমতের কতকাংশ এতদিনে মেনে নিচ্ছেন। প্রথম কথা মেনে নিচ্ছেন, দামোদরের বন্যা নিরুদ্ধ হলে হুগলীর নাব্যপ্রণালীর ক্ষতি হবে। আর দ্বিতীয় কথা মেনে নিচ্ছেন, স্বল্পায়তনের প্রতিকৃতির উপর পরীক্ষা চালিয়ে হুগলীর সমস্যার স্বরূপ বোঝা যাবে না। এই কথাগুলি আমি তাঁদের বহুদিন ধরে বোঝাতে চেষ্টা করে এতদিনে খানিকটা কৃতকার্য হয়েছি। কিন্তু তথাপি তাঁরা সমস্যার গুরুত্ব (seriousness) ও জরুরৎ (urgency) সম্বন্ধে যে আমার মত সম্পূর্ণ সচেতন, তা তাঁদের প্রকাশিত কথা থেকে বোঝায় না। বরং সরকারী প্রচার-বিভাগ অবিরত চেষ্টা করছেন, লোকচক্ষুর সামনে সমস্যাটিকে উড়িয়ে দিতে। আমি যে বলছি, '১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে দামোদরের বন্যা নিরুদ্ধ হলে, ১৯৬০-এর মধ্যে, অর্থাৎ ৫ বছরে কলিকাতা বন্দরের সমুদ্রগামী নাব্যপথ ধ্বংস হবে'—এই কথাটিতে তাঁদের দলের কেউ **প্রকাশ্যে** এখনও সায় দেন নি।

দামোদরের বন্যা নিরোধের ফলে কলিকাতা বন্দরের নাব্যপথ ধ্বংসের বৈজ্ঞানিক যুক্তি

কিন্তু আমি কেন এ বিষয়ে এত দৃঢ়মত পোষণ করছি আর গঙ্গার জলের সাহায্যে নাব্যপথের ধ্বংস রোধ করা যাবে না—অথবা সাধারণ নদী-শাসনের কাজের সাহায্যে হুগলীর নাব্যপথ রক্ষা করা যাবে না, এই কথা বার বার বলছি, তার যুক্তিগুলি খুলে বলা দরকার আজ সর্বসাধারণের কাছে। কর্তৃপক্ষ মহলে বার বার আর সংবাদপত্রে বিচ্ছিন্নভাবে এ যুক্তিগুলি ইতিপূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

প্রথমেই বলা দরকার, শ্রীযুক্ত মজুমদার প্রমুখ শ্রদ্ধেয় ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে হুগলী নদীতে (অথবা সুন্দরবন অঞ্চলের অন্যান্য নদীতে) পলিপাতনের সম্বন্ধে আমার বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের পার্থক্য আছে। তাঁরা জোয়ারের সময়ে বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে অথবা নদীর মোহানা থেকে যে পলি আসে বলে মনে করেন, সেটা প্রধানতঃ জলের সঙ্গে 'ঝোলানো' (suspended) অবস্থায় আসে বলে ধরে নিয়েছেন। এই পলি ভাটার সময়ে এবং বিশেষ করে জোয়ার-ভাটার মধ্যবর্তী স্থির সময়ে নদীগর্ভে পতিত হয়, এই তাঁদের অভিমত। আমিও এ মতের সঙ্গে একমত এবং স্বীকার করি এই 'ঝোলানো' পলি জমে নদীর গর্ভ

উচ্চতর করে ক্রমে ক্রমে বহুবর্ষ ধরে। ৫।১০ বছরেই এই জমা পলির কুফলে হুগলীর নাব্যতা ধ্বংস হতে পারে না, আরও অনেকদিন লাগবার কথা। এবং অনুপ্রবিষ্ট ২০,০০০ কিউসেক গঙ্গাজলের প্রবাহ এর প্রতিবিধানও হয়তো করতে পারে।

কিন্তু আমি দেখছি, আর এক শ্রেণীর অর্ধতরল, মণ্ডের মত, অত্যধিক লবণাক্ত পলি, যা নদীর মোহানার নিচে নিমজ্জিত পলিমঞ্চের উপরিভাগে থাকে আর জোয়ারের জলের উচ্চাভিমুখী গতির সঙ্গে সঙ্গে, নদীর জলের নিচের স্তরে, নদীগর্ভের গা বেয়ে লাভা-প্রবাহের মত মোহানায় অনেক দূর পর্যন্ত উঠে আসে। গঙ্গার মোহানাগুলিতে বঙ্গোপসাগরের জোয়ার ১৮ থেকে ৩০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে উঠে আসে (মাদ্রাজের উপকূলে বঙ্গোপসাগরের জোয়ার কিন্তু ৪।৫ ফুটের বেশী উঁচু হয় না)। ভাগীরথী-হুগলীর মোহানায় জোয়ারের এই বৈশিষ্ট্যের কথাও মনে রাখতে হবে। এই অর্ধতরল মণ্ডের মত পলির পরিমাণ, জোয়ারের জলে 'ঝোলানো' (suspended) পলির পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশী। নদীর মোহানা থেকে দূরে উপরিভাগে এসে ক্রমশঃ এই মণ্ডপলি নদীর জলের বিভিন্ন স্রোতধারা ও ঘূর্ণীর আলোড়নে, কিছুটা জলে 'ঝোলানো' পলিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু গভীরতর নিম্নাংশে, গর্ভের কাছে, পলির ঘনতা ক্রমশঃ বেশীই থাকে। এবং অনুসন্ধান করলে, অন্ততঃ রূপনারায়ণের মুখ পর্যন্ত একটা পলিমণ্ডের ঊর্ধ্বমুখী 'লাভা-প্রবাহে'র অস্তিত্ব পাওয়া যাবে, অন্তঃশীলা প্রবাহের মত হুগলীর জলের নিম্নতর স্তরে।

বঙ্গোপসাগরে গঙ্গার মোহানার নিচে নিমজ্জিত পলিমঞ্চটির উপর সমুদ্র জলের গভীরতা ২০।৩০ ফুটের বেশী নয়, মোহানাগুলির জলপ্রণালীর সামনেই শুধু এই গভীরতা ২০।৩০ ফুট, আশে পাশে আরও কম। অর্থাৎ নিমজ্জিত পলিমঞ্চ ধরে, নদীগুলির নিমজ্জিত 'খাত' রয়েছে। সমুদ্রের মধ্যে প্রায় ৪০।৫০ মাইল দূর পর্যন্ত এই গভীরতা ক্রমোনিম্ন হয়ে গিয়েছে। মোহানার দ্বীপের ভূমিগুলির সম্মুখে স্বভাবতঃই গভীরতা কম, প্রায় ভূপৃষ্ঠেরই (অর্থাৎ সমুদ্রজলপৃষ্ঠ, Sea level) সমান উচ্চতা থেকে সমুদ্রের মধ্যে প্রায় ৫০ মাইলে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে ৩০ ফুট গভীরতার রেখায় মিশেছে। তার পরেই সহসা গভীর জল আছে সমুদ্রে। এই উচ্চাবনত নিমজ্জিত পলিমঞ্চটির উপর মণ্ডপলির প্রবাহ সকল সময়েই নদীর মোহানা-পথের গভীরতার দিকে ধাবিত হচ্ছে, আর জোয়ারের সময়ে নদীগর্ভে উঠে আসছে। সুতরাং হুগলী নদীতে, উপর দিক থেকে সম্পূর্ণ পলিবর্জিত স্বচ্ছ জল পাঠালেও, নিম্নাংশে প্রচুর পলির অভাব হয় না।

এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, নির্মজ্জিত পলিমঞ্চটির পলির সরবরাহ অটুট থাকবে, যতক্ষণ পদ্মা-মেঘনা প্রভৃতি গঙ্গার অপর মুখগুলি দিয়ে পলিমিশ্রিত জল এই মঞ্চের উপর নামবে।

যাঁদের কলিকাতার শিল্পাঞ্চলে ইটখোলার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা জানেন হুগলীর জলের উপরের ভাগের 'ঝোলানো' পলি মাত্র কয়েক মাস থিতিয়ে ৬ থেকে .০ ফুট গভীর পলিমাটি সংগ্রহ করে ওই সব ইটখোলাগুলির মালিকেরা। নদীগর্ভের অনুকূল অবস্থায় এক বছরে ১৫।২০ ফুট গভীর পলির

চর পড়ে যাওয়া কিছু শক্ত নয় মাত্র 'ঝোলানো' পলির সাহায্যে। (এই রকম অবস্থা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করে 'নদী-শাসনের কাজে'র প্রস্তাব হয়েছে হুগলী নদীতে)। আর যদি এই সঙ্গে মনে রাখা যায় যে, আজই জোয়ারের সময়ে মাত্র কোনও প্রকারে সমুদ্রগামী জাহাজের নাব্যপ্রণালীর জন্য প্রয়োজনীয় গভীরতাটুকু মাত্র পাওয়া যায়, তাহলে প্রতিকূল অবস্থায় ২।৫ বছরে এই নাব্যপ্রণালী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়। এমন কি এক বছরেই প্রণালীর নাব্যতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু শুধু এই 'ঝোলানো' পলিই নয়, মণ্ডপলি লাভা-প্রবাহের মত হুগলী নদীতে প্রত্যেক জোয়ারে উঠে আসছে, এই কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। আর বঙ্গোপসাগরের নিমজ্জিত পলিমঞ্চ থেকে আগত এই মণ্ডপলি সারা বছর ধরে (বন্যার ঋতু ছাড়া) হুগলীর গর্ভে সঞ্চিত হচ্ছে। চরগুলি সৃজনের কাজে (বিশেষতঃ জেম্‌স মেরির চর থেকে সমুদ্রের দিকের চরগুলি সৃজনের কাজে) এই অর্ধতরল মণ্ডের মত পলির (viscous slurry silt) ভূমিকাই অত্যন্ত বেশী। রূপনারায়ণের নিম্নভাগের চোরাবালির চরগুলিও এই পলিতে তৈরী হয়, বন্যার ঋতু ছাড়া সারা বছর ধরে।

বঙ্গোপসাগরের নিমজ্জিত মঞ্চের উপরকার অর্ধতরল মণ্ডের মত পলিদ্বারা নদীর খাত ধ্বংসের কাজ যদি অন্য কারণে ব্যাহত না হত, তা হলে, নিম্ন-হুগলীর নাব্যপ্রণালী বহু পূর্বেই ধ্বংস হয়ে যেত। দামোদরের বন্যাগুলিই, ডায়মণ্ডহারবারের কাছ থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত হুগলীর খাতকে এই মণ্ডপলি (slurry silt) দ্বারা ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, বছরে বছরে আবার তাদের সাগরে ঠেলে নিয়ে গিয়ে। প্রতি ৭।৮ বছর অন্তর দামোদরে বড় বন্যা নামে, তার ফলে হুগলী নদীর নাব্যখাতের আরও উন্নতি হয়।

পূর্বে বলেছি জোয়ার-ভাটার সন্ধি সময়ে সবচেয়ে বেশী আর তার পরে ভাটার সময়টুকুতে যখন নদীর স্রোত অপেক্ষাকৃত মন্দগতি থাকে, তখনই নদীগর্ভে পলি অবক্ষেপিত হয়। নিম্ন-হুগলীর ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয় দামোদরের বন্যার ঋতুতে।

দামোদরের বন্যায় যে পলি ও সূক্ষ্ম বালি হুগলী পর্যন্ত নীত হয়, তার কোনও অংশই কোনও সময়েই ডায়মণ্ডহারবার ও গেঁয়োখালির নিচে নিম্ন-হুগলীর গর্ভে অবক্ষেপিত হবার সুযোগ পায় না। বন্যার ঋতু ছাড়া অন্য ঋতুতে ভাটার সময়ে শুধু মণ্ডপলিই এই অংশে হুগলীগর্ভে অবক্ষেপিত হয়। কারণ হুগলী নদীর এই নিম্নাংশে বন্যার সময়ে ভাটার টানও খুব প্রবল, সেই টানে জলের সমস্ত পলি সমুদ্র পর্যন্ত চলে যায়। কিন্তু বন্যার সময় ছাড়া অন্য ঋতুতে গর্ভের কাছের জলের স্রোতের বেগ, ঔদকতত্ত্ব (Hydraulics) অনুযায়ী, অপেক্ষাকৃত কম। জোয়ারে আনা বঙ্গোপসাগরের পলিমঞ্চের পলি এই গর্ভের কাছের জলেই থাকে আর ভাটার সময়ে অবক্ষেপিত হয়। বর্ষায় দামোদরের বন্যা কোনও পলি অবক্ষেপিত হতে দেয়ই না, উপরন্তু অপর সময়ের সঞ্চিত মণ্ডপলিও ঠেলে আবার সমুদ্রে নিয়ে যায়। বর্ষায় দামোদর-রূপনারায়ণের বন্যার সময়ে রূপনারায়ণ সঙ্গমের পর থেকে হুগলী নদী সাগরাভিমুখে একটানা বয়; জোয়ারেও তার ব্যতিক্রম হয় না—এই বিশেষত্বটুকু লক্ষণীয়। বন্যার সময়ে নিম্ন-হুগলীতে জোয়ারের জন্য জল স্ফীত হয়ে উচ্চতর হয় বটে, কিন্তু স্রোতের টান সমুদ্রাভিমুখীই

থাকে। কাজেই দামোদরের বন্যার সময়ে নিম্ন-হুগলীতে পলি অবক্ষেপণ আদপেই ঘটে না।

অন্যান্য নদীর বন্যার তুলনায় দামোদরের ২।১ দিন স্থায়ী বন্যার বৈশিষ্ট্য এই যে, পার্বত্য এলাকা থেকে বাহিত অধিকাংশ বালি ও পলি দামোদরের মধ্য সমতল-প্রবাহে খাতেই অবক্ষেপিত হয়ে যায়, নিম্ন-হুগলী পর্যন্ত শুধু জলই পৌছায়। সঙ্গে থাকে সূক্ষ্মতর বালি ও পলি 'ঝোলানো' অবস্থায়। এই সূক্ষ্মতর বালি ও পলি নিম্ন-হুগলীতে কোনও সময়েই অবক্ষেপিত হবার সুযোগ পায় না, সমুদ্রে চলে যায়।

হুগলীর জোয়ারের জলে বঙ্গোপসাগরের নিমজ্জিত পলিমঞ্চ থেকে আনীত অর্ধতরল মণ্ডের মত পলির পরিমাণ যে 'ঝোলানো' পলির পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশী, তা বোঝা শক্ত নয়। সাগরের জলে ফটকিরি জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ আছে, তাই নদীর ঘোলা জল যখন সাগরের জলে মেশে, তখন নদীর জলের 'ঝোলানো' পলি অতি দ্রুত নিচের দিকে অবক্ষেপিত হয়। রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়াই এই পলির (colloidal silt) দ্রুত অবক্ষেপণের কারণ। স্থির জলেও colloidal ঘন পদার্থের সূক্ষ্ম অণুগুলি সহজে থিতায় না, কিন্তু ফটকিরি প্রভৃতি রাসায়নিকের সাহায্যে ও বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় তারাও দ্রুত নিচে অবক্ষেপিত হয়। সাগরের জলে এই প্রক্রিয়ায় colloidal পলি-অবক্ষেপণ অপেক্ষাকৃত দ্রুততর, সেই জন্য সাগরের জল বেশীক্ষণ ঘোলা থাকতে পারে না। সুতরাং বঙ্গোপসাগরের নিমজ্জিত পলিমঞ্চের উপরে সৃষ্ট অর্ধতরল মণ্ডের মত পলির পরিমাণ 'ঝোলানো' পলির চেয়ে ঢের বেশী। ঔদক (hydraulic) অবস্থা অনুকূল পেয়ে বঙ্গোপসাগরের নিমজ্জিত পলিমঞ্চের মণ্ডপলি জোয়ারের সঙ্গে বাহিত হয়ে এসে সুন্দরবন অঞ্চলের নদীর খাত দ্রুত নষ্ট করে দেয়। একমাত্র হুগলীর খাতকেই বহু প্রাচীনকাল থেকেও নষ্ট করতে পারে নি, তার কারণ দামোদরের বন্যাগুলির প্রচণ্ড ভরবেগ (momentum)।

শরৎ ও বসন্তকালে পৃথিবী যখন সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমার কক্ষপথে জলবিষুব (Autumnal equinox) ও মহাবিষুব (Vernal equinox) বিন্দু দুটির কাছাকাছি এসে পড়ে তখন পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যার কোটালে হুগলী নদীতে 'বান' (Bore) ডাকে। এই বানের জলের তীব্র প্রবাহের গতি অনেক মণ্ডপলি ঠেলে নিয়ে আসে। তা ছাড়া ঘূর্ণবাতও সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের সময়ে হুগলী নদীর নিম্নাঞ্চলে তীরের ভূমি ধসে নদীর খাতে পড়ে। তমলুকের কাছে হুগলীর তীরবর্তী হিজলীতে মহারাজা নন্দকুমারের লবণের কারখানা ও গোলা ছিল, ভূমিতে ধস নামার জন্যে লোপ পেয়েছে মাত্র ৭০।৮০ বছর আগে। এই ধস-নামা মাটিও নদীর নাব্যপ্রণালী ধ্বংস করতে চেষ্টা করে।

দামোদরের বন্যাগুলি কিরূপে হুগলীর নাব্যতা রক্ষা করে

এখন বুঝতে হবে, কি করে দামোদরের বন্যাগুলি রূপনারায়ণের মুখ থেকে হুগলীর নিম্নভাগের খাতে (এবং বিশেষ করে ডায়মণ্ডহারবারের নিচে কিছুদূর পর্যন্ত) চর সৃষ্টির কাজ পণ্ড করে।

রূপনারায়ণের নিম্নাংশই আজ এই অংশে দামোদরের মূল খাত। শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ দামোদরের বন্যার জল রূপনারায়ণের নিম্নাংশ দিয়ে নামে।

হুগলী নদীর এই অংশের মানচিত্র (৪নং চিত্র) একটু অনুধাবন করে দেখলেই বোঝা যায়, রূপনারায়ণের মুখ থেকে হুগলী নদী নিচের দিকে রূপনারায়ণেরই নিরবচ্ছিন্ন খাত ছাড়া আর কিছু নয়। বিশেষতঃ ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত রূপনারায়ণের খাত, পশ্চিম থেকে পূর্বে, এক সরলরেখায় রয়েছে। উত্তরে হুগলী নদী এই খাতে লম্বভাবে এসে পড়েছে। জলের গতি-বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রই জানেন, সরলরেখায় জলের গতিশক্তি যতটা অব্যাহত থাকে, বাঁকে তা থাকে না। বিশেষতঃ আকস্মিক সমকোণ বাঁকে জলের গতি-শক্তি (সুতরাং ভরবেগ) অনেক কমে যায়। সুতরাং রূপনারায়ণের জলের প্রতিক্রিয়াই, ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে, নদীর খাতে উপরের হুগলীর জলের প্রতিক্রিয়ার চেয়ে ঢের বেশী। (ডায়মণ্ডহারবার থেকে উপরে কলিকাতা বন্দর পর্যন্ত দামোদর-রূপনারায়ণের বন্যার প্রতিক্রিয়ার অভাবে, হুগলী নদীর এই অংশটি খুব বেশী মজে আসতে চেষ্টা করে। এই অংশেই পোর্ট কমিশনার বার্ষিক প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা খরচ করে চর কাটানো ড্রেজিং-এর কাজ করান। এই অংশেই আক্রা স্পার ও ফলতার নদী-শাসনের কাজ করা হচ্ছে)।

বর্ধমান থেকে রূপনারায়ণের মুখ পর্যন্ত দামোদরের ঢাল (gradient) প্রতি মাইলে প্রায় এক ফুট অর্থাৎ বারো ইঞ্চি। সে ক্ষেত্রে ভাগীরথী-হুগলীর ঢাল মাইলে মাত্র পাঁচ ইঞ্চি। ঢালের বৃদ্ধির সঙ্গে জলের গতিশক্তি বৃদ্ধি ও ভরবেগ বৃদ্ধি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভাগীরথীর খাতটিও অত্যন্ত সপিল হয়ে গিয়েছে, কাজেই জলের গতিশক্তি ও ভরবেগ খুবই ব্যাহত হয়ে যায়। কিন্তু বর্ধমানের নিচে থেকে দামোদর-রূপনারায়ণের দক্ষিণাভিমুখী খাত অপেক্ষাকৃত সরল আর জলের গতিশক্তি ও ভরবেগ অব্যাহত রাখার পক্ষে অনুকূল। (আরও অনুকূল ছিল চল্লিশ বছর আগে যখন বেগোর হানা দিয়ে দামোদরের বন্যা রূপনারায়ণের খাতে প্রবাহিত হত না। কোলাঘাটে রূপনারায়ণের পুলের কাছে বন্যার গতিশক্তি ও ভরবেগ খানিকটা ব্যাহত হয়ে যায় এবং হুগলীর খাতে দামোদরের বন্যার অনুকূল প্রতিক্রিয়া খানিকটা নষ্ট করে)। বন্যা ঔদক (hydraulics) নিয়মে তার সমগ্র পুঞ্জীভূত শক্তির সাহায্যে নদীর খাতে গর্ভের মাটি কি পরিমাণে কাটতে পারে, তা গঙ্গার বন্যায় বর্ষার সময়ে সারাপুলের (Hardinge Bridge) রক্ষণের জন্যে পর্যবেক্ষিত হয়েছে।

স্যার ফ্রান্সিস স্প্রিং, মিঃ লেসি, মিঃ গেল্‌স প্রভৃতি ভারতের ইংরেজ নদী-বিদ্‌গণ পাললিক ভূমির নদীতে বন্যায় গর্ভের মাটি কাটা সম্বন্ধে অনেক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করেছেন। বন্যার প্রতিক্রিয়ায় গঙ্গা-পদ্মার গর্ভের গভীরতা ৪০।৫০ ফুট পর্যন্ত বাড়ে। পাটনায় ৫৩ ফুট ও মোকামায়, যেখানে নতুন সেতু নির্মিত হচ্ছে, সেখানে ৩৮ ফুট। বছরের শুষ্ক ঋতুতে, সর্বনিম্ন জলপৃষ্ঠ (lowest water-level) থেকে এই গভীরতা মাপা হয়েছে। পুলের পোস্তা প্রভৃতি কঠিন ইমারতে নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হলে গঙ্গা-পদ্মায় ১৩০।১৪০ ফুট পর্যন্ত এই গভীরতা (scour) বাড়তে পারে। পদ্মায় সারাপুলের কাছে পর্যবেক্ষণের

ফলে এ কথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং বন্যার ভরবেগ (momentum) যে নদীর তলে কি ধরনের কাজ করতে পারে, তা এই থেকেই আন্দাজ করতে পারা যায়। দেখা গিয়েছে, সুউচ্চ বন্যা কমে আসবার সময়ে অর্থাৎ নদীতে বন্যার জলের উচ্চতা তিন-চতুর্থাংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ হয়ে আসবার সময়ে তার নদীর তলদেশ কাটবার শক্তি সবচেয়ে বেশী। পাকা ইমারতে নদীর প্রবাহ শাসিত না হলেও, স্বাভাবিক খাতে বন্যার সময়ে এটা লক্ষিত হয়েছে।

সুতরাং দামোদরের ২½ লক্ষ থেকে ৬½ লক্ষ কিউসেক বন্যাগুলি ডায়মণ্ড-হারবার অঞ্চলে হুগলীর খাতে (বিশেষতঃ ভাটার সময়ে) চরগুলি কেটে যে মাটি ও পলিকে আবার সাগরে ঠেলে নিয়ে যায়, এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কোনই অবকাশ নেই। বিশেষতঃ এখানে নদীগর্ভের পাললিক তলদেশ গঙ্গা-পদ্মার পাটনা থেকে সারাপুল পর্যন্ত তলদেশের চেয়ে ঢের নরম, আর তার সজ্জিত স্তরগুলি এই প্রক্রিয়ার পক্ষে খুবই অনুকূল। এই অংশে এ পর্যন্ত হুগলী নদীতে ড্রেজিং-এর প্রয়োজন হয় নি, এটাও লক্ষণীয়।

গঙ্গার জল অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে নিম্ন-হুগলীর নাব্যতা রক্ষা করা যায় না

গঙ্গা থেকে মাত্র ২০।৫০ হাজার কিউসেক জল, ফরাক্কা ব্যারেজের সাহায্যে, ভাগীরথীর মন্থর সর্পিল পথে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দামোদরের বন্যার উক্ত কার্যকারিতার প্রতিনিধিত্ব করানো অসম্ভব। গঙ্গা থেকে ২½ লক্ষ—৬½ লক্ষ কিউসেক জল অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে ভাগীরথীর খাতে কোনও অতিমানুষিক (miraculous) প্রক্রিয়ায় হুগলীর নিম্নাংশ পর্যন্ত আনা যায় না। কারণ ভাগীরথীর সর্পিল খাতে তার ভরবেগ অনেক নষ্ট হবে, হুগলী খাত ডায়মণ্ড-হারবার অঞ্চলের রূপনারায়ণ খাতে জ্যামিতিক লম্বভাবে পড়েছে, সেইজন্যেও ভাগীরথীর জলের ভরবেগ অনেক নষ্ট হবে। সুতরাং দামোদরের উচ্চ উপত্যকার বন্যা নিরুদ্ধ হলে হুগলীর এই নিম্নাংশের (যা এতদিন নাব্যতায় বিশেষ কোনও অসুবিধা সৃষ্টি করে নি) নাব্যতা অনতিবিলম্বে অর্থাৎ ৪।৫ বছরে নষ্ট হয়ে যাবে। দামোদরের বন্যায় সৃষ্ট ভরবেগ হুগলী খাতের নিম্নাংশে ভাগীরথীর জল দিয়ে সৃষ্টি করতে হলে, গঙ্গার বন্যার প্রায় সমস্ত জলই (২০।৩০ লক্ষ কিউসেক) ভাগীরথীর উৎসস্থানে প্রবেশ করাতে হয়, সামান্য অঙ্ক কষে এ কথা বোঝা শক্ত নয়। আর এত জল যদি আজ ভাগীরথীর উৎসে প্রবেশ করানো যায়, তা হলে মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ শহর তো ভাগীরথী নদী ভেঙে নেবেই, তা ছাড়া, কলিকাতা শহর ও শিল্পাঞ্চলের কোনও শহরই ভাগীরথী-হুগলীর গর্ভে পড়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।

আর 'হুগলী বিশেষজ্ঞ কমিটি' নদী-শাসনের কাজ সুপারিশ করেছেন। দামোদরের মাত্র ২½ লক্ষ কিউসেকের বন্যার তুল্য ভরবেগ সৃষ্টি করতে হলেই শেষ পর্যন্ত এক হাজার দু হাজার কোটি টাকার সাধারণ নদী-শাসনের কাজ করতে হবে ভাগীরথী-হুগলী নদীতে। ৬½ লক্ষ কিউসেক বন্যার তুল্য ভরবেগ হুগলীর নিম্নাংশে সৃষ্টি করতে হলে সাধারণ প্রচলিত নদী-শাসনের কাজে কুবেরের ভাণ্ডার খালি হয়ে যাবে।

কর্তৃপক্ষদের কাছে এই কথাগুলি বার বার বলা সত্ত্বেও, তাঁরা প্রায় নির্বিকার হয়ে বসে আছেন। কথাগুলি না বোঝার কথা নয়। বরং আজ তাঁদের হাবভাব দেখে আমার মনে হচ্ছে, সমস্যার জটিলতা তাঁরা এতদিনে বুঝেছেন, শুধু প্রকাশ্যে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করতে নারাজ। পোর্ট কমিশনার ও জয়েন্ট স্টীমার কোম্পানি প্রভৃতির কাছে বহু বছর ধরে যে তথ্যসমূহ সংগৃহীত রয়েছে, সেই তথ্যগুলি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করলেও আমার কথার সরারবত্তা প্রমাণিত হবে। তা ছাড়া প্রত্যক্ষভাবেও আমার কথা যাচাই করে নেওয়া যায় হুগলীর নিম্নাংশে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে। এই পর্যবেক্ষণের ফল নির্ভরযোগ্য করার জন্যই আমি আগামী অন্ততঃ পাঁচ বছরের জন্যে মাইথনের ও পাঞ্চেতের বন্যা নিরোধী বাঁধ নির্মাণের কাজ স্থগিত রাখার দাবি জানিয়েছিলাম। শুধু মর্যাদাহানির ভয়েই বোধ করি তাঁরা এই বৈজ্ঞানিক সত্য পরখ করে দেখে নিতে চাইছেন না।

শুধু ২০।৩০ হাজার কিউসেক গঙ্গাজল ভাগীরথীতে অনুপ্রবিষ্ট করালে ভাগীরথীর উপরাংশের গর্ভ কেটে এসে নিম্নাংশে পলি জমা হবে, জোয়ারের সংঘাতে। ফলে হুগলী নদীর নাব্যতা বরং ব্যাহত হবারই কথা। পৃথক পরিচ্ছেদে ফরাক্কা ব্যারেজ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি আরও আলোচিত হবে।

সমস্যা সমাধানের উপায়

আমি এ কথা কখনই বলবো না, দামোদরের উচ্চ উপত্যকার বন্যা নিরুদ্ধ করলে কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষা করবার উপায় নেই। সেজন্য বর্তমান 'দামোদর পরিকল্পনা'র সম্পূর্ণ সংস্কার চাই। মূল দামোদর নদ দিয়ে বাঁধের জল সারা বছর ধরেই প্রবাহিত করানো চাই, বেগোর হানা-পথ বন্ধ করে, মূল দামোদরের নিম্নাংশ দিয়ে দামোদরের নিম্ন উপত্যকার বন্যার জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা চাই; রূপনারায়ণ, কাঁসাই প্রভৃতির সংস্কার চাই, ইত্যাদি। বিজ্ঞানের বিদ্যা বন্ধ্যা নয়। বর্তমান যুগে বহু টেক্‌নিকও আজ আমাদের আয়ত্তে। এইসব কাজগুলির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বঙ্গোপসাগরের নিমজ্জিত পলি-মঞ্চের শাসন-ব্যবস্থা হলেই হুগলীর নাব্যতার উন্নয়ন করানো যায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষের যখন বর্তমান মনোভাব, তখন এ বিষয়ে আমার সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়া অশোভনই হবে। সকল তথ্যের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করলে সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দেশ করা শক্ত হবে না; তখন পর্যাপ্ত অর্থের অভাবই হয়তো কলিকাতা বন্দর রক্ষা করার প্রধান অন্তরায় হবে। কর্তৃপক্ষ, এমন কি, অর্থের অভাবে কলিকাতা বন্দর পরিত্যাগই করতে পারেন। উড়িষ্যার পরাদ্বীপে বন্দর পত্তন করে ও অন্ধ্র দেশে বিশাখাপত্তনম বন্দরের উন্নয়ন করে ভারতবর্ষের কাজ চলে যাবে। পশ্চিমবঙ্গেরই শুধু হবে সর্বনাশ। হুগলী নদী থেকে উড়িষ্যার মহানদী পর্যন্ত একটি নৌকা চলাচলের খাল কাটার কথাও কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন। এ সমস্ত দেখে মনে হয় তাঁরা কলিকাতা বন্দর পরিত্যাগ করার কথাই ভাবছেন।

হুগলী নদীর সাধারণ রক্ষণ কাজ

হুগলী নদীর সাধারণ রক্ষণ কাজের জন্যে পোর্ট কমিশনার কলিকাতার কাছে বার্ষিক প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা খরচ করে চরগুলি মাঝে মাঝে ড্রেজিং যন্ত্রের সাহায্যে কেটে দেন।

পুনায় সরকারী নদী গবেষণা কেন্দ্রে ভাগীরথী-হুগলীর ক্ষুদ্রতর প্রতিকৃতির উপর গবেষণা চালিয়ে কতকগুলি কাজের স্থপারিশ করা হয়েছে।

প্রথম দফায় আক্রা স্পার কার্যকরী করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, ফলতার কাছে নদীর নাব্যপ্রণালীর গভীরতা বৃদ্ধি করবার জন্যে উপায় নির্ধারিত হয়েছে। ফলতা, নাইনান ও পূর্বাঘাটের চরগুলি ভাঙবার জন্যে অপর পারে চর জাগাবার প্রচলিত টেক্‌নিক প্রয়োগ করা হবে। তা ছাড়া বালারি (যার উল্লেখ এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই করা হয়েছে) ও সাগরদ্বীপের নিকট অকল্যাণ্ড নামক চর দুটি দাবিয়ে রাখার জন্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা উঠেছে।

এই সমস্ত 'নদী-শাসনে'র ব্যবস্থার কথা শুনে, অনেকে মনে করবেন, এর ফলেই হুগলীর সমুদ্রযাত্রাপথের নাব্যতা রক্ষা পাবে। এরূপ ধারণা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

নদীর সাধারণ অবস্থায় নাব্যতা রক্ষা করবার জন্যে এইসব পৌর্তিক কাজের সকল সময়েই প্রয়োজন রয়েছে। তার ফলে, সাধারণভাবে স্থফলও পাওয়া যাবে। আর এই ধরনের হুগলী-শাসনের কথা বহু বছর পূর্ব থেকেই উঠেছে, তার সাধারণ নাব্যতার অস্থবিধা দূর করবার জন্যে। কিন্তু দামোদরের উচ্চ উপত্যকার বন্যা নিরুদ্ধ হয়ে গেলে হুগলীর এই অংশে যে **অসাধারণ অবস্থার** স্থষ্টি হবে, তার জন্যে এই পৌর্তিক কাজগুলি মোটেই যথেষ্ট নয়। এদের দ্বারা কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা কিছুতেই রক্ষা পাবে না শেষ পর্যন্ত। দামোদরের বন্যা নিরুদ্ধ হয়ে গেলে, এইসব পৌর্তিক কাজ হওয়া সত্ত্বেও, পাঁচ বছরের মধ্যেই হুগলীর নাব্যতা নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়ে যাবে—সব দিক বিবেচনা করেই এই আমার সিদ্ধান্ত। হুগলী নদীর এ অংশ যে সব নৈসর্গিক অবস্থার অধীন, সে অবস্থা কোনও গবেষণাগারে স্থষ্টি করা যায় না। প্রথম থেকেই কর্তৃপক্ষদের আমি এ কথা জানিয়েছি, এবং আমার ধারণা, এ কথা তাঁরা এখন মেনেও নিয়েছেন।

মাঝে কথা উঠেছিল, ডায়মণ্ডহারবার থেকে একটা পৃথক খাল কলিকাতা বন্দর অবধি না আনলে চলবে না; কারণ ড্রেজিং করে কলিকাতা বন্দরের চরগুলি কেটে রাখা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠছে দিন দিন। এখন সে পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়েছে; আর ধরা হচ্ছে উল্লিখিত নদী-শাসন ব্যবস্থা অবলম্বিত হলেই কাজ হবে। এই সাধারণ রক্ষণের কাজ (ordinary maintenance works) দ্বারাই, দামোদরের উচ্চ উপত্যকার বন্যা নিরোধের ফলে হুগলীতে যে বিশেষ অসাধারণ অবস্থার উদ্ভব হবে, তারও সমাধান হবে মনে করলে বিপজ্জনক ভুল হবে। বহুদিন থেকেই এই বিকল্প রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে নদী-শাসনের কাজের কথা উঠেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকান বিশেষজ্ঞ লিণ্ডন বেট্‌স

ম্পার তৈরির কথা বলেছিলেন। জার্মান বিশেষজ্ঞ, ব্রিমেনের অধ্যাপক থিয়েরিও সুপারিশটি সমর্থন করেছিলেন। তখন দামোদরের বন্যা নিরোধের কথা ওঠে নি। এমন কি গঙ্গা থেকে ভাগীরথীর সংযোগও নষ্ট হয় নি। এতদিনে সেই সব সুপারিশ করায় সাধারণ নদী-শাসনের কাজ রূপায়িত হতে চলেছে। এ দিকে দামোদরের বন্যা নিরোধের ফলে হুগলীর নিম্নভাগে এক **অসাধারণ অবস্থার** সৃষ্টি হচ্ছে। এখন এই সাধারণ নদী-শাসনের কাজগুলির ফলেই হুগলীর নাব্যতা ধ্বংসের কাজই ত্বরান্বিত করা হবে, জোয়ারের সঙ্গে নিমজ্জিত পলিমঞ্চের উপর থেকে বঙ্গোপসাগরের মণ্ডপলি আমদানির পথ আরও ভালো করে তৈরি করে। কাজেই, দেখা যাচ্ছে অনতিদূর ভবিষ্যতে (১৯৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) কলিকাতা বন্দরের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিমবঙ্গের উপনদী

উত্তরে তিস্তা ও মহানন্দা এবং পশ্চিমে ময়ূরাক্ষী. অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর অথবা ঢলকিশোর-রূপনারায়ণ ও কাঁসাই নদীগুলিই প্রধান উপনদী। দেশের জনকল্যাণের প্রয়োজনে এদের দুর্দান্ত জলশক্তি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে ব্যবহার করা যায় বলেই ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে এদের গুরুত্ব বেশী। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের নিচে সমভূমিতে পড়ে উত্তরবঙ্গের নদীগুলির ঘন ঘন খাত পরিবর্তনের ফলে অনেক জলাভূমির সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া সর্বনাশা বন্যায় প্রায়ই এরা জনপদের ভীষণ ক্ষতি সাধন করে। -(৫ নং চিত্র)

তিস্তা নদীর কথা

বর্তমান বছরে তিস্তা নদীর ও অন্যান্য উত্তরবঙ্গের নদীর ভয়াবহ বন্যার প্রকোপ সকলের কাছে একে সুপরিচিত করেছে।

ইতিপূর্বেই তিস্তা নদীর খাত পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছি। পূর্বে নিচে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হত তিস্তা নদী। মাত্র ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তিস্তা ব্রহ্মপুত্রে মিশতে শুরু করেছে। এই প্রধান পরিবর্তন ছাড়াও, ছোটখাটো খাত পরিবর্তন লেগেই আছে। এমন কি গত কয় বছর দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় এর প্রবল বন্যা ও খাত পরিবর্তন মানুষকে খুবই নাজেহাল করেছে। আসাম লিঙ্ক রেল-পথের বাঁধ নির্মাণের ফলেই তিস্তার বন্যার ক্ষতিকর কার্যের বৃদ্ধি হয়েছে বলেই আমরা মনে করি। এইজন্যে আসাম লিঙ্ক রেলপথ নির্মাণের বিপদের কথা আমরা প্রথম থেকেই জানিয়েছিলাম। আর প্রতি বছরেই যে এই রেলপথ ভেঙে দারুণ অসুবিধা ও অর্থব্যয়ের কারণ হবে, তাও জানিয়েছিলাম। কারণ হিমালয়ের নদীগুলি এখানে দ্রুত ঢাল থেকে অকস্মাৎ সমতল ঢালে নেমেছে। তা ছাড়া অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জল এই সমস্ত অঞ্চলটা দিয়েই ভূমি অবলম্বন করে প্রবাহিত হয়, সে জলনিকাশে বাধা সৃষ্টি অত্যন্ত ভূল।

হিমালয়ের তুষারে জন্ম নিয়ে সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলে অপরূপদৃশ্য গিরি-খাতের পথে তিস্তা নেমেছে পশ্চিমবঙ্গে। সেখানে তার অনতিগভীর জলের খরস্রোতে পর্বত ও বনানীর প্রতিবিম্ব দেখে মুগ্ধ হতে হয় শীতকালে। কিন্তু তিস্তায় বর্ষার আবিল জল দুর্দান্ত গতিতে নামে ডুয়ারের সমভূমিতে আর প্রতি বছরই সে খাত বদলায়; কারণ প্রচুর পরিমাণ শিলা বহন করে এনে সমতল ডুয়ারে আর বহন করার মত স্রোতের বেগ পায় না, তারা গর্ভে পতিত হয়ে অবরোধ সৃষ্টি করে। তিস্তা তিরিশ বছর আগে জলপাইগুড়ি শহরের পূর্ব দিক দিয়ে বইতো। তারপরেই কিন্তু তার করালগ্রাস থেকে রক্ষা করবার জন্য, রেলপথকে তিন মাইল সরাতে হয়। তারপরেই নদী পশ্চিম দিকে মোড় নিয়ে খাস জলপাইগুড়ি শহরকেই আক্রমণ করেছে আদালত এলাকার একেবারে ধারে।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে পার্বত্য অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাত ও মাটি ধসার ফলে তিস্তার গিরিখাতের উপরে কৃত্রিম বাঁধের সৃষ্টি হয়। নদীর উপরি অংশে জল জমে উঠে

প্রচণ্ড শক্তিতে সেই বাঁধ ভেঙে প্রায় ২৭ ফুট উঁচু প্রবল বন্যা পাঠালো তিস্তা নদী নিম্নের সমভূমিতে। আসাম লিঙ্ক রেলপথের সেতু ভেঙে দিল আর বহু গ্রাম ও শস্যক্ষেত নষ্ট করলো। বর্তমান বছরের বন্যায় জলপাইগুড়ি শহরকে কৃপা করে পরিত্যাগ করে দোমোহানি দিয়ে তিস্তার খাত নেমেছে।

আরও নিচে, পাকিস্তানের সমতলভূমিতে তিস্তার বন্যার বাৎসরিক উপদ্রব কম নয়। হিমালয়ের গলিত তুষারের জল আর পর্বতের সানুদেশে প্রবল বৃষ্টির জল, এই দুই জলে স্ফীত হয়ে তিস্তা প্লাবনের সৃষ্টি করে। দামোদর প্রধানতঃ ছোটনাগপুরের উচ্চভূমির বৃষ্টির জলেই প্লাবনের সৃষ্টি করে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলায়। স্বভাবতঃই তিস্তার প্লাবনে অনেক বৃহত্তর এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু আমরা দামোদরের বন্যার কাহিনী শুনে শুনে এই শেষোক্তকে বেশী সর্বনাশা নদী বলে চিনতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম। তার কারণ দামোদরের নিম্নাঞ্চলে সমৃদ্ধিশালী জনপদের পত্তন হয়েছে, দামোদরের বন্যা এইসব জনপদের ক্ষতি করে, কলিকাতার সহিত সংযোগকারী রেলপথ, রাজপথ ধ্বংস করে। তিস্তার বন্যা ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে আসাম লিঙ্ক রেলপথের সেতু ধ্বংস করার পরই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি বিশেষ করে আকৃষ্ট করতে পেরেছে, তার আগে সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করে তিস্তার বন্যার গুরুত্ব দেখা যায় নি। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর-বঙ্গের বন্যাতেও শান্তাহারের কাছে রেলপথ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তিস্তা-মহানন্দা-আত্রেয়ীর বন্যা উচ্চমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের কষ্ট-দুর্দশা লাঘবের জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে 'উত্তরবঙ্গ বন্যা ত্রাণ-সমিতি' গড়তে হয়েছিল। বুঝি বা বন্যার কাছ থেকেই পূর্ববঙ্গের বাস্তহারার দল শিখেছে, মাঝে মাঝে রেলপথের ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দিয়ে উচ্চতর মহলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে তাদের দুঃখ-দুর্দশার দিকে!

অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মানুষের আবাস, পশু ও কৃষি সম্পদ নষ্ট করলে আমরা নদীর বন্যার দাপট হৃদয়ঙ্গম করতে অভ্যস্ত নই। তিস্তার বন্যায় জলপাইগুড়ির ও ব্রহ্মপুত্র ও তার উপনদীর বন্যায় প্রতি বছরই আসামের বিস্তীর্ণ এলাকায় দরিদ্র মানুষের সর্বনাশ হয়ে যায়। সংবাদপত্রে বন্যার সংবাদ পড়ে আমরা হয়তো আর্তত্রাণ ফণ্ডে কিছু চাঁদা দিয়ে দিই। ব্যস্, ওই পর্যন্ত।

অথচ তিস্তা, মহানন্দা অথবা ব্রহ্মপুত্রের বন্যাকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের বিপুল জলশক্তিকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা যায়। এই সব নদী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনায় প্রথম স্থান পায় নি, তার কারণ, এদের উপত্যকায় উৎপন্ন জলবিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করবার জন্যে ও-অঞ্চলে সমৃদ্ধিশালী জনপদ গঠিত হয় নি, শিল্পাঞ্চল নয় ওই সব অঞ্চল। বিহারের কুশী নদী সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। কুশীর বন্যা উত্তর বিহারের দরিদ্র মানুষের সর্বনাশ করছে বছরে বছরে, কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এর নিয়ন্ত্রণ আমল পায় নি। পরিকল্পনার জন্য উপযুক্ত 'বাজার' (market) নেই!

নদী-উপত্যকা পরিকল্পনায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যদি পালটাতো, তা হলে হয়তো, হিমালয়ে উদ্ভূত এই সব নদীর সর্বনাশা বন্যা নিয়ন্ত্রণ করাই প্রথম করণীয় বলে গণ্য হত আমাদের কাছে। সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলের সমৃদ্ধি আরও বাড়ানোর

ব্যবস্থা আগে না করে, দরিদ্রতর অঞ্চলের মানুষের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির কাজে সহায়তা করতে পারতো তিস্তা, মহানন্দা ও বিহারের কুশী নদীর উপত্যকায় উৎপন্ন জল-বিদ্যুৎশক্তি; প্রথম পাঁচ, দশ বছর হয়তো বিনমূল্যে বিতরণ করতে হত ওই অঞ্চলের দরিদ্র অধিবাসীকে। কিন্তু বহু শতাব্দীর অবহেলার বদলে সেটা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য। আজ কিন্তু দামোদর পরিকল্পনাতেও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন করে বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া জেলার দরিদ্র মানুষকে বিদ্যুৎ ব্যবহার করবার সুযোগ আগে দেওয়া হচ্ছে না. আগে করা হচ্ছে রেল চলাচল বৈদ্যুতীকরণ !!

শোনা যাচ্ছে, তিস্তা নদীর উপত্যকায় সরকারী পরিকল্পনা স্থাপনের জন্য সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলে জমির জরিপ ও জলের মাপজোখের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে সম্প্রতি। কথা হচ্ছে কালিম্পং শহরে একটি উঁচু বাঁধ নির্মাণের আর ওই শহর থেকে কিছু দক্ষিণে একটি ব্যারেজ নির্মাণের।

তিস্তা পরিকল্পনা ৩ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে। আর ৪০ লক্ষ একর ভূমিতে সেচ-ব্যবস্থা করতে পারবে। পাকিস্তান গভর্নমেণ্টকে সম্মত করে চুক্তি সম্পাদন না করতে পারলে তিস্তা পরিকল্পনার রূপ দেওয়া শক্ত। কিন্তু পাকিস্তানের আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। তিস্তার বন্যা নিয়ন্ত্রিত হলে, নিম্নপ্রবাহে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের ফলে পাকিস্তানও যথেষ্ট উপকৃত হবে।

তিস্তার সেচ পরিকল্পনায় কোচবিহারের কিয়দংশ, জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিমাংশ ও দার্জিলিং জেলার তরাই এলাকার ভূমি উপকৃত হবে।

জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনার ফলে কাগজ, কৃত্রিম রেশম, দেশালাই, চিনি এবং আরও অনেক শিল্প গড়ে উঠতে পারবে। চা-শিল্পেরও সাহায্য হবে। ওই অঞ্চলে মানুষের গৃহে বৈদ্যুতিক বাতি প্রচলিত হবে। রেলের ট্রেনও বিদ্যুতে চলতে পারবে।

তা ছাড়া তিস্তার বাঁধের আড়ালে সৃষ্ট কৃত্রিম হ্রদে মৎস্য চাষ ও ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতি নদী পরিকল্পনার মামুলি সব ব্যবস্থাও পাওয়া যেতে পারবে।

তিস্তার উপনদী জলঢোকা নদীতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের সরকার নাকি খুব উদ্যোগী হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, জলঢোকা পরিকল্পনায় ৮।১০ হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে।

মহানন্দা, পুনর্ভবা, কালিন্দী নদী

মহানন্দা নদী তিস্তার মত ভীষণা কিনা বলা যায় না। কারণ এরও নিম্নভূমিতে বন্যা হলেও, সে অঞ্চল সমৃদ্ধিশালী নয় বলে, উচ্চতর মহলের মাথা ব্যথা হয় না; ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আন্দোলন হয় না। রেলপথের কোনও বৃহৎ সেতু আজ পর্যন্ত মহানন্দা ধ্বংস করতে পারে নি, উত্তরবঙ্গে মাঝে মাঝে রেলপথের বাঁধ ভাঙবার ভয় দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়। দার্জিলিং-এর পার্বত্য রাজপথের ক্ষতি হয় মাঝে মাঝে, মহানন্দার অববাহিকায় বৃষ্টিপাতের জন্যে পাহাড়ে ধস নেমে।

নিম্নাঞ্চলে, গঙ্গার সঙ্গে সংযোগের পূর্বে মহানন্দা, পুনর্ভবা, কালিন্দী বৃহৎ জলাভূমি সৃষ্টি করেছে মালদহ জেলায়—গঙ্গা ও এই নদীগুলির খাত পরিবর্তনের ফলে। এই জলাভূমির জল নিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হওয়ায় বহু পরিমাণ কৃষি-যোগ্য ভূমি নষ্ট হয়ে রয়েছে; ওই অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপও অত্যধিক, জন-

স্বাস্থ্যের অবস্থাও শোচনীয়। জলনিকাশী কাজের পরিকল্পনায় এই জলাভূমির উঠিত করানো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

হিমালয়ে মহানন্দার উৎস প্রদেশের সঠিক বিবরণ আজও পাওয়া যায় না। কাজেই, পাহাড়-পর্বতের আড়ালে, কোথাকার কোন্ পুঞ্জীভূত জলরাশি অকস্মাৎ মহানন্দার খাতে নেমে এসে মহাপ্লাবনের সৃষ্টি করতে পারে কিনা, তা বলা যায় না।

হিমালয় ও তার সানুদেশের উত্তরপ্রদেশ, উত্তরবিহার, উত্তরবঙ্গ ও আসাম হচ্ছে ভূমিকম্প-অঞ্চল। ভূমিকম্পের ফলে হিমালয়ের পাহাড়-পর্বতের অদল-বদল হয়ে কোথাকার জল কোথা দিয়ে নামবে, সে কথা কোনও ইঞ্জিনিয়ারই বলতে পারবেন না। হয়তো, এক ভূমিকম্পের ফলেই তিব্বতের শান্-পো নদী আজ ব্রহ্মপুত্রের খাতে মিশেছে, আর এক ভূমিকম্পে ব্রহ্মদেশের ইরাবতী বা চিন্দ্‌উইন খাতে গিয়ে নামতে পারে।

ভূমিকম্পের অঞ্চল বলে এই হিমালয়ের নদীগুলিতে উচ্চ বাঁধ দেওয়ার কাজও বিপজ্জনক ও ব্যয়বহুল।

ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ, কাঁসাই, হলদি

এই নদীগুলি ছোটনাগপুরের উচ্চভূমিতে জন্ম নিয়ে ভাগীরথী-হুগলীতে এসে মিশেছে। পশ্চিমবঙ্গে আরও যেসব ছোট ছোট নদী, এইসব নদীর প্রতিবেশী, তারা হয় এদের উপনদী, শাখা অথবা এদেরই পরিত্যক্ত পূর্বখাত। সাঁওতাল পরগনার পাহাড় থেকে অতি ছোট ছোট দু-একটি নদী মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গা অথবা ভাগীরথীতে এসে মিশেছে। (চিত্র নং ৬)

এদের বন্যা উচ্চভূমিতে বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল। এদের নিম্নাঞ্চলেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বার্ষিক বৃষ্টির পরিমাণ, উচ্চভূমিতে ৪০।৫০ ইঞ্চি ও নিম্নভূমিতে ৫৫।৬০ ইঞ্চি।

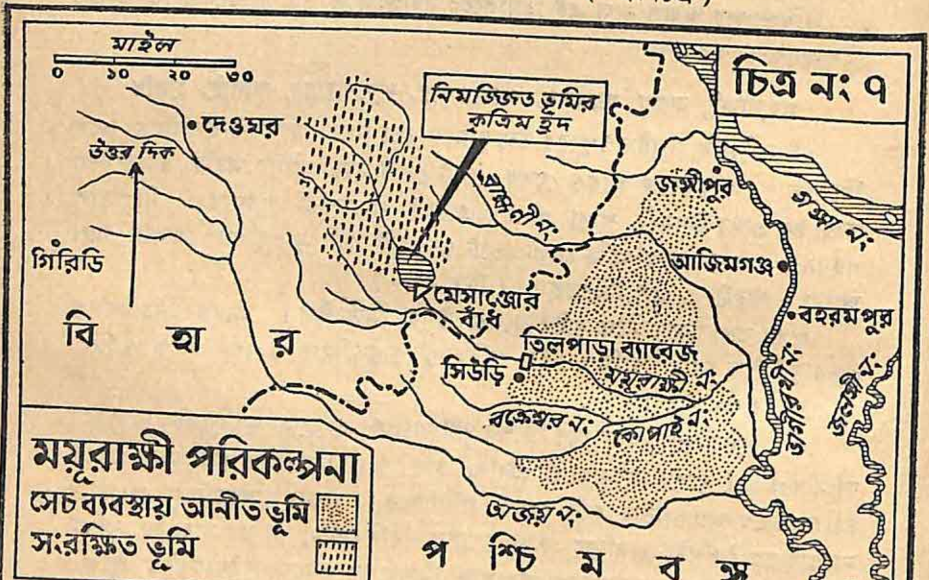
দামোদরের বন্যা যে কারণে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তা পূর্বেই বলেছি। দামোদরই এই দলের নদীর মধ্যে প্রধান, তার কথা 'দামোদর পরিকল্পনা' প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচিত হবে পৃথক পরিচ্ছেদে। বন্যার আকস্মিক ক্ষয়কার্যে দামোদরের বৈশিষ্ট্য এসেছিল তার ঢালের বিশিষ্টতায়, আর মানুষের কৃত্রিম প্রয়াসের কৃপায় তার পার্বত্য অংশের সঙ্গে নিম্নাংশের সমকোণ আকৃতির জন্যে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য, তার তীরে স্বাভাবিক সমান্তরাল বাঁধ শক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু নদীর গর্ভ বালি ও পলিতে উঁচু হয়ে যাওয়ায় বন্যা মাঝে মাঝে সে বাঁধ ভেঙে অথবা টপকিয়ে প্লাবনের সৃষ্টি করে। কাজেই বাঁধ আরও উঁচু এবং শক্ত করা হয়। কিন্তু নদীর গর্ভও উঁচু হতে থাকে, আর ক্রমে বর্ধমান জেলার নদীর গর্ভ পার্শ্বের কৃষি-ভূমির চেয়ে ২০ ফুট উঁচু হয়ে যায়। বাঁধ আরও উঁচু করা সত্ত্বেও ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে জামালপুরের কাছে সে বাঁধ ভেঙে দামোদরের বন্যা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, রাজপথ ও রেলপথ ভেঙে যুদ্ধের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তার পরিত্যক্ত পূর্বখাত বেহুলা নদী দিয়ে দামোদর আবার প্রবাহিত হতে চেষ্টা করে হুগলী শহরের কাছে ভাগীরথী-হুগলীতে পড়বার।

প্রধানতঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য 'দামোদর পরিকল্পনা' রূপায়িত করা হচ্ছে। আর বাঁধের আড়ালের কৃত্রিম হ্রদগুলির জল সেচের কাজে ব্যবহার করবার জন্য

১৫৫০ মাইল দীর্ঘ খাল কাটা হচ্ছে। নিম্ন-দামোদর এলাকার প্রধান সমস্যা জল-নিকাশের। কিন্তু বর্তমান পরিকল্পনা অসংখ্য ত্রুটিযুক্ত, জলনিকাশের কোনও সুষ্ঠু বন্দোবস্ত গৃহীত হয় নি বর্তমান পরিকল্পনায়। নিম্ন-দামোদরের বিভিন্ন খাত অথবা খাল এবং দ্বারকেশ্বরের বিভিন্ন খাত মিলে হুগলী জেলায় আরামবাগ মহকুমায় ও হাওড়া-মেদিনীপুর জেলার বহু অংশে ক্রমে ক্রমে বিরাট জলাভূমির সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সেচের খালগুলি সেই জলাভূমির বৃদ্ধি সাধন করতেই সাহায্য করবে। সুষ্ঠু জলনিকাশ পরিকল্পনা পরিগৃহীত না হওয়াতে দামোদর-দ্বারকেশ্বরের নিম্নাঞ্চলের মানুষ এক মহা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা

ছোটখাটো পরিকল্পনা হিসাবে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা বেশ সুপরিকল্পিত—এর সাফল্য পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারদের শ্লাঘার বিষয়। (৭নং চিত্র)



চিত্র নং ৭

দামোদর পরিকল্পনা অথবা তিস্তা পরিকল্পনার তুলনায় ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার রূপদানে সামান্য সমস্যারই উদ্ভব হয়েছে। প্রধান সমস্যা দেখা দিয়েছে, কৃত্রিম হ্রদের দরুন ও পরিকল্পনায় অন্যান্য আঙ্গিকের জন্য বিহারের একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের গৃহ ও ভূমিহীন মানুষের পুনর্বসতি। দ্বিতীয় সমস্যা এর সেচের জলের ব্যবহারের প্রসঙ্গে উঠেছে। সচরাচর সময়োপযোগী বৃষ্টির অভাব নেই, খালের জল মূল্য দিয়ে কিনতে কৃষক-সমাজ নারাজ। প্রথম দু বছর পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট বিনা-মূল্যেই সেচের জল দিয়েছিলেন এই পরিকল্পনা থেকে। এই বছর সেচ-পরিকল্পনার অন্তর্গত আংশিক ভূমিতে (২৫ হাজার একর) মূল্য দিয়ে সেচের জল ধানের জমিতে বাধ্যতামূলক ভাবে ব্যবহার করাবার জন্যে অর্ডিনান্স জারি করতে হয়েছে।

পর্যাপ্ত বৃষ্টি ও খাল মারফত সেচ-ব্যবস্থা

যেখানে সময়োপযোগী বৃষ্টির জলের অভাব নেই, সেখানেও পলিযুক্ত খালের জল দিলে শতকরা ২৫ ভাগ শস্য ফলনের বৃদ্ধি হয়—অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের এই মত। কিন্তু বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে বাঁধের আড়ালে কৃত্রিম হ্রদে জল থিতানোর দরুন, পরবর্তী অংশে খালের জলে পলির পরিমাণ কমে যায়, সে জলে সেচের কাজে ওই রকম পূর্ণ ফল না পাওয়াই সম্ভব। তা ছাড়া সেচ-ব্যবস্থার জন্যে জমির উন্নয়ন বাবদ অর্থ (improvement levy) আদায় করা হয় ও সেচ-কর বসানো হয়। এই অতিরিক্ত অর্থ কৃষি-কার্যের ব্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কৃষি বাবদ ব্যয়বৃদ্ধি করে. অথচ ফলনের সমতুল্য বৃদ্ধি না হওয়াতে শেষ পর্যন্ত কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলনের বৃদ্ধির জন্যে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য কিছু কমেও যায়, আর্থ-নীতিক নিয়মে। অথচ সেচকর প্রভৃতির খরচ কৃষকের ঘাড়ে চাপে। এই সমস্ত দিক বিবেচনা না করে পশ্চিমবঙ্গে খালের সাহায্যে সেচ-ব্যবস্থার আয়োজন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল ব্যবস্থা বলেই পরিগণিত হবে। পর্যাপ্ত বৃষ্টির দেশে খাল মারফত সেচ-ব্যবস্থা সমীচীন নয়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ৪৮টি রাজ্যের মধ্যে মাত্র ১১টিতে খালের জলের সেচ-ব্যবস্থা প্রযুক্ত হয়েছে। সচরাচর যে অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টির পরিমাণ ১০ ইঞ্চিরও কম, সেখানেই সেচ-ব্যবস্থা ছাড়া কৃষি-কার্য হতে পারে না। যে অঞ্চলে বার্ষিক ৩০ ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত, অথবা সময়োপযোগী বৃষ্টি পড়ে না, সেখানে খালের সাহায্যে সেচ-ব্যবস্থা আমেরিকায় গৃহীত হয়েছে, অন্যত্র নয়। আমেরিকার নদী পরিকল্পনা এই নীতি মেনে চলছে, তাই টেনেসি ভ্যালি পরিকল্পনায় খাল মারফত সেচ-ব্যবস্থার আয়োজন পরিগৃহীত হয় নি।

অবশ্য. আমেরিকায় যা করা হয়, আমাদেরও ঠিক সেই রকম নকল করতে হবে, এ কথা বলছি না। চাহিদা. জনমত, দেশের বৃহত্তর স্বার্থ প্রভৃতির পূর্ণ তথ্যের উপরই নদী পরিকল্পনা পরিগৃহীত হলেই সুফলের আশা করা যায়।

দেশের খাদ্যাবস্থার সাময়িক সঙিন অবস্থার মধ্যে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা কার্যকরী করা আরম্ভ হয়। আজ আবার উদ্বৃত্ত খাদ্য-শস্যের সমস্যার দিন এসেছে। সে সময়ে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার মত ক্ষুদ্র পরিকল্পনায় যে খালে সেচ-ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে খুব দোষ দেওয়া যায় না। বরং নদীর জলের অপচয় বন্ধ করে সেচের কাজে ব্যবহার (যখন নাব্যতা প্রভৃতির জন্যে ময়ূরাক্ষীর জল পর্যাপ্ত নয়) সুবুদ্ধিরই পরিচয় দেয়। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার সেচের জল দশ বিশ বছর কৃষকদের বিনামূল্যে দিলেও ক্ষতি নেই। বরং বিনামূল্যেই দেওয়া উচিত, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে। কিন্তু 'পরিকল্পনা কমিশনে'র মূল নীতি এরূপ ব্যবস্থার পরিপন্থী। নদী পরিকল্পনার প্রধান ব্যয়ভার দেশের কৃষককুলের স্কন্ধে চাপানোই কমিশনের মূল নীতি।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার বিবরণ

ময়ূরাক্ষী (অথবা মোর নদী) ছোটনাগপুরের রাজমহল পাহাড়ের পশ্চিমাংশে জন্মগ্রহণ করেছে আর পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি শহরের কিছু পূর্বে

ভাগীরথীতে এসে মিশেছে। এর বন্যায় ধ্বংসলীলার কথা খুব বেশী কখনও শোনা যায় নি। কারণ বর্ষাকালে নদী প্রবলাকার ধারণ করে বটে পাহাড়ের বৃষ্টির জল পেয়ে, তবুও সে জলের পরিমাণ খুব বেশী নয়। আর তীরে সমান্তরাল বাঁধ দিয়ে ইতিপূর্বে কোনও বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে নিম্নভূমির যে অঞ্চল প্লাবিত করতে পারে সে অঞ্চলে বিশেষ বসবাসের আয়োজন হয় নি। ময়ূরাক্ষীর পার্বত্য ও উচ্চ অববাহিকা (catchment basin) খুব বড় নয়। সুতরাং ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় 'বন্যা নিয়ন্ত্রণ' বড় কথা নয়, বন্যার সময়ের জল সংরক্ষিত করে সেই অতিরিক্ত জল সুপরিকল্পনায় সদ্ব্যবহার করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। অপচয় নিবারণ করে নদীর জল দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনই এর লক্ষ্য।

বিহারের রাজমহল পাহাড়ের পশ্চিমের উৎস থেকে নেমে ময়ূরাক্ষী পশ্চিমে হাঁসদিয়া পর্যন্ত গিয়েছে। তারপরে দক্ষিণপ্রবাহী হয়ে দুমকায় পৌঁছেছে। সেখান থেকে আবার দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে বিহার-পশ্চিমবঙ্গের সীমানা অতিক্রম করেছে ; আর অবশেষে ভাগীরথীর পশ্চিমে এসে মিশেছে।

বিহারের সাঁওতাল পরগনায় মেসাঞ্জোরে উচ্চ বাঁধ ও পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় সিউড়ির কাছে তিলপাড়া ব্যারেজ, এ দুটিই ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার প্রধান পৌর্তিক কাজ।

তিলপাড়া ব্যারেজ থেকে খাল কেটে প্রায় ৬ লক্ষ একর জমিতে সেচ-ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেসাঞ্জোর বাঁধের উপরে বিহারে প্রায় ৩০ হাজার একর জমিতে সেচের ব্যবস্থাও হয়েছে।

মেসাঞ্জোর বাঁধে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে বিহারের দুমকা অঞ্চলে একটি শিল্পাঞ্চল গঠিত হবে। এই বাঁধ ২২৪০ ফুট দীর্ঘ আর এর দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম হ্রদ প্রায় ২৬,৫৬০ একর জমি জলনিমজ্জিত করবে। তার মধ্যে, ৯০০০ একর জমি জলখরচের পরে প্রতি বছরই চাষযোগ্য থাকবে। কারণ এই জমি হ্রদের সৈকতে অবস্থিত, বাঁধ দিয়ে জল নেমে গেলে ওখানে জল থাকবে না। এই ৯০০০ একর জমি স্বভাবতঃই গঙ্গার 'দিয়ারা' অথবা দামোদরের 'মানা' জমির মত খুবই উর্বরা হবে এবং অতি অল্প আয়াসে দ্বিগুণ ফসল উৎপাদন করতে পারবে বলেই বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন।

কৃত্রিম হ্রদে জমি নিমজ্জিত হওয়ার ফলে প্রায় ২১ হাজার কৃষককে বাস্তু থেকে উচ্ছেদ করতে হচ্ছে। তাদের পুনর্বসতির সমস্যার কথা প্রথমেই উল্লেখ করেছি।

সিউড়ি শহরের কাছে তিলপাড়া ব্যারেজ প্রায় ১২০০ ফুট লম্বা। তাতে ১৮০ ফুট লম্বা স্লুইস্ (sluice—জল নির্গমণের দ্বার) থাকছে। এই স্লুইসগুলি দিয়ে সর্বোচ্চ প্রায় ২,২৮,০০০ কিউসেক জল নির্গমণের ব্যবস্থা করা যায়। ব্যারেজের পোস্তাগুলির উপর দিয়ে একটি পথের সেতুও থাকছে।

এই ব্যারেজ থেকে উত্তরে ও দক্ষিণে দুটি প্রধান খাল কাটা হচ্ছে। উত্তরের প্রধান খাল ৭৮ মাইল লম্বা। দ্বারকা ও ব্রাহ্মণী নদীকে পার করাতে হয়েছে এই খালের উপর দিয়ে।

উত্তরের এই প্রধান খাল থেকে ৩১ মাইল শাখা ও ২০০ মাইল প্রশাখা খালের সাহায্যে আর প্রায় পাঁচ শতাধিক (falls, regulators, bridges) পৌর্তিক

ইমারতের সাহায্যে বীরভূম জেলার মুরারয়, নলহাটি, রামপুরহাট, ময়ূরেশ্বর ও মহম্মদ বাজার থানা এলাকায় সেচ-ব্যবস্থা হচ্ছে।

দক্ষিণের প্রধান খালও প্রায় ৭৮ মাইল লম্বা। এর শাখা খালগুলির দৈর্ঘ্য ২৩ মাইল এবং প্রশাখা খালের দৈর্ঘ্য ২২০ মাইল। এদিকেও পাঁচ শতাধিক পৌতিক ইমারত আছে। প্রধান খাল বক্রেশ্বর ও কোপাই নদী অতিক্রম করেছে। বীরভূম জেলায় সিউড়ি-সাঁইথিয়া, লাভপুর, রাজনগর, খয়রশোল, দুবরাজপুর, বোলপুর এবং নানুর থানায় সেচের ব্যবস্থা করছে এই দক্ষিণের খালগুলি।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় দুটি বাঁধে প্রায় চার হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। এর দুই-তৃতীয়াংশ কুটির শিল্পের জন্য ব্যবহৃত হবে; আর বাকি অংশ বিদ্যুৎবাতির ব্যবহারে লাগবে।

তা ছাড়া মৎস্য চাষের প্রসার, জলক্রীড়া ও স্বাস্থ্য-নিবাস পত্তন প্রভৃতি নদী-উপত্যকা পরিকল্পনায় অন্যান্য আঙ্গিকও রাখা হয়েছে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায়।

অজয় নদ

অজয় নদের উৎসও রাজমহল পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে, ময়ূরাক্ষীর উৎসস্থানের ৪০।৫০ মাইল পশ্চিমে। আর অজয় বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এরও উচ্চভূমির অববাহিকা খুবই কম। বেশী উপনদীও তাই এসে এতে পড়ে নি। দক্ষিণকূলে কুনুরই এর প্রধান উপনদী।

আঁকাবাঁকা পথে, অপেক্ষাকৃত সমতলভূমিতে এর মধ্য ও নিম্নাংশ প্রবাহিত হওয়ার দরুন এ নদীটি ঐতিহাসিক কালেও বেশ নাব্য ছিল। অজয়ের কূলে প্রসিদ্ধ কবি জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব বা আধুনিক কেন্দুলি গ্রাম। বর্ধমান ও বীরভূম জেলার সীমানা এই নদী দিয়েই নির্দিষ্ট হয়েছে। রাঢ়ের কৃষিসম্পদ ও তৎসঙ্গে সভ্যতা ও কৃষ্টির সম্পদ বৃদ্ধি করতে একদা অজয়ের প্রবাহ যে যথেষ্ট সাহায্য করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। জৈন সভ্যতার 'আয়রঙ্গ'-হাট অজয় উপত্যকাতেই ছিল বলে মনে হয়।

প্রধানতঃ রেল ও রাজপথের বাঁধে অববাহিকার বৃষ্টির জল অজয়ের খাতে নামতে বাধা পেয়েছে, তাই অজয়ের নাব্যতা ক্ষুণ্ণ হয়ে গিয়েছে। স্বল্পব্যয়ের পরিকল্পনার মাধ্যমে অজয়ের নাব্যতার উন্নয়ন করানো শক্ত নয়। নিকটেই দামোদর পরিকল্পনার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি রয়েছে, সুতরাং অজয় উপত্যকায় ভবিষ্যতে শিল্পাঞ্চল সৃষ্টির সুযোগ হবে। তখন অজয়ের নাব্যতা এ অঞ্চলের বাণিজ্য কার্যে প্রচুর সহায়তা করতে পারে। অজয়ের জলে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা সঙ্গত নয়, কারণ উঁচু বাঁধের অবস্থিতি-স্থানের অভাব। এ অঞ্চলের মূল্যবান জমি অনর্থক কৃত্রিম হ্রদের জলে ডুবিয়ে দেওয়াও উচিত নয়। আর যথেষ্ট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করবার মত জলও পাওয়া যাবে না অজয়ের অববাহিকায়। খালের সাহায্যে সেচ-ব্যবস্থারও প্রয়োজন নেই এ অঞ্চলে। কারণ যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় আর সেচের কাজ দীঘি, পুষ্করিণী, টিউবওয়েল প্রভৃতি বিকল্প পদ্ধতিতে চালানো সহজ। অজয়ের নাব্যতার উন্নয়নই একমাত্র কাম্য।

দামোদর নদ

পরবর্তী পরিচ্ছেদে দামোদর পৃথকভাবে আলোচিত হয়েছে।

দ্বারকেশ্বর-শিলাই-রূপনারায়ণ

প্রসঙ্গতঃ রূপনারায়ণের নিম্নাংশের উল্লেখ ইতিপূর্বেই করেছি। দামোদরের প্রধান প্রবাহ আজ রূপনারায়ণের নিম্নাংশ পথেই হুগলী নদীতে পড়ে। দ্বারকেশ্বর বা ঢলকিশোর রূপনারায়ণের উচ্চ অংশের নাম। দ্বারকেশ্বরের শেষে, মানভূমের মালভূমিতে উৎপন্ন শিলাই নদী রূপনারায়ণের দক্ষিণকূলে মিশেছে। অনেকগুলি ছোট ছোট উপনদী এই শিলাই-এর। কাজেই নিম্ন রূপনারায়ণের অববাহিকা বেশ বড়ই; দামোদরের অববাহিকা ও মানভূম অঞ্চলের, বাঁকুড়া জেলার, মেদিনীপুর জেলার অনেক বৃষ্টির জল এই পথে হুগলীতে পড়ছে।

দ্বারকেশ্বরও মানভূমের উচ্চভূমি থেকে নেমেছে শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে পূর্ববাহিনী প্রবাহে বাঁকুড়া শহরে পৌঁছে ক্রমে দক্ষিণ-পূর্ব গতি নিয়েছে। প্রাচীন বিষ্ণুপুর শহর দ্বারকেশ্বরের এই অংশে অবস্থিত। তারপরে হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায় প্রবেশ করে দ্বারকেশ্বর দক্ষিণাভিমুখী গতি নিয়ে মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করে রূপনারায়ণ নাম নিয়েছে ঘাটালের নিচেই। এই ঘাটালের কাছেই শিলাই এসে মিশেছে।

মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার সীমানা নির্দেশ করে নিম্নাংশে রূপনারায়ণ দামোদরের মূলপ্রবাহ গ্রহণ করছে, আর তার পরে মহিষাদলের কাছে নদীর নিম্নাংশে পরিণত হয়েছে।

হুগলী নদী থেকে ঘাটাল অবধি রূপনারায়ণ সুনাব্য ছিল। আরামবাগ মহকুমার এক বৃহৎ অংশ নিয়ে একটি বিস্তৃত অঞ্চল, রূপনারায়ণের নাব্যতার উপর নির্ভর করে রয়েছে, যাতায়াতের অন্য সহজ উপায় নেই। কাজেই এ অঞ্চলের কল্যাণার্থে রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর ও শিলাই-এর নাব্যতার উন্নয়ন বিশেষ প্রয়োজন। উচ্চাংশে ও উপনদীগুলিতে ছোট ছোট বাঁধ ও ব্যারেজ নির্মাণ করে এদের নাব্যতার উন্নয়ন কার্য মোটেই শক্ত নয়। বাঁকুড়া অংশে কিছু কিছু খালের সাহায্যে সেচ-ব্যবস্থাও হতে পারে। বাঁকুড়ায় বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য ও নিয়মিততা নির্ভরযোগ্য নয়। সেইজন্যে কৃষিকার্যের অসাফল্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বৃষ্টির জলে ভূমির ক্ষয় হয়ে বাঁকুড়ায় ভূমির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে,—ভূমিক্ষয় সুষ্ঠু ব্যবস্থায় নিবারিত না হলে এ অঞ্চলের সর্বনাশ হবে।

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অধিকাংশ অঞ্চলে, দ্বারকেশ্বর ও দামোদরের খাত পরিবর্তনের ফলে বৃহৎ জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছে। দামোদরের বর্তমান পরিকল্পনা আরামবাগ, মেদিনীপুর ও হাওড়ার সমস্যার দিকে যথেষ্ট দৃষ্টিপাত করে নি। ফলে, সুষ্ঠু জলনিকাশী পরিকল্পনার অভাবে ও দামোদর পরিকল্পনার ত্রুটির ফলে, আরও এক বৃহদংশ জলাভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বোধ করি, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য দ্বারকেশ্বর-রূপনারায়ণে কিছু কিছু পর্যবেক্ষণের কাজ হাতে নিয়েছেন। বোধ হয় বারবার আমাদের সমালোচনার ফলেই। দেখা যাক, তাঁরা কি করেন!

সুষ্ঠু জলনিকাশী ও নাব্যতায় উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ না করে পরিবর্তে দামোদর পরিকল্পনার খাল মারফত সেচ পরিকল্পনায় এ অঞ্চলের সমস্যা বড়ই জটিলতর হয়ে গিয়েছে। রূপনারায়ণের নাব্যতা আরও নষ্ট হয়ে যাবে।

রূপনারায়ণের উপরেই প্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্তির চিহ্ন তমলুক শহর। এই শহর ৩০।৪০ বছর পূর্বেও একেবারে রূপনারায়ণের পারে অবস্থিত ছিল, আজ প্রায় অর্ধমাইল ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে একটি বৃহৎ চরের। দামোদর পরিকল্পনার বাঁধ নির্মিত হয়ে গেলে রূপনারায়ণের নিম্নভাগ আরও মজে যাবে। তার প্রতিকার করা যায় পূর্বোল্লিখিত দ্বারকেশ্বর ও শিলাই-এর উচ্চ অববাহিকায় বাঁধ ও ব্যারেজ নির্মাণ করে, রূপনারায়ণের প্রবাহ নিয়মিত রেখে ও নানা নদী শাসন কাজে মধ্য-অববাহিকার (আরামবাগ প্রভৃতি অংশে) নদীখাতের উন্নতি করে এবং জলাভূমির উঠিত করে, এই এলাকায় বৃষ্টির জলকে রূপনারায়ণের খাতে প্রবাহিত হতে সাহায্য করলে। এর ফলে হুগলীর নিম্নাংশের নাব্যতা নষ্ট হবার যে ভয় দেখা দিয়েছে, তারও আংশিক প্রতিকার হবে (সম্পূর্ণ নয়)।

ঘাটালের উপর অবধি রূপনারায়ণে জোয়ার-ভাঁটা খেলে, রূপনারায়ণে বানও ডাকে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে সমুদ্রের জলোচ্ছাস রূপনারায়ণের অঞ্চলে এক ভীষণ প্লাবনের সৃষ্টি করেছিল।

কোলাঘাটের কাছে রেলওয়ে সেতু রূপনারায়ণের প্রবাহে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছে। নিম্নাংশে রূপনারায়ণের গর্ভে পলিপাতনের কারণ হুগলী নদী সম্বন্ধে আলোচনার সময়েই বলা হয়েছে। এই রেলওয়ে সেতু কর্তৃক সৃষ্ট আকস্মিক সংকীর্ণতাও সেতুর দুই দিকের অংশে পলিপাতনে সাহায্য করে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে রূপনারায়ণ তার বামতীরের পাড় ভেঙে সেতু বাদ দিয়ে নতুন খাতে প্রবাহিত হতে চেষ্টা করেছিল। প্রলম্বিত বাঁধ (groyn)-এর সাহায্যে তার এ প্রয়াস নিষ্ফল করা হয়েছে। পুণার ঔদক গবেষণাগারে রূপনারায়ণের এই প্রলম্বিত বাঁধের স্বল্পায়তন প্রতিকৃতির উপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে, এই বাঁধের ডিজাইন করা হয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রে স্বল্পায়তন প্রতিকৃতির উপর গবেষণা অনেক বাদানুবাদ লাঘব করতে সাহায্য করে—সরল সমস্যার সমাধানে এরূপ গবেষণার নির্ভরশীলতা অনস্বীকার্য। যদিও অভিজ্ঞ ও ভুয়োদর্শী ইঞ্জিনিয়ারগণ অপর ক্ষেত্রের প্রলম্বিত বাঁধের কার্যকারিতা ও অপকারিতার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল এবং পুণার গবেষণা নিরর্থক ও অপব্যয় বলেই মনে করেন।

কাঁসাই-হলদি

নিম্নাংশে কাঁসাই-এরই নাম হলদি। এটি হুগলীর মোহানায় সর্বশেষ উপনদী। কাঁসাইও মানভূম উপত্যকায় উদ্ভূত হয়েছে। পুরুলিয়া শহরের কাছে কাঁসাই স্বপারিচিত নদী। বর্ষাকালের বৃষ্টির জলে কাঁসাইও স্ফীত হয়।

হলদিতে জোয়ার-ভাটা খেলে তাই হলদি নাব্য। কাঁসাই-এর নাব্যতারও উন্নয়ন করা যেতে পারে সহজেই, অন্ততঃ মেদিনীপুর শহর অবধি। কয়েকটি লকগেটের সাহায্যে আরও উচ্চতর অংশে যাওয়া সম্ভব।

রূপনারায়ণ হুগলীর নাব্যতা উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুরের নিচে কাঁসাই-এর মূল প্রবাহ পারবর্তিত খাতে রূপনারায়ণে সংযুক্ত করা যায় কিনা, বিবেচনা করে দেখা উচিত। দামোদরের বন্যা নিরুদ্ধ হলে, নিম্ন-হুগলীর ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে হলদিও অনেক মজে যাবে।

সুবর্ণরেখা নদী

সুবর্ণরেখার কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নতুবা মুখ্যতঃ এটি বিহার ও উড়িষ্যার নদী এবং উড়িষ্যার সমুদ্রেই এর মোহানা। সুবর্ণরেখার জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনার সম্ভাবনা প্রচুর। এরও উৎস দামোদরের উৎসের নিকটেই, পালামৌ জেলার টোরির কাছে। এর উচ্চ এলাকার অববাহিকাও সুবিস্তীর্ণ—সমগ্র দক্ষিণ ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার উচ্চভূমি। উড়িষ্যা, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সমবেত প্রচেষ্টাতে সুবর্ণরেখা উপত্যকা পরিকল্পনা রূপায়িত করা যায়।

সুবর্ণরেখার জলের কিয়দংশ হুগলীতে আনা যায় কিনা, তাও বিবেচনা করে দেখা উচিত।

পূর্ববঙ্গের উপনদী

কর্ণফুলি একটি মূল নদী, চট্টগ্রামের কাছে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। পাকিস্তান গভর্নমেন্ট কর্ণফুলি নদীতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় ইতিমধ্যেই হাত দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের সহযোগিতায় ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে পাকিস্তান বরাক-মেঘনা, সুরমা প্রভৃতি নদীর পরিকল্পনার অংশ গ্রহণ করতে পারে। পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টির দেশে এই নদীগুলির জন্ম, বর্ষায় এদের বিপুল জল মেঘনা-পদ্মার মোহানায় নামা বিলম্বিত করতে পারলে পূর্ববঙ্গের বন্যার ধ্বংসলীলা অনেক কমতে পারে। এই নদীগুলির বিপুল জলশক্তি অপচয়িত হচ্ছে, সুষ্ঠু পরিকল্পনায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত করলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের অনেক সহায়তা হয়। তা ছাড়া, পদ্মা-মেঘনা মোহানার নাব্যতার উন্নয়ন করা যায়, মেঘনার জলশক্তির সাহায্যে। ফলে পদ্মা-মেঘনার মোহানার কাছে, চাঁদপুরে, একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দর পত্তন করা যায় সমুদ্রগামী জাহাজের জন্য।

বরাক, মেঘনা, সুরমা প্রভৃতি নদীর উপত্যকায় অন্ততঃ দশ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হতে পারে বলেই আমার অনুমান। বর্তমানের জলশক্তির অপচয় নিবারণ করতে প্রয়োজন পাকিস্তানের অর্থবল ও অধ্যবসায়।

নবম পরিচ্ছেদ

দামোদর ভাগীরথী-হুগলী নদীর উপনদ

দামোদরের গুরুত্ব

ভাগীরথী-হুগলীর পরেই দামোদর নদের স্থান পশ্চিমবঙ্গে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে। আমার দৃঢ় অভিমত এই যে, দামোদরের বন্যাই হুগলীর মোহানায় কলিকাতা বন্দরের নাব্যপথ এ যাবৎ অব্যাহত রেখেছে। সম্প্রতি দামোদর পরিকল্পনা গৃহীত হয়ে দামোদরের বন্যা নিরুদ্ধ করা হচ্ছে। কলিকাতা বন্দরের নাব্যপ্রণালীর রক্ষা করবার সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ করতে না পারলে, তা নষ্ট হয়ে যাবে অতি সত্বর। এ কথা আমি দৃঢ়ভা.ব সকলকেই জানাচ্ছি।

দামোদরের বন্যার ধ্বংসলীলা চীনের হোয়াংহো নদীর বন্যার ধ্বংসলীলার সঙ্গে তুলনা করা হয়। দুটি নদীর এক বিষয়ে সাদৃশ্য এই যে, পাড়ে দীর্ঘ উঁচু সমান্তরাল বাঁধে বন্যাপ্রবাহ নদীখাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখার ফলে, তাদের গর্ভ পাশের জমির চেয়ে অনেক উঁচু হয়ে গিয়েছে। (যদিও এ কথার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত নই, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষ অনুচ্ছেদে সে কথা বলেছি)। আর মাঝে মাঝে বাঁধ ভেঙে বন্যার জল জনপদ প্লাবিত করে দেয়। হোয়াংহো দামোদরের চেয়ে অনেক বড় নদী, তার ধ্বংসলীলায় তাই লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায়, লক্ষ লক্ষ একর জমির ফসল নষ্ট হয়। দামোদরের বন্যার কবলে হতভাগ্য জনকয়েক মানুষ কখনও কখনও মারা গিয়েছে, গো-মহিষাদি পশুও মরেছে আর কয়েক হাজার একর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে।

কয়েক হাজার বছর আগে হোয়াংহোর পাড়ে বাঁধ নির্মিত হয়েছিল। দামোদরের আদিম বাঁধ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেছিল কিংবা মানুষে গঠিত করেছিল, তার সঠিক প্রমাণ না থাকলেও দামোদরে আদিম বাঁধ স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছিল প্রথমে এটাই যুক্তিযুক্ত অনুমান। বর্ধমানের পূর্বে দামোদরের সহসা সমকোণে দক্ষিণ প্রবাহ দেখে মনে হয়, মানুষই এখানে হয়তো বাঁধ দিয়ে তার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। ভগীরথের সময়েই হুগলীর নাব্যতাকে সাহায্য করবার জন্য দামোদরে এরকম মোড়-ফিরানো বাঁধ দেওয়া হয়েছে—এরূপ অনুমানও যুক্তিহীন নয়, হুগলীর নাব্যতার উপর দামোদরের বন্যার সুফল পর্যবেক্ষণ করলে।

কলিকাতা থেকেই বাংলা দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। আর দামোদরের বন্যা তো কলিকাতার অতি নিকটের ঘটনা, তাই খুবই ফলাও করে তার বিবরণ প্রচারিত হতে বাধা ছিল না। বিশেষতঃ সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলের ক্ষতির ঢাক খুব জোরে জোরেই পিটানো হয়। রেল, রাস্তা প্রভৃতি ভাঙার ফলে রাজ কার্যে ও বাণিজ্যিক কার্যে যে সাময়িক অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তার জন্য প্রভাবশালী মহলে প্রচণ্ড সাড়া পড়ে যায়। তাই বাংলা, আসাম ও বিহারের অন্যান্য নদীর বন্যার ধ্বংসলীলা অনেক ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও তাদের কাহিনী লোকে শুনতে পেত না যতটা দামোদরের বন্যার কথা শুনতো। সম্প্রতি আসাম, উত্তরবঙ্গ ও

বিহারের বন্যার কথা যথেষ্ট প্রচারিত হচ্ছে বটে, কিন্তু ওই সব অঞ্চলে বন্যা নিরোধের কাজ হাতে নেওয়া, উচ্চমহলের নানা ওজুহাতে স্থগিত রাখা হচ্ছে।

এসব কথা বলার আমার উদ্দেশ্য এই যে, দেশের উপর কোনও কোনও নদীর বন্যার নিয়ন্ত্রিত প্লাবনের প্রয়োজনও আছে। সব সময়ে সকল বন্যার নিন্দা প্রচার করা উচিত নয়। জরিপ করে নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে বসবাস সৃষ্টি, অথবা প্লাবিত অঞ্চলেও উপযুক্ত গৃহাদির নির্মাণে বসবাস সৃষ্টি সম্ভব। সুষ্ঠু পদ্ধতিতে অতিরিক্ত প্লাবনের ধ্বংসলীলা নিয়ন্ত্রিত করাও সম্ভব ও কাম্য। কিন্তু ব্যাপকভাবে যত্রতত্র **বন্যা সম্পূর্ণ নিরোধ** করলে তার কুফল সুফলকে অতিক্রম করে যাবে। বন্যার নিরোধ নয়, সুষ্ঠু পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণই কাম্য।

চীনের ইয়াংসি নদীর সমান্তরাল বাঁধ প্রায় একশত ফুট উঁচু হয়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে। ভাগ্যে, অন্ধ অনুকরণে ওই পদ্ধতি পূর্ববঙ্গে পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলে গৃহীত হয় নি, তাই আজও ওখানকার মানুষ বন্যার অত্যাচার সহ্য করেও স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির দ্বার খোলা রেখেছে। (পূর্ববঙ্গে প্লাবনের ক্ষয়ক্ষতির আতিশয্য যেরূপ নিয়ন্ত্রণের ফলে কমানো যায়, তার ইঙ্গিত পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের শেষে দেওয়া হয়েছে)। 'কর্মঠ' ব-দ্বীপের স্বাভাবিক কাজ আজও সেখানে অব্যাহত আছে, তার অবশ্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

চীনের হোয়াংহো অথবা ইয়াংসির বন্যার সঙ্গে দামোদরের বন্যার তুলনা, হাতীর সঙ্গে ইঁদুরের তুলনার মত। তাই দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ মহলে বহুদিন শুধু আলাপ-আলোচনা, কমিটি-কমিশনেই কেটেছে। বন্যার ধ্বংসলীলার আতিশয্য কমাবার জন্যে অনেক সুপ্রস্তাবও উঠেছিল। কিন্তু **বন্যা নিরোধের** কথা উঠেছে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের পরে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দামোদরের বন্যা যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আয়োজনের কাজ কয়েক মাস ধরে ওলট-পালট করে দেয় কলিকাতা থেকে পশ্চিমে যাতায়াতের পথ ভেঙে, তখনই বৃটিশ শাসকমণ্ডলী খুব গুরুত্ব দিলেন দামোদরের বন্যার।

এতদিন ধরে দামোদরের বন্যা ও নতুন নতুন 'হানা' সৃষ্টি যে কৃষিভূমি নষ্ট করে জলাভূমির সৃষ্টি করছিল, বিশেষতঃ আরামবাগ মহকুমায়, তার কোনও ব্যবস্থার কথা বৃটিশ শাসকেরা ভাবেন নি। (এমন কি বর্তমান পরিকল্পনাতেও দামোদরের নিম্নাঞ্চলে জলাভূমির জলনিকাশী কোনও সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই)। কিন্তু দামোদরের বন্যা **যুদ্ধের পথ** অচল করাতে লর্ড ওয়াভেলের দল ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমেরিকার 'টেনেসি উপত্যকা পরিকল্পনা'র অন্ধ অনুকরণে দামোদরের **বন্যা নিরোধের** ব্যবস্থা হয়ে গেল। আর ভালো করে তথ্য সংগ্রহের ও এই বন্যা নিরোধের প্রতিক্রিয়াগুলি সমঝে না নিয়েই তাড়াহুড়া করে দামোদর পরিকল্পনা রূপায়িত করা শুরু হয়ে গিয়েছে।

বন্যা নিরোধ অথবা নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে কেউ থাকতে পারে না, আমিও নই। কিন্তু তথ্য সংগ্রহের জন্যে যথেষ্ট সময় ও সুযোগ না দিয়ে তাড়াহুড়া করে এ রকম গুরুত্বপূর্ণ ও সমস্যা-সঙ্কুল কাজে হাত দিলে অযথা বিপুল অর্থ অপব্যয় এবং নানা কুফল ও প্রতিক্রিয়াই লাভ হবে। (অবশ্য, একশ্রেণীর মানুষের সুযোগ উপস্থিত হয় দেশের অর্থ যখন এইভাবে অপব্যয়িত হয়)। কোনও কোনও কুফল ও প্রতি-

ক্রিয়া আরও অর্থব্যয়ে সংশোধন করা যেতে পারে। কিন্তু দামোদরের বন্যা নিরোধের ফলে হুগলীর নাব্যতা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মত কুফল সংশোধন করতে যেসব নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, তার ব্যয়ভার বহন করবার ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত ভারত গভর্নমেণ্টের থাকলেই বাঁচি। হুগলীর নাব্যতা ধ্বংস হলে কলিকাতা বন্দরের অস্তিত্ব লোপ পাবে, সেই সঙ্গে বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে কলিকাতার গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যাবে, কলিকাতা ঐশ্বর্যহীন হয়ে পড়বে, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ভিত্তিও নষ্ট হয়ে যাবে। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করেই মনে হয়, দামোদর নদ ও তার বন্যা পশ্চিমবঙ্গের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই দামোদর নদের যথাসম্ভব পূর্ণপরিচয় গ্রহণই আমাদের এখন মুখ্য লক্ষ্য।

দামোদরের উচ্চপ্রবাহ ও মধ্যপ্রবাহ

দামোদর প্রায় ৩৭০ মাইল লম্বা। বিহারের পালামৌ জেলায় টোরির কাছে খামারপাৎ পাহাড়ের সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩,৫০৪ ফুট উচ্চ শৃঙ্গে যে বৃষ্টি পড়ে, সেই বৃষ্টির প্রথম বিন্দুটিই দামোদরের ভ্রূণ সৃষ্টি করে ছোটনাগপুরের পার্বত্য উপত্যকায় ক্রমে ঝরনার আকারে। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে ঝরনা ও প্রস্রবণগুলি ২,০০০ ফুট উঁচু উপত্যকায় পড়ে নদীর আকার নেয়। যে প্রধান ঝরনা থেকে দামোদরের উৎপত্তি, তার স্থানীয় নাম সোনাসাথী। নদীর আকারে দামোদরের স্থানীয় নাম দেওনদ। অনেকগুলি গিরিখাতের মধ্যের উপনদী এসে দক্ষিণে দেওনদে মিশেছে, অনেক জলপ্রপাতও আছে, কোনও কোনটি ৭০ ফুট। উত্তরেও অনেক উপনদী মিশেছে, তারা আয়তনে অপেক্ষাকৃত বড়। এদের মধ্যে বরকাগাঁও-এর কাছে ১১০ ফুট জলপ্রপাত দ্রষ্টব্য।

হাজারিবাগ জেলায় ১,০০০ ফুট উচ্চ উপত্যকাতেই দামোদর নামের প্রচলন আরম্ভ হয়েছে। রামগড়ের (যেখানে একবার কংগ্রেস-অধিবেশন হয়েছিল) কাছে প্রস্তরের সীমানায় তার প্রবাহ। মূড়ী জংশন রেলওয়ে স্টেশন থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে, অরণ্যে, নদীগর্ভে পর্বতশিলায় রাজরপ্পায় ছিন্নমস্তার মন্দির দেখতে অনেকে যান। এখানে ভেরা নদীর সঙ্গে দামোদরের সঙ্গম হয়েছে।

তারপরে কিছুদূর পর্যন্ত দামোদর উত্তরমুখী প্রবাহ। বেরমোর কাছে বোকারো ও কোনার নদী দামোদরে মিশেছে। বোকারোতেও ৪০ ফুট জলপ্রপাত আছে। দামোদর নদের উত্তরে হাজারিবাগ উপত্যকাও ক্রমে ২,০০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়েছে, কাজেই এ দিকের উপনদী বহু পরিমাণ জল অতিদ্রুত দামোদরে এনে ঢেলে দেয়। নিম্নতর উপত্যকা মানভূমে পৌঁছালে, দামোদরের প্রধান উপনদী বরাকর দিশেরগড়ের কাছে দামোদরের সঙ্গে মিশেছে। তার পরেই দামোদর পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে পূর্বমুখী গতিতে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে আর সেই ভাবে পৌঁছেছে বর্ধমান শহরের কাছাকাছি পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গের এই প্রবাহটুকুকে দামোদরের মধ্যপ্রবাহ বলা চলতে পারে। এখানে দামোদরই বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার সীমানা নির্দিষ্ট করছে। বর্ধমানের ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে চাঁচাই গ্রামের কাছে, দামোদর সহসা সমকোণ বাঁক নিয়ে দক্ষিণাভিমুখী গতি নিয়েছে। এই অঞ্চলেই দামোদরের ব-দ্বীপ-অঞ্চলের আরম্ভ (যদিও ঠিক বৈজ্ঞানিক ভাষায়

ব-দ্বীপ বলা উচিত নয়) হুগলী নদীর সঙ্গম স্থান থেকে প্রায় ৭২ মাইল উত্তরে জামালপুরে। কারণ এখান থেকেই তার শাখা বিস্তার ও খাত পরিবর্তন শুরু। উপরের মধ্যপ্রবাহেও বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায় অবশ্য দামোদর কয়েকটি 'হানা'-পথ কেটেছে, দ্বারকেশ্বরের উপত্যকায় মিশতে।

পার্বত্য উপত্যকায় ভূমিক্ষয়ের ফলে প্রচুর শিলা, বালি, পলি দামোদরের প্রবাহে এসে মধ্যপ্রবাহের অনুকূল ঢালে অবক্ষেপিত হয় বলেই এ প্রবাহে নদীর গর্ভ ক্রমশঃ উঁচু হয়েছে আর মাঝে মাঝে প্লাবনের সৃষ্টি করেছে স্বাভাবিক নিয়মে, নিম্নভূমিতে—এই মূল সত্য ভুললে চলবে না।

বর্ধমান শহর থেকে মোহানা পর্যন্ত শেষ ১০০ মাইলেই দামোদরের বন্যার প্রকোপ। শিবগঞ্জের মোহানার কাছ থেকে এই অঞ্চল ক্রমশঃ উঁচু হয়ে সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ১০০ ফুট উচ্চ রেখায় পৌছেছে। অর্থাৎ এই অঞ্চলে দামোদরের ঢাল প্রতি মাইলে গড়পড়তা এক ফুট। দিশেরগড়ের ৫৮ মাইল পূর্বে দামোদরের বাম উপকূলের বাঁধ শুরু। এই বাঁধই বামকূলের অঞ্চলকে বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা করে আর মাঝে মাঝে ভেঙে গিয়ে এ অঞ্চলকে বন্যা-বিধ্বস্ত করে। ক্রমে ক্রমে বামকূলের এই বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। দক্ষিণকূলেও বাঁধ ছিল। কিন্তু ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে খাস বর্ধমান শহরও যখন দামোদরের বন্যায় বিধ্বস্ত হয়ে যায়, তখন সাব্যস্ত করা হয় এই দক্ষিণকূলের বাঁধ দেওয়ার। এর ফলে বন্যার জল দক্ষিণকূলে সাধারণ চাষাভুষাদের জমি ভাসিয়ে দেবে আর কম চাপ দেবে সমৃদ্ধিশালী বর্ধমান শহরের রক্ষক বামকূলের বাঁধের উপর। সেই সঙ্গে বামকূলের বাঁধের উচ্চতা আরও বাড়ানো হল। এই বাঁধ আজ পার্শ্ববর্তী ভূমিপৃষ্ঠ থেকে ২৫ থেকে ৪০ ফুট পর্যন্ত উঁচু। ওদিকে নদীগর্ভও বালি ও মাটিতে বাঁধের উপর থেকে মাত্র ২৫ থেকে ১৫ ফুট নিচু পর্যন্ত ভরাট হয়ে গিয়েছে। কাজেই বর্ধমান জেলায় দামোদরের বর্তমান গর্ভ পার্শ্ববর্তী ভূমি থেকে ১৫ থেকে ২০ ফুট উঁচু। ইতিমধ্যে একটি স্বাভাবিক বাঁধও দক্ষিণকূলে গড়ে উঠেছে।

বর্ধমানের কাছে রণ্ডিয়ায় দামোদরের প্রবাহে আড়াআড়ি নিচু পাকা বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। এই পাকা বাঁধের নাম এণ্ডারসন হুেবর (Anderson Weir) এই হুেবর-এই দামোদরের জলপ্রবাহের মাপজোখ করা হয়। আর এই বাঁধের উপর থেকেই একটি খাল কেটে বর্ধমান অঞ্চলে আংশিক সেচ-ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই খালের নাম ইডেন খাল।

দামোদরের প্রাচীন পরিত্যক্ত খাত

খাড়ি, বাঁকা ও বেহুলা নদী দামোদরেরই প্রাচীন খাত বলে বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্ত করেছেন। আজ এই নদীগুলির দামোদরের সঙ্গে কোনও যোগ নেই, তারা তাদের প্রবাহিত ভূমিখণ্ডটুকুর বৃষ্টির জলের নালা ছাড়া আর কিছুই নয়। হুগলী নদীর সঙ্গে সঙ্গমের ফলে কিছুটা জোয়ারের জলও কিছুদূর পর্যন্ত তাদের মধ্যে ওঠে। এই নদীগুলি পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিত। প্রাচীন কালে, ভাগীরথী-হুগলীর অস্তিত্বেরও আগে, এই পথে দামোদর ২৪ পরগনা জেলার পূর্ব দিক দিয়ে সমুদ্রে পড়তো।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের বন্যায় দামোদরের জল বেহুলার খাত ধরে হুগলীতে নেমেছিল। সমকোণে আবার দক্ষিণের খাতে প্রবাহিত হবার জন্য। মানুষ যদি বাঁধ সংস্কার করে তার গতি নিয়ন্ত্রিত না করতো তা হলে হয়তো এই পথেই দামোদর আবার তার খাত প্রবাহিত করতে পারতো, যে দামোদরের সোজাসুজি বেহুলা প্রভৃতির খাত ধরে হুগলী নদীতে পড়বার আজও এত চেষ্টা, প্রাচীনকালে সে কি করে স্বাভাবিক নিয়মে দক্ষিণাভিমুখী গতি নিয়েছিল? ভগীরথই কি তাকে ওই ভাবে বেঁধে হুগলীর নিম্নাংশে সংযুক্ত করেছিলেন নাব্যতায় সাহায্য করবার জন্য? ভূগোলশাস্ত্রবিদেরা কিন্তু বলেন, স্বাভাবিক নিয়মেই, ভাগীরথী খাল সৃষ্টি হবার পরে, দামোদরের ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখী গতি হয়ে যাওয়াতেও অসম্ভব কিছু নেই। আমি এ অভিমতের সঙ্গে সায় দেই না।।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে রেলপথ-রাজপথের পত্তনের ফলেই খাড়ি, বাঁকা, বেহুলা প্রভৃতি নদী অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে—বন্যার উদ্বৃত্ত জল এসে তাদের খাত পূর্বে পরিষ্কার করতো, রেলের ও পথের বাঁধ তাদের স্বাভাবিক জলনিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়েছে। কাজেই নদীর গতি-বিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী তাদের খাত সর্পিল ও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে গিয়েছে। তাদের পূর্বগৌরব নেই, লজ্জায় যেন তারা পালনিক মৃত্তিকায় গভীর খাত কেটে লুক্কায়িত হয়ে মানুষের দৃষ্টিপথের আড়ালে কুণ্ঠিতভাবে এঁকে বেঁকে চলেছে।

'কাণা' নদীগুলি

নিম্নপ্রবাহে মূল দামোদরের পশ্চিমাঞ্চলে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত শাখাগুলির মধ্যে বেগোর হানা দিয়ে মুণ্ডেশ্বরীর পথেই দামোদর নদের শতকরা ৭৫ ভাগ জল আজ রূপনারায়ণে পৌছায়। এই পশ্চিমে একটি কাণা নদী ও কাণা দ্বারকেশ্বরও মুণ্ডেশ্বরীর উপশাখার মত। তারা দ্বারকেশ্বর থেকে নেমেছিল।

মুচির ও বেগোর হানা দিয়ে মুণ্ডেশ্বরীর পথ দামোদরের সবচেয়ে আধুনিক পথ—এই শতাব্দীরই প্রথম দিকে স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু জোরালো হয়েছে ১৯১৪।১৫ খৃষ্টাব্দেই।

মূল দামোদরের পূর্বাঞ্চলের শাখাগুলিও উত্তর থেকে দক্ষিণে অথবা পূর্ব দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছে। ঘেয়া, কাণা নদী, কাণা দামোদর, রাণাবাঁধ খাল, কাণা খাল (এই শেষোক্ত দুটি মিলে মাদারিয়া খাল), কেদো খাল প্রভৃতি হয় দামোদরের পরিত্যক্ত খাত অথবা কাটা খাল।

উইল্‌কক্‌স সাহেবের অনুমান এদের সবগুলিই এই অঞ্চলে বর্তমান দামোদরের খাত পর্যন্ত সেচের কাজের জন্য মূল দামোদরের প্রবাহপথ পরিবর্তিত করে কাটা খাল ছাড়া কিছু নয়। আর কাণা শব্দ প্রাচীন বাবিলনীয় 'কাণাল' (Canal) শব্দেরই অপভ্রংশ।

তবে, অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা ও ভূগোলশাস্ত্রবিদেরা উইল্‌কক্‌স সাহেবের এই 'সেচের খাল' থিওরি সমর্থন করেন না। তাঁরা বলেন, এই সব শাখাগুলির দু-একটি কাটা খাল হলেও হতে পারে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নদীর নিম্নপ্রবাহে মুক্ত শাখার খাত ছাড়া আর কিছু নয়—দামোদর হানা-পথে এমনিভাবে খাত পরিবর্তন

করে এখানকার ভূমি উঠিত করেছে। তাঁরা বলেন ব্রহ্মপুত্র যেমন একদিন আসাম থেকে নির্গত হয়ে তার উত্তরবঙ্গে পশ্চিমাভিমুখী গতি অকস্মাৎ ধুবড়ীর কাছে দক্ষিণাভিমুখী করেছে, তেমনি অতি প্রাচীনকালে দামোদর জামালপুরের কাছে পূর্বাভিমুখী গতি ছেড়ে দক্ষিণবাহী হয়েছে। ধুবড়ীর কাছে ব্রহ্মপুত্রের খাত বাঁকাবার জন্যে সাহায্য করেছে উত্তরবঙ্গের হিমালয় নিঃসৃত অন্যান্য নদী। সে রকম কোনও নদী কিন্তু দামোদরের খাত পরিবর্তনে সাহায্য করেছে বলা যায় না। তাই, আমার বিশ্বাস কৃত্রিম উপায়েই দামোদরকে বাঁকানো হয়েছে। অবশ্য সেচের কাজের জন্যে নয়, নিম্ন-হুগলীর নাব্যতায় উৎকর্ষ সাধনের জন্য।

স্বাভাবিক কারণেই হোক অথবা মানুষের কৃত্রিম প্রয়াসেই হোক, হুগলীর নিম্নভাগে দামোদর-রূপনারায়ণের সঙ্গম যে হুগলীর সমুদ্রগামী নাব্যপ্রণালী অব্যাহত রাখতে সাহায্য করছে, ইঞ্জিনিয়ারদের সে বিষয়ে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। আর দামোদরের বন্যার প্রবাহ নিরুদ্ধ হয়ে গেলে কলিকাতা বন্দরের অস্তিত্বই লোপ পাবে, যদি না ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক বিকল্প পদ্ধতিতে হুগলী নদীর নাব্যতা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

দশম পরিচ্ছেদ

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা

বর্তমান দামোদর পরিকল্পনার জন্মকথা

ইতিপূর্বেই বলেছি, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের বন্যার ফলেই বর্তমান দামোদর পরিকল্পনার জন্ম হয়েছে। এই বন্যার অব্যবহিত পরেই বাংলা গভর্নমেণ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই 'দামোদর বন্যা-অনুসন্ধান-কমিটি'র সদস্য ছিলেন দশজন: ১] বর্ধমানের মহারাজা, ২] বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা, ৩] ঔদক বৈজ্ঞানিক, নদীগবেষণাগারের ডিরেক্টর ডক্টর নলিনীকান্ত বসু, ৪] বন্দর সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মিঃ সি. সি. ইংলিশ, ৫] মিঃ হার্ট, ৬] মিঃ এল. আর. সাভারওয়াল, ৭] মিঃ এ. করিম, ৮] মিঃ বি. এল. স্ববারওয়াল, ৯] মিঃ কিলফোর্ড ও ১০] মিঃ সইন। এই কমিটি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি ভ্যালি পরিকল্পনার অনুকরণে একটি দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার কথা উত্থাপন করলেন। শেষ পর্যন্ত তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল এই সুপারিশ কার্যকরী করতে উদ্যোগী হলেন ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে। টেনেসি ভ্যালি পরিকল্পনার ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ডব্লু. এল. ভুরডুইন কেন্দ্রীয় সরকারের জলবিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হলেন ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে এবং দামোদর পরিকল্পনার জন্ম হল। (চিত্র নং ৮)

এর পরেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন সকলের কাছেই সুপরিচিত। ১৯৪৭খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে দেশভাগ করে ভারত গভর্নমেণ্টের কর্ণধার হলেন প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা শ্রীজওহরলাল নেহেরু, প্রধানমন্ত্রী। শ্রীনেহরু ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে 'দামোদর ভ্যালি করপোরেশন'—ডি. ভি. সি. (D. V. C.) গঠিত করলেন—উক্ত সংগঠনকে পরিকল্পনা রূপায়িত করবার ভার দিয়ে। তিনজন সদস্য নিয়ে এই কার্যকরী করপোরেশন গঠিত এবং এর ক্ষমতা পার্লামেণ্টের বিশেষ আইন-বলে স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত। নীতি নির্ধারণের হাত অবশ্য বাংলা, বিহার ও ভারত গভর্নমেণ্টের।

শ্রীজওহরলাল নেহরুর বিশেষ উৎসাহে ও তাড়ায় ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দেই পূর্ণোদ্যমে ডি.ভি.সি'র কাজ শুরু হয়। ডি. ভি.সি'র প্রথম তিনজন সদস্যের নাম: শ্রীএস. কে. মজুমদার, আই. সি. এস., শ্রীফুলনপ্রসাদ বর্মা ও ডক্টর গুহ। সম্প্রতি যাঁরা নিযুক্ত হয়েছেন তাঁদের নাম: শ্রীপি. এস. রাউ, শ্রীফুলনপ্রসাদ বর্মা ও শ্রীএ. বি. গাঙ্গুলি, আই.সি.এস.। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের এক এক জন সদস্য একজন চেয়ারম্যানের অধীনে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি চেয়ারম্যান।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে ভারত গভর্নমেণ্টের 'প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' চালু হওয়াতে দামোদর পরিকল্পনাও ওই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে দামোদর পরিকল্পনার প্রস্তাব জন্ম নিয়েছিল, তখন আন্দাজ করা হয়েছিল ১০ বৎসরেই সমস্ত পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ সাধিত হবে। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ অবধি কাজ বিশেষ অগ্রসর না হওয়াতে পরিকল্পনাটির জন্য একটি 'প্রথম পর্যায়' নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন প্ল্যানিং কমিশন। কথা ছিল, 'প্রথম পর্যায়ে'র

(First Phase) কাজ ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালের মধ্যে শেষ করা হবে। এই পরিচ্ছেদের শেষের দিকে একটি নির্ঘণ্টে কাজের পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের 'দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা'য় নিম্নলিখিত প্রস্তাব করা হয়।

দামোদর উপত্যকার নিম্নাঞ্চলে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সমতল, সুতরাং এখানে নদীগুলিতে বাঁধ দেওয়ার উপযোগী স্থান নেই। ১০টি বাঁধই তাই ছোটনাগপুর উপত্যকার উচ্চভূমিতে, বিহারেই সন্নিবিষ্ট হবে। বরাকর নদীতে ৩টি, দামোদর নদে ৩টি, বোকারোতে ১টি এবং কোনার নদীতে ৩টি বাঁধ দেওয়া মনস্থ হয়। (পরে ঠিক হয়েছে বাঁধের আকৃতি বর্ধিত করে সব সুদ্ধ ৮টি বাঁধ দিলেই হবে ; সুতরাং কোনারে ১টি বাঁধ দেওয়া হবে)।

বরাকরের উপর তিলায়া বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে, কিন্তু এখান থেকে জলের সেচের জন্য ব্যবহার করবার খালগুলি এখনও কাটা হয় নি। হাজারিবাগ জেলার বাড়ির কাছে এই বাঁধ, অভ্রের খনির জন্য প্রসিদ্ধ কোডার্মা থেকে ১২ মাইল দক্ষিণে, বরাকর নদের উৎসের কাছে।

বলপাহাড়ি বাঁধ বরাকর নদের দ্বিতীয় বাঁধ। এই বাঁধের অবস্থিতি-স্থান নদের দৈর্ঘ্যের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে নির্দিষ্ট হয়েছে, গিরিডি থেকে ১০ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে। এর কাজ এখনও আরম্ভ হয় নি।

বরাকরের তৃতীয় বাঁধ মাইথনে নির্মিত হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের সীমানার কাছেই। প্রধানতঃ এই বাঁধেই বরাকরের বন্যার জল নিরুদ্ধ করা হবে। ধানবাদ থেকে ২৪ মাইল পূর্বে এই বাঁধ।

দামোদরের উপর পাঞ্চেৎ পাহাড়ের বাঁধটি প্রধানভাবে দামোদরের বন্যা নিরুদ্ধ করবে। এটিও পশ্চিমবঙ্গের কাছে, আর এর কাজও আরম্ভ করা হয়েছে।

দামোদরের উপর আর ২টি বাঁধ যথাক্রমে আইয়ার ও বেরমোর বাঁধ। আইয়ার বাঁধের স্থান রামগড় থেকে ২০ মাইল উত্তর-পূর্বে। বেরমোর বাঁধ ধানবাদ থেকে ২৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

কোনার নদীতে ১নং, ২নং ও ৩নং নামে তিনটি বাঁধের প্রথমে পরিকল্পনা ছিল। এখন একটি বাঁধ বাঁধারই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে এবং সেটি নির্মিত করা হয়েছে।

বোকারোর বাঁধটিই সর্বপ্রথমে তৈরী হয়েছে। এই বাঁধের জল দিয়ে বোকারোতে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের যন্ত্র ঠাণ্ডা করা হচ্ছে। বোকারোতে ২ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তির তাপবিদ্যুৎযন্ত্র স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে, পরিকল্পনা রূপায়িত করবার সর্বপ্রথমে। কিন্তু ব্যবহারে লাগাবার তারের লাইন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি বসানো যায় নি বলে মাত্র ২৮ হাজার কিলোওয়াট এ যাবৎ ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে।

তা ছাড়া দামোদর নদে, বর্ধমানের নিকটে দুর্গাপুরে ব্যারেজ নির্মিত হচ্ছে। দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে নাব্যখাল ও সেচের খাল কাটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। ৯০ মাইল লম্বা নাব্যখালটি কলিকাতা থেকে ৩০ মাইল উত্তরে হুগলীতে এসে মিশবে। এতে ২৪টি লকগেট (Lock-gate) থাকবে, নৌকাগুলিকে সর্বসমেত প্রায় ১০০ ফুট উর্ধ্বে উঠতে সাহায্য করবে। ১৫৫৩ মাইল লম্বা সেচের খালগুলির মারফত

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১০ লক্ষ একর ভূমিতে বর্ষাকালীন সেচ-ব্যবস্থা ও ৩ লক্ষ একর জমিতে সংবৎসরব্যাপী সেচের ব্যবস্থা হবে বলে সম্প্রতি প্রচার করা হয়েছে।

নিম্নের নির্ঘণ্টে প্রথম প্রস্তাবিত বাঁধগুলির মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হল। পূর্বেই বলেছি, কোনারের ৩টি বাঁধের পরিবর্তে একটি বৃহৎ আকারের বাঁধ হবে বলে সাব্যস্ত হয়েছে। অন্যান্য বাঁধগুলির আকার, ডিজাইন প্রভৃতি প্রয়োজন মত পরিবর্তন করা হচ্ছে এবং হবে।

বাঁধের নাম	বাঁধের মাথায় দৈর্ঘ্য	নদীগর্ভ থেকে বাঁধের উচ্চতা	বিবরণ
পাঞ্চেৎ পাহাড়	৮,৯০০ ফুট	১৩০ ফুট	ভিতরে কংক্রীট ও দু পাশে বালি ও নুড়ির দেয়াল, ভূনিম্নের প্রস্তরের ভিত্তির উপর
আইয়ার	৪ মাইল	২৫০ ফুট	ভিতরে এঁটেল মাটি ও দু পাশে পাথরের দেয়াল
কোনার নং ১	৮,০০০ ফুট	১২৫ ফুট	ঐ
কোনার নং ২	...	...	পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয় নি
কোনার নং ৩	...	...	ঐ
বোকারো	৩,২০০ ফুট	১৬০ ফুট	ভিতরে এঁটেল মাটি ও দু পাশে পাথরের দেয়াল
বেরমো	...	...	পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয় নি।
বলপাহাড়ি	৯,৮০০ ফুট	১১৫ ফুট	ভিতরে এঁটেল মাটি ও দু পাশে পাথর
তিলায়া	১,০০০ ফুট	১০০ ফুট	ভিতরে এঁটেল মাটি ও দু পাশে বালি ও নুড়ি
মাইথন	৩,২০০ ফুট	১৬০ ফুট	ভিতরে কংক্রীট ও দু পাশে বালি ও নুড়ির দেয়াল, ভূনিম্নের প্রস্তর ভিত্তির উপর

নিম্নের নির্ঘণ্টে চুম্বকাকারে পরিকল্পনার পরিচয় দেওয়া হল :

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের প্রস্তাব [১০ বৎসরে সম্পূর্ণ করা হবে]

নদীর দৈর্ঘ্য ......৩৭০ মাইল

উপত্যকার আয়তন.........৯,০০০ বর্গমাইল

বাঁধগুলির উপরে অববাহিকার পরিমাণ.........৬,৫০০ বর্গমাইল (সাম্প্রতিক মাপজোখে সংশোধন করে দেখা হয়েছে, ৪ কোটি ৪০ লক্ষ একর)

বাঁধগুলির নিচে অববাহিকার পরিমাণ (পশ্চিমবঙ্গের নিম্নভূমি) ১,৫৪০ বর্গমাইল (এই এলাকায় অনিয়ন্ত্রিত প্রবাহ ২ লক্ষ ৫০ হাজার কিউসেক হতে পারে)

রণ্ডিয়ায় মাপা সর্বোচ্চ
প্রবাহের পরিমাণ.........৬,৫০,০০০ কিউসেক
সংবৎসরব্যাপী সেচ-ব্যবস্থায়
ভূমির পরিমাণ.........৭,৫০,০০০ একর
বাঁধের আড়ালে জলনিমজ্জিত
ভূমির পরিমাণ.........১,১৪,০০০ একর
বাঁধের আড়ালে মোট জলের
পরিমাণ.........৪,৫০০,০০০ একর-ফুট
১০টি বাঁধের জলবিদ্যুৎ
উৎপাদন ক্ষমতা.........২,২৬,০০০ কিলোওয়াট।
বোকারোর তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা.........১,৫০,০০০ কিলোওয়াট।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত লক্ষ্য

৮টি বাঁধে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা.........২,২৪,০০০ কিলোওয়াট
বোকারোর তাপবিদ্যুৎ ক্ষমতা.........২,০০,০০০ কিলোওয়াট
বাঁধের আড়ালে মোট জলের পরিমাণ.........৪,৭০০,০০০ একর-ফুট
৬০% চাপের চাহিদায় মোট বিদ্যুৎক্ষমতা......৩,০০,০০০ কিলোওয়াট
(সরকারী প্রচার-বিভাগ জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ আর আলাদা করে দেখাতে চাইছেন না, সুস্পষ্ট কারণেই)
বিদ্যুৎ পরিচালনের লাইন......১৩২ K.V.-তে ৪৭০ মাইল প্রধান লাইন এবং ৬৬ K. V. ও ৩৩ K. V.-তে প্রয়োজনীয় শাখা লাইন
দুর্গাপুরের ব্যারেজ ও ৬০ফুট প্রশস্ত ৯০ মাইল দীর্ঘ নাব্য সেচ-খাল কলিকাতার ৩০ মাইল উত্তরে হুগলীতে সংযোগ। ১৫৫৩ মাইল দীর্ঘ সেচ-খালের শাখা-প্রশাখা।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য (১৯৫৬-এর জুন মাসের মধ্যে সমাপ্য : প্রথম পর্যায়ে (First Phase)

মাত্র ৪টি বাঁধ (তিলায়া, কোনার, মাইথন, পাঞ্চেৎ পাহাড়) নির্মাণ। তাদের আড়ালে মোট জলের পরিমাণ...২,৮৯০,০০০ একর-ফুট। ৬½ লক্ষ কিউসেকের বন্যা কমিয়ে ২½ লক্ষ কিউসেকের বন্যা প্রবাহিত করা। এ বন্যা নিম্নাঞ্চলের নদীর খাতে উপচে উঠবে না, দক্ষিণ পাড়ে। অথবা বাম পাড়ের বাঁধ ভাঙবে না।

দুর্গাপুরের ব্যারেজ ও সেচ-খালগুলি ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালের মধ্যেই শেষ করতে হবে। (১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের সংবাদ—এই প্রথম পর্যায়ের কাজগুলি সমস্ত শেষ হয়েছে। কিন্তু ফলে ভয়াবহ প্লাবন হয়েছে !!)

'প্রথম পর্যায়ে' উপকারিতা

সেচ-ব্যবস্থা......১০ লক্ষ একর। (সম্প্রতি বলা হয়েছে, মাত্র ৩ লক্ষ একরে সংবৎসরব্যাপী সেচ-ব্যবস্থা হবে)

জলবিদ্যুৎ···১ লক্ষ ৪৬ হাজার কিলোওয়াট (কিন্তু যন্ত্রপাতির অভাবে অভাবে এ-পর্যন্ত মাত্র ৮০০০ K.W. শুধু তিলায়াতে স্থাপিত করা গিয়েছে)
তাপবিদ্যুৎ···১ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোওয়াট (মাত্র ২৮ হাজার কিলোওয়াট ব্যবহার করা যাচ্ছে, যন্ত্রপাতির অভাবে)

খরচের প্রথম আন্দাজ······৫৫ কোটি টাকা।
এ পর্যন্ত সংশোধিত আন্দাজ······প্রায় ১০০ কোটি টাকা।
ইতিমধ্যে পার্বত্য এলাকায় অরণ্য সৃষ্টির প্রস্তাবও পরিকল্পনায় গৃহীত হয়েছে প্রায় ২০ কোটি টাকা খরচের আন্দাজে।

দামোদর পরিকল্পনার সংস্কার চাই

উপরে পরিকল্পনার সরকারী প্রস্তাবগুলির পরিচয় দেওয়া হল। কিন্তু এই দামোদর পরিকল্পনায় বহু সমালোচনা হয়েছে এবং আমরাও অংশ গ্রহণ করেছি। সমালেচনার ফলে সামান্য ভালো ফল পাওয়া গিয়েছে, সুষ্ঠু সংশোধনে—বিশেষ করে বাঁধ প্রভৃতির ডিজাইনে। কিন্তু তাড়াহুড়া করে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবেই এই পরিকল্পনা কার্যকরী করবার চেষ্টা হওয়াতে কতকগুলি মারাত্মক ত্রুটি থেকেই যাচ্ছে। এই পরিকল্পনার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হতে পারতো জলবিদ্যুৎ উৎপাদন। আমরা দেখে মর্মাহত হচ্ছি কার্যতঃ সেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ পরিত্যক্তই হচ্ছে নানা ওজুহাতে। আমরা সমালোচনা করেছিলাম, বিদ্যুৎ ব্যবহারে লাগাবার সুব্যবস্থা হয় নি, এখন নানা ওজুহাতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ স্থগিত রাখা হচ্ছে। অবশ্য, এ অবস্থা আমাদের কাছে মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। কারণ যে বিদেশী-স্বার্থ প্রথম থেকেই পরিকল্পনায় মাথা ঢোকাবার সুযোগ পেয়েছে, সে স্বার্থ যে আমাদের দেশে সুলভ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা বানচাল করে দেবে, সেটা আমরা প্রথম থেকেই জানি।

নদীর খাত মজে যাওয়ার ফলে নিম্নাঞ্চলে বন্যা বন্ধ হবে না। নিম্নাঞ্চলের বহু অংশ চিরস্থায়ী জলায় পরিণত হবে। সুষ্ঠু জলনিকাশী পরিকল্পনার অভাবে আরামবাগ মহকুমা, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলায় বিষম প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। মূল দামোদরের খাত, রূপনারায়ণের খাত ও অন্যান্য মজা কানা নদীকে পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করা হয় নি। অথবা সেচের খাল খনন করে সেচের কাজে জল অপব্যবহার করার চেষ্টা হচ্ছে। এই সেচের খালের জলে বন্যার পলি থাকবে না। সুতরাং জমির উর্বরতা বৃদ্ধির কার্যকারিতাও থাকবে না। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও নাব্যতার ব্যবস্থার সঙ্গে খালের সাহায্যে সেচ-ব্যবস্থা সুষ্ঠু ভাবে হতেই পারে না। সেচের খালের ব্যবস্থার জন্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত পরিত্যাগ করা ছাড়া উপায় থাকবে না। অথচ নিম্নাঞ্চলে পর্যাপ্ত ও সুসময়োচিত বৃষ্টির অভাব হয় না। পাম্প, জলাশয় প্রভৃতির সাহায্যে বিকল্প সেচ-ব্যবস্থায় ২।৩টি ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা সহজেই হতে পারতো। কৃত্রিম সারের ব্যবহারে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির ব্যবস্থাও করা যেত। জলবিদ্যুৎ সুলভে সরবরাহ করতে পারলে শিল্প-বাণিজ্যে এ অঞ্চলের সম্পদ বৃদ্ধি হতে পারতো। তা না হয়ে বর্তমান দামোদর পরিকল্পনার মারফত দেশকে আধা ঔপনিবেশিক কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে বেঁধে রাখা হচ্ছে।

নিম্নাঞ্চলে সেচের খালের বাঁধগুলি ও মজা নদীগুলি মিলে মহামারীরূপে ম্যালেরিয়া সৃষ্টি করবার সম্ভবনাও প্রচুর। এর প্রতিকারের দায়িত্ব দামোদর পরিকল্পকদের।

দামোদরের বন্যা নিরুদ্ধ হলে কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা ধ্বংস হবে, অতি অল্প সময়ে। এর প্রতিকারের ব্যবস্থার দায়িত্বও দামোদর পরিকল্পকদের। আশু ব্যবস্থা না হলে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে মধ্যে কলিকাতা বন্দরের ধ্বংস অনিবার্য। এই পরিকল্পনার ফলে হুগলী নদীর জলনিকাশ ক্ষমতা দ্রুত নষ্ট হবে, ভাগীরথী, হুগলী ও তাদের উপনদীতে প্রতি বছরের বর্ষায় সর্বনাশা প্লাবনের ধ্বংসলীলা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। পশ্চিমবঙ্গের বহুলাংশ জলাভূমিতে পরিণত হয়ে থাকবে প্রতি বছর বর্ষার পরে কয়েক মাস ধরে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ফরাক্কায় গঙ্গা-ব্যারেজ পরিকল্পনা

ফরাক্কায় গংগা-ব্যারেজের লক্ষ্য

ফরাক্কায় গঙ্গা-ব্যারেজ বেঁধে আর তার উপর থেকে একটি খাল কেটে ভাগীরথীতে গঙ্গাজল অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে ভাগীরথীর নাব্যতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার প্রস্তাব তুলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টের ইঞ্জিনিয়ারেরা। তাঁরা আরও বলেন, ২০ হাজার কিউসেক গঙ্গাজল এইভাবে ভাগীরথীতে অনুপ্রবিষ্ট করাতে পারলে, সেই জলের প্রবাহের ফলে কলিকাতা বন্দরের নিম্নে হুগলী নদীর নাব্যপ্রণালীও রক্ষা পাবে। এমন কি, ডি.ভি.সি'র বাঁধের দরুন কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা নষ্ট হয়ে যাবার যে ভয়ের কথা আমরা তুলেছি, তারও প্রতিকার হবে। তা ছাড়া, এই ২০ হাজার কিউসেক অনুপ্রবিষ্ট জলের উপরে বর্ষাকালে মূল ভাগীরথীর উৎস দিয়ে যে গঙ্গার বন্যার জল আসবে, সেই জলে কুলটিগাঙ, বিদ্যাধরী প্রভৃতি মজে-আসা নদীগুলির মুখ ধুইয়ে তাদের পুনরুদ্ধার সাধিত হবে। গঙ্গার বন্যা নদীয়া জেলাতেও ধৌতিকরণ কাজ করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও জনস্বাস্থ্যোন্নতি সাধন করতে পারবে।

ব্যারেজ, বাঁধ প্রভৃতি কি?

গঙ্গা-ব্যারেজের কার্যকারিতা বোঝবার আগে ব্যারেজ, বাঁধ প্রভৃতি নামগুলি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হওয়া দরকার। ইংরেজিতে ব্যারেজ, এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট, ড্যাম, এনিকাট, হ্বের প্রভৃতি শব্দগুলি চলিত বাংলায় আমরা শুধু 'বাঁধ' বলেই উল্লেখ করে থাকি। জলের প্রবাহকে আবদ্ধ করে বলে এগুলি সব 'বাঁধই' বটে। কিন্তু নদীর খাতের সঙ্গে সমান্তরাল বাঁধ নদীর বন্যার জল অথবা জোয়ারের জল উপচিয়ে নদীতটের পাশের জমিকে প্লাবিত হওয়া থেকে বাঁচায়, ইংরেজীতে তাদের 'এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট' বলে। নদীর পাড়ের উপরে (bank-এ) সমান্তরাল রেখায় সচরাচর মাটি দিয়ে এগুলি তৈরী হয়। সুন্দরবন অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত নিচু এই রকম বাঁধকে 'ভেড়ি' বলে। আর যে সুউচ্চ বাঁধ নদীগর্ভে এবং কিছুদূর পর্যন্ত নদীর উভয় তটের নিম্নভূমি পর্যন্ত নদীর প্রবাহপথের গতিরোধ করে আড়াআড়ি-ভাবে বেঁধে তোলা হয়, সেইগুলি হল 'ড্যাম'। আমরা এদেরই বাঁধ বলে উল্লেখ করছি। এই বাঁধও শুধু মাটি দিয়ে, অথবা মাটি, বালি, নুড়ি প্রভৃতি দিয়ে, অথবা পাথরের গাঁথনি দিয়ে, কংক্রীট দিয়ে, কিংবা রি-ইন্‌ফোর্সড কংক্রীট দিয়ে তৈরী করা হয়। এরা অনেক সময়ে আয়তনে বহু উচ্চ হয়। আর এদের আড়ালে একটা বড় এলাকা জলমগ্ন হয়ে কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হয়। 'ব্যারেজ'গুলি খর্বকায় ড্যাম, তাদের ভিতর দিয়ে জলপ্রবাহের বহু ছিদ্র (sluice) থাকে। ব্যারেজগুলি সচরাচর মাটি দিয়ে তৈরী হয় না, ইমারতের মসলা দিয়েই গাঁথা হয়। তারা অনেক নিচু আর তাদের সীমানা নদীগর্ভে আড়াআড়িভাবে দুই পাড় অবধিই সচরাচর নির্দিষ্ট থাকে। ব্যারেজ যে জল আটকায় সে জল, নদীর পাড় উপচিয়ে দু পাশের জমি জলমগ্ন করে না—বর্ষার বন্যার সময় ছাড়া। উড়িষ্যা, অন্ধ্র ও মাদ্রাজ প্রদেশে

ব্যারেজকেই 'এনিকাট' (anicut) বলে। দামোদর এলাকায় এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্টে এবং খালে স্লুইসদ্বারের ব্যবস্থাগুলিকে এনিকাট বলে উল্লেখ করতে শুনেছি। নদীতে অথবা সেচের কাজের জন্যে খালে যে নিচু ব্যারেজ গাঁথা হয়, জলের প্রবাহ মাপবার জন্যে এবং জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত মাপে সরবরাহ করবার জন্যে, সেই নিচু ব্যারেজ-গুলির ইঞ্জিনিয়ারিং নাম 'হ্বের' (weir)।

উইল্‌কক্‌সের 'নদীয়া ব্যারেজ'

পদ্মায় মাথাভাঙা নদীর উৎসের নিচে গঙ্গা-ব্যারেজ বাঁধবার সুপারিশ দিয়েছিলেন ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ সেচ-ইঞ্জিনিয়ার উইল্‌কক্‌স। তাঁর মতে, এই ব্যারেজ গাঁথলে, ভাগীরথী, ভৈরব, মাথাভাঙা প্রভৃতি নদীয়া জেলার নদীগুলিতে গঙ্গাজল প্রবাহিত হতে থাকবে। নদীয়া জেলার উপকারার্থে, নদীয়া সীমান্তে এই ব্যারেজের অবস্থিতি স্থান নির্দিষ্ট হওয়ায়, তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'নদীয়া ব্যারেজ'। মিশরের নীল নদে আস্যুয়ান ড্যাম, 'নাইল ব্যারেজ' (Nile Barrage) পরিকল্পনা ও গঠনের কাজ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যে এঁর প্রচুর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে তখনকার অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা তাঁর নদীয়া ব্যারেজ পরিকল্পনার প্রতিকূলতা করেন।

ফরাক্কা ব্যারেজ পরিকল্পনার জন্মবৃত্তান্ত

যাঁরা প্রতিকূলতা করেছিলেন, তাঁদেরই অন্যতম ইঞ্জিনিয়ার, শ্রী এস. সি. মজুমদার আজ কিন্তু ফরাক্কায় গঙ্গা-ব্যারেজ প্রস্তাবের একজন প্রধান পরিপোষক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কন্‌সালটিং ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে।

বাংলা দেশ ভাগ হয়ে তার প্রধান অংশ পূর্ব-পাকিস্তান দেশ হয়ে যাওয়ায়, পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, দার্জিলিং প্রভৃতির সঙ্গে সারাপুল (হার্ডিঞ্জ ব্রিজ) দিয়ে যে রেলপথের যোগাযোগ ছিল, রাজধানী কলিকাতা থেকে তার সুযোগ আজ আর আমরা পাই না। পাকিস্তানের গভর্নমেণ্টের সঙ্গে ভারত গভর্নমেণ্টের মনোমালিন্য দূর না হওয়া পর্যন্ত উভয় রাষ্ট্রের জনসাধারণেরই নানা অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। কলিকাতা থেকে আসামের যোগাযোগও কষ্টসাধ্য হয়ে গিয়েছে সাধারণ মানুষের পক্ষে। বিহার প্রদেশের সাহেবগঞ্জ-মণিহারীঘাটে স্টীমারে গঙ্গা পারাপার হয়ে যাতায়াত করতে হয় কলিকাতা থেকে উত্তরবঙ্গে ও আসামে। তাতে অনেক সময় নষ্ট হয়। তাই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই গঙ্গার একটি সেতু নির্মাণের প্রস্তাব তোলেন পশ্চিমবঙ্গের গভর্নমেণ্ট। কিন্তু বিহারে, পাটনায় কিংবা মোকামায় গঙ্গা-সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে বহুদিন ধরে। বিহারের দাবিই অগ্রগণ্যতা পেয়েছে ভারত গভর্নমেণ্টের কাছে। তা ছাড়া, বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন, ন্যায্য খরচে, পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা-সেতু নির্মাণের অবস্থিতি স্থান নেই। তার পরেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রস্তাব উঠেছে, এখানে গঙ্গায় 'ব্যারেজ' বাঁধা হোক, তার উপর দিয়ে রেলপথ ও রাজপথের সেতুও উপরি হিসাবে তৈরি করে নেওয়া যাবে, খুবই কম খরচে, ব্যারেজের আদত কার্য সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারেরা বিবেচনা করে স্থির করেছেন, রাজমহল এবং ফরাক্কা এই দুই অবস্থিতি স্থানের

মধ্যে ব্যারেজ নির্মাণের ব্যয় ফরাক্কাতে অনেক কম পড়বে। কাজেই ফরাক্কা গঙ্গা-ব্যারেজ নির্মাণের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচিত হয়েছে এদের কাছে।

ফরাক্কায় ব্যারেজ পরিকল্পনা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত করানোর বহু চেষ্টা হওয়া সত্ত্বেও তা হয় নি। নানাপ্রকার আন্দোলন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ফরাক্কা ব্যারেজের অনুকূলে জনমত সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছেন। কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে ফরাক্কা ব্যারেজ পরিকল্পনার জন্য তথ্য সংগ্রহের ভার নিয়েছেন নিজেদের হাতে এবং একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টের সেচ-ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগিতায়। অনেক বিশেষজ্ঞ কিন্তু আমাদের মতই, ফরাক্কায় গঙ্গা-ব্যারেজ নির্মাণের সপক্ষে মত দিতে পারেন নি।

ফরাক্কায় গংগা-ব্যারেজের অবয়ব

ফরাক্কা রাজমহল থেকে ১৮ মাইল দক্ষিণে গঙ্গার উপরে একটি গ্রাম—এই ব্যারেজ পরিকল্পনার আন্দোলনের ফলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। রাজমহল থেকে ফরাক্কা অবধি গঙ্গা বেশ সরলরেখায় প্রবাহিত এবং তার খাত অনেকটা সমান-ভাবে প্রশস্ত এবং প্রশস্ততাও বেশ কম।

ফরাক্কার যেখানে গঙ্গায় আড়াআড়িভাবে ব্যারেজ বাঁধবার প্রস্তাব উঠেছে সেখানে গঙ্গাগর্ভের পৃষ্ঠ (bed level) সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৫।২৬ ফুট উঁচু। শুকনার দিনে এখানে গঙ্গাজলের সর্বনিম্ন জলপৃষ্ঠ (lowest water level) ৪৭·৭ ফুট পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ শুকনার দিনে ফরাক্কায় কমপক্ষে ২১ ফুট গভীর জল থাকে গঙ্গায়। আর বন্যার সময়ে গঙ্গার জলপৃষ্ঠ ৮৩·২ ফুট পাওয়া গিয়েছে। এইখান থেকে জঙ্গীপুরের কাছে ভাগীরথীতে একটি খাল সংযুক্ত করা হবে। সেই জঙ্গীপুরের কাছে ভাগীরথীতে জলপৃষ্ঠ ৫৮·৪ ফুট রাখা সমীচীন। এইসব বিষয় বিবেচনা করে ইঞ্জিনিয়ারেরা ঠিক করেছেন, ব্যারেজের পিছনে রক্ষিত গঙ্গার জলপৃষ্ঠ ৭২ ফুট করা দরকার। (অর্থাৎ জলের গভীরতা হবে ৭২ − ২৬ = ৪৬ ফুট)।

ব্যারেজের নিম্নাংশ ভরাট গাঁথনির হবে, অর্থাৎ কোনও ছিদ্র থাকবে না, আর এই অংশের উচ্চতা হবে গঙ্গাগর্ভ থেকে ২৬ ফুট। এই ভরাট গাঁথনির উপর জলপ্রবাহের ছিদ্র ও কপাটগুলি (sluice gates) থাকবে (১১৫টি, প্রতিটি ৬০ ফুট প্রশস্ত)। তাদের উচ্চতা হবে ২১ ফুট।

জলপ্রবাহ ব্যারেজের প্রতিবন্ধকতা পেলে ফুলে ওঠে এবং তার জলপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। একেই afflux বলা হয়। বন্যার সময়ে এই ফুলে ওঠাও বৃদ্ধি পাবে, তাই ব্যারেজের দু ধারে বহুদূর পর্যন্ত মাটির বাঁধ দেওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। গঙ্গার দক্ষিণ কূলের ভূমি, রাজমহল পার্বত্য এলাকার সানুদেশ, দ্রুত উঁচু হয়ে উঠেছে। কাজেই মাত্র ৫·৩ মাইল লম্বা বাঁধ দিলেই চলবে। কিন্তু বামতীরে মালদহ পর্যন্ত ২০·৬ মাইল লম্বা বাঁধ দিতে হবে, কারণ ওই অঞ্চল নিম্নভূমি, প্লাবিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা। দুই পাশের এই বাঁধের উপর দিয়ে এবং ব্যারেজের উপর দিয়ে রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা হচ্ছে।

ব্যারেজের উপর দিক থেকে ভাগীরথীর তীরবর্তী জঙ্গীপুর পর্যন্ত ২৬½ মাইল লম্বা একটি খাল কেটে গঙ্গা-ভাগীরথী সংযুক্ত করা হবে। এই খালে জলপৃষ্ঠ ২৫০ ফুট প্রশস্ত হবে এবং জলের গভীরতা কমপক্ষে ৯ ফুট থাকবে।

জঙ্গীপুরের উপর দিকে ভাগীরথীতেও একটি ব্যারেজ বাঁধতে হবে, নতুবা খালের জল ভাগীরথীতে প্রবেশ করে আবার ভাগীরথীর খাতে উত্তরপ্রবাহে গঙ্গার দিকে চলে যেতে পারে।

গঙ্গা-ব্যারেজ আমরা কেন সমর্থন করি না

অনেক অল্পব্যয়ে কতকগুলি বিকল্প উপায়ে এর সকল 'উপকারিতা'ই মেটানো যায় বলেই আমরা মনে করি। ফরাক্কা ব্যারেজের আংশিক মূল্য ধরা হচ্ছে ৪০ কোটি টাকা, এত টাকা অপব্যয় করবার কোনই প্রয়োজন দেখছি না আমরা।

এই ডিজাইনে রাজমহলের কাছে গঙ্গার সর্বোচ্চ বন্যা ২৭ লক্ষ কিউসেক ধরা হয়েছে, এ সংখ্যা অত্যন্ত সন্দেহজনক। পাটনা ও মোকামা প্রভৃতি স্থানের কাছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে গঙ্গার বন্যার যে সব পরিমাণ রাখা হয়েছে, তাতে দেখা যায় পাটনা-ফতোয়ার মাঝেই গঙ্গার সর্বোচ্চ বন্যা প্রায় ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার কিউসেক জল প্রবাহিত করে। বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন রাজমহলের অব্যবহিত নিচে গঙ্গার বন্যায় অন্ততঃ ৩৫ লক্ষ কিউসেক জল প্রবাহিত হয়—ডিজাইনের হিসাবে এইরূপ ধরা উচিত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমার ধারণা, এ বছরে কুশী নদীতে যেরূপ বন্যা নেমেছে, সেরূপ বন্যার সহযোগিতায় রাজমহলের নিচে গঙ্গায় আরও অধিক পরিমাণে জলপ্রবাহ নামে। ব্যারেজ ডিজাইনে মাত্র ২৭ লক্ষ কিউসেক ধরা হয়েছে, ব্যারেজের এবং দু পাশের বাঁধের জন্য ব্যয় কম দেখাবার জন্যে। বাস্তবক্ষেত্রে বন্যার ফলে বাঁধ ধ্বংস হবে। বামকূলের বাঁধ ঘুরে গঙ্গা মণিহারী, কাটিহার, মালদহ প্রভৃতি ধ্বংস করে দিতে পারে। বছরে বছরে বিহারে গঙ্গার বন্যার সর্বোচ্চ উচ্চতা বেড়েই চলেছে ; নানা বৈজ্ঞানিক কারণে, ফরাক্কা ব্যারেজের ফলে পাটনা শহর অবধি গঙ্গার বন্যায় বিপন্ন হতে পারে। ৭০।৮০ বছর আগে পাটনায় গঙ্গার বন্যার উপদ্রবের কথা অনেকে জানেন। এখনও প্রতি বছরই গঙ্গার বন্যার ভয় পাটনা শহরে উপস্থিত হয়। মোকামায় নতুন পুল নির্মিত হচ্ছে, তার জন্যেও গঙ্গার জলপ্রবাহ একটু ব্যাহত হবেই, বন্যার সময়ে জল ফুলে উঠবেই, তার উপরে ফরাক্কায় যদি ৩৫ লক্ষ কিউসেক প্রবাহের জন্যে ব্যারেজ ডিজাইন করা হয়, তা হলে বিহারে গঙ্গার কূলে অনেক জনপদই বিপন্ন হবে।

খাল দিয়ে নিয়মিত যে ২০ হাজার কিউসেক জল ভাগীরথীতে অনুপ্রবিষ্ট করানো হবে, জোয়ারের জলের সঙ্গে সেই প্রবাহ প্রতিহত হয়ে নৈহাটি-কাঁচড়াপাড়া অঞ্চলে হুগলী নদীর গর্ভে পলি পতিত হয়ে চর সৃষ্টি হতে বাধা কোথায় ? ক্রমে এই জোয়ারের প্রতিক্রিয়ায় খাল পর্যন্ত মজে যাবে, যেমন একদিন ভাগীরথীর উৎস মজে গিয়েছে। ভাগীরথীর উৎস মজতে তবু দীর্ঘ সময় লেগেছে, কারণ গঙ্গার বন্যার প্রবাহও খানিকটা ওই পথে নামতো। কিন্তু মাত্র ২৫০ ফুট প্রশস্ত খালে নিয়ন্ত্রিত জলপ্রবাহে জোয়ারের আনা পলি পাতিত হয়ে চর সৃষ্টি করতে দশ বছরই

যথেষ্ট। ভাগীরথীর উৎস মজে আসার মূল কারণ এই জোয়ার, কাজেই শুধু খাল কেটে ভাগীরথীকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা ভ্রমাত্মক ব্যবস্থা।

ভাগীরথীর প্রশস্ত খাতে দীর্ঘ সর্পিলপথে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা থেকে খাল মারফত অনুপ্রবিষ্ট ২০ হাজার কিউসেক জল হুগলীর নিম্নাংশে যে ভরবেগ যোগ করবে, জোয়ার-ভাটার তুলনায় তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কাজেই ডি. ভি. সি'র বন্যা নিরোধের ফলে এখানে যে ভরবেগের অভাব হবে, এ পন্থায় ভাগীরথীপ্রবাহ কিছুতেই তার স্থান পূরণ করতে পারে না। সুতরাং কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষায় যে গঙ্গা-ব্যারেজ পরিকল্পনা সহায়তা করবে বলে ধুয়া তোলা হয়েছে, সেটা একেবারে বাজে ধুয়া। প্রথম যখন ফরাক্কা ব্যারেজ পরিকল্পনার কথা ওঠে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে, তখন এ ধুয়া তোলা হয় নি। আমি যখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখালাম, ডি. ভি. সি'র বন্যা-নিরোধী বাঁধের ফলে কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা অনতিবিলম্বে ধ্বংস হবে; তার পরেই, বিশেষতঃ ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের 'হুগলী অনুসন্ধান কমিটি'র তথাকথিত অনুসন্ধানের পরে এই ধুয়া তোলা হয়েছে, জনমত বিভ্রান্ত করার জন্যে।

পরিকল্পকগণ এখন পর্যন্ত নিজেরাই মন স্থির করতে পারেন নি কুলটিগাঙ প্রভৃতি সুন্দরবনের নদী-সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের কাজ কি উপায়ে ভাগীরথীর জল দিয়ে সাধিত করবেন। সুতরাং সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বলার আমরা প্রয়োজন দেখছি না। আমরা শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই, ভাগীরথী, ভৈরব, মাথাভাঙা প্রভৃতি নদীর উৎসে চর পড়বার আগেও সুন্দরবন অঞ্চলের নদী ব-দ্বীপের কর্মঠ অঞ্চলের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই মজে যেত। এদের সমস্যা সমাধানের জন্যে অন্য উপায় খুঁজতে হবে, গঙ্গাজল অনুপ্রবিষ্ট করালেই কাজ হবে না। ভাগীরথীর সঙ্গে গঙ্গার সংযোগ পুনরুদ্ধার করে নাব্যতা ফিরিয়ে আনাও বিকল্প উপায়ে সুলভে করা যায়। তার জন্যে অত্যধিক ব্যয়ে ফরাক্কা ব্যারেজের প্রয়োজন দেখি না।

ফরাক্কায় ব্যারেজ বাঁধলে, ব্রহ্মপুত্রের বন্যা পদ্মার উপর দিকে চাপ দিয়ে পদ্মার খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। উইল্‌কক্‌সের নদীয়া ব্যারেজ পরিকল্পনার প্রতিকূলতা করবার জন্যে শ্রী এস. সি. মজুমদার প্রমুখ ইঞ্জিনিয়ারেরা পদ্মার খাতের বিপদের কথা তুলেছিলেন। কথাটি খুব যুক্তিযুক্ত। সুতরাং পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট সহজে ফরাক্কা ব্যারেজ পরিকল্পনায় সম্মতি দেবেন না। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশমুখ এ কথার ইঙ্গিত ইতিপূর্বেই দিয়েছেন। অথচ ফরাক্কা ব্যারেজ আন্দোলনে অনর্থক দেশের জনসাধারণের অর্থ অপচয় করা হচ্ছে।

উপরে যা বলেছি, তা থেকেই বোঝা যায় যে, অন্ততঃ কুশী নদীর বন্যা নিরোধের কাজ সমাপ্ত না হলে, আর তার ফলে বিহারে গঙ্গার খাতের উপর প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত, ফরাক্কায় গঙ্গা-ব্যারেজ করা কখনই উচিত হবে না। তাড়াহুড়ো করে এই ব্যারেজ নির্মিত হলে তার বিষময় প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে বিহার প্রদেশে।

অন্যদিকে আবার নানা পরিকল্পনার ফলে গঙ্গায় শুকনার সময়ে সর্বনিম্ন জলপৃষ্ঠ বছরে বছরে কমে আসছে। কুশী বাঁধ পরিকল্পনা, রিহান্দ বাঁধ পরিকল্পনা প্রভৃতি

সমাপ্ত হলে, গঙ্গার জলপ্রবাহ আরও কমবে। কাজেই, ফরাক্কা ব্যারেজের ভরাট-গাঁথনি-অংশের বর্তমান পরিকল্পিত উচ্চতা পদ্মার উপরে অধিকতর অনিষ্টকর হবে। সকল দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, শুধু জিদের বশে ফরাক্কা ব্যারেজ আন্দোলন চালালে অত্যন্ত অন্যায় কাজ হবে।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ফরাক্কায় ব্যারেজ বেঁধে ও ভাগীরথীকে গঙ্গার সঙ্গে একটা নতুন খালের সাহায্যে সংযুক্ত করে দিয়েই ভাগীরথীর স্বাভাবিক মজে যাওয়া দীর্ঘকাল ধরে নিবারণ করা যাবে কেন? এ প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। যেসব স্বাভাবিক কারণে ভাগীরথীর উৎস মজে গিয়েছে ও গঙ্গার সঙ্গে তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, সেই সব স্বাভাবিক কারণের কোনও প্রতিকারই ফরাক্কা ব্যারেজ করতে পারবে না। স্থতরাং এ পন্থায় ভাগীরথীর নাব্যতা পুনরুজ্জীবিত করে কিছুদিন পর্যন্তও স্থায়ী করা যায় না।

ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে, অর্থাৎ উত্তরবিহার, উত্তরবঙ্গ ও আসামের হিমালয়-নির্গত নদীগুলি অত্যন্ত দুর্দান্ত। কুশী, মহানন্দা, তিস্তা প্রভৃতি নদী কোন্ বছরের বন্যায় কত জল বহন করে এনে কোন্ খাত দিয়ে নামবে, বলা দুঃসাধ্য। হিমালয়ের এ অংশে কখনও কখনও ২।৪ ঘণ্টার মধ্যে এত অধিক বৃষ্টিপাত হয় যে তা চিন্তারও অতীত। এই সব নদী দিয়ে অকস্মাৎ সেই জল নেমে এসে প্লাবনের বিপর্যয় ঘটায়। স্থতরাং এই সব নদীগুলি সম্যক্ পর্যবেক্ষণ করে তাদের নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত ফরাক্কায় গঙ্গা-ব্যারেজ নির্মাণে বিপুল অর্থব্যয় অত্যন্ত অবিমৃষ্যকারিতার পরিচায়ক হবে।

উত্তরবিহার ও উত্তরবঙ্গের সম্প্রতিকালের প্লাবন (১৯৫৪, জুলাই-আগস্ট) আমার কথা আরও সমর্থন করছে। ফরাক্কায় বাঁধ দিলে গঙ্গায় বন্যার জল-নিষ্কাশনের খাত যে ব্যাহত হবে, সে কথা অতি সাদাসিধা মানুষও বুঝতে পারে। এখনই যে গঙ্গার খাত বন্যার জল-নিষ্কাশনে যথেষ্ট নয়, তাতে প্রতিবন্ধক স্থষ্টি করা যে অন্যায় হবে, সে কথা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। কুশী, গণ্ডক, শোন প্রভৃতির বন্যার জল গঙ্গায় এসে পড়ে তাড়াতাড়ি সমুদ্রাভিমুখে বেরিয়ে যেতে পারে না। স্থতরাং ওই সব নদী, ফরাক্কা ব্যারেজের ফলে, বিহারে সর্বনাশা প্লাবনের স্থষ্টি করবে; পূর্ণিয়া ও মালদহ জেলায় একটা বিপর্যয়ের কারণ প্রতিষ্ঠিত হবে। জল সবচেয়ে দুর্বল রেখা ধরে (line of least resistance) চলতে চায়। মণিহারীর কাছে যে geological fault আছে, তাতেই গঙ্গায় বন্যা প্রবাহিত হতে চাইবে, ফরাক্কা ব্যারেজে গতি একটু ব্যাহত হলেই। বিশেষতঃ গঙ্গার দক্ষিণকূল, এই অঞ্চল, রাজমহলের পার্বত্য এলাকার কঠিন মাটি দিয়ে তৈরী। শক্ত পাড়ের সংঘাতে বন্যার জল অপর পারে ঘুরবেই, জলপ্রবাহের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে। জল প্রায় সম্পূর্ণ অনমনীয় পদার্থ, ব্যারেজে ও দক্ষিণকূলের শক্ত মাটির সংঘাত তার মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ অপর পাড়ে কূল ভাঙতে ব্যবহৃত হবে।

পদ্মা-গঙ্গায় ব্যারেজই যদি করতে হয় একান্ত, তা হলে উইল্ককৃসদের নদীয়া ব্যারেজের অবস্থিতি স্থানই মন্দের ভালো। ভৈরব, মাথাভাঙা, ভাগীরথী প্রভৃতির উৎসের তিনটি 'দুর্বল' মুখ পাবে পদ্মা-গঙ্গার বন্যা সে ব্যারেজে ব্যাহত হলে। ফলে তার ক্ষতিকারিতার সম্ভাবনা অনেক কম।

পাকিস্তানের পদ্মা-মেঘনার মোহানার খাত উন্নয়ন করতে পারলে নদীয়া ব্যারেজ মোটেই বিপজ্জনক হবে না।

নদীয়া ব্যারেজের সাহায্যে জলঙ্গী, চূর্ণীর খাত উন্নয়নের কাজ করানো যেতে পারে। জলঙ্গী, চূর্ণী দিয়ে পদ্মার জল আনতে পারলে হুগলী নদীর জলের লবণাক্ততা হ্রাস হতে পারে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বৃষ্টি, বন্যা, প্লাবন, জলপ্রবাহের পরিমাপ

বৃষ্টি, বন্যা, প্লাবনের পরস্পর সম্বন্ধ

হিমালয়ের গলিত তুষারের জল ছাড়া, আমাদের দেশের নদীতে জল সরবরাহ করে বৃষ্টি। আবার অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে যে নদীতে বন্যা নামে, সে কথা সকলেই জানেন। গলিত তুষারের জলও বন্যা নামাতে পারে, যদি পার্বত্য এলাকায় পাহাড়, টিলার পাথর-মাটি আংশিক ধসে নদীর খাত আবদ্ধ করে ফেলে আর সেই সাময়িক বাঁধের আড়ালে গলিত তুষারের জল জমা হয়। জল জমতে জমতে জলপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়তে থাকে এবং সেই সাময়িক বাঁধে চাপের বৃদ্ধি হতে থাকে। চাপের বৃদ্ধি হতে হতে শেষ পর্যন্ত জলের চাপে বাঁধটি ভেঙে যায় আর বিপুল জলরাশি হুড়মুড় করে নিচে নামে, নিম্নাংশে নদীর দু কূল উপচিয়ে প্লাবনের সৃষ্টি করে। ছোট ছোট স্রোতস্বিনীতেই এরকম ঘটনা হয় প্রায়ই। অপেক্ষাকৃত বড় নদীর বন্যার কারণ অল্প সময়ে অত্যধিক বৃষ্টি, আর সেই বৃষ্টির জলের সঙ্গে বাহিত শিলাখণ্ড (detritus) প্রভৃতি দ্বারা নদীর খাতের অবরোধ। নদীর খাতে জলের সঙ্গে এই শিলাখণ্ড প্রভৃতি না নামলে, শুধু জল নামলে, প্লাবন না হওয়ার সম্ভাবনা সর্বদা থাকতো।

বৃষ্টির হিসাব

বৃষ্টি সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট হিসাবী ধারণা হওয়া দরকার, নদী পরিকল্পনা বুঝতে হলে।

সাধারণতঃ যে কোনদিন ২৪ ঘণ্টায় যা বৃষ্টিপাত হয় বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্রে তাই মেপে যে কোনও স্থানের সেই দিনের বৃষ্টির পরিমাণ বলা হয়। সংবাদপত্রে এমনি নানাস্থানের ২৪ ঘণ্টার বৃষ্টি সরকারী আবহাওয়া বিভাগ থেকে প্রচার করা হয়:

২৩শে জুলাই ১৯৫৪

স্থান	গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টির পরিমাণ
এলাহাবাদ	১.৩ ইঞ্চি।
বেনারস	০.০
বোম্বাই	০.৮
কলিকাতা	ক (১/১০ ইঞ্চির চেয়ে কম)
পাটনা	০.৩
চেরাপুঞ্জী	৫.২

উপরোক্ত অঙ্কগুলির অর্থ এই যে এলাহাবাদে গত ২৪ ঘণ্টায় যা বৃষ্টিপাত হয়েছে, সেই বৃষ্টির জল যদি কিছুই শুকিয়ে না যেত, অথবা নালা প্রভৃতি দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সরে না যেত, কিংবা মাটি শুষে না নিত, তা হলে এলাহাবাদের যে এলাকায় বৃষ্টি-পরিমাপক যন্ত্রটি রয়েছে, সেই এলাকার সর্বত্র ১.৩ ইঞ্চি গভীর জল দাঁড়িয়ে থাকতো। অবশ্য এলাহাবাদের রিপোর্ট দেখে ধরে নেওয়া হয়, সমগ্র

এলাহাবাদ শহরেই এবং সন্নিকটবর্তী এলাকাতে সমান হারেই বৃষ্টিপাত হয়েছে। যদিও আসল ব্যাপারটি সব সময়ে তা নয়। এই জন্য, খুব ঠিক হিসাব পেতে হলে অনেক বেশী বৃষ্টি-পরিমাপক যন্ত্রে ঘন ঘন এলাকায় বৃষ্টির মাপ রাখা উচিত। তাদের গড় থেকে সেই অঞ্চলের বৃষ্টির অনেকটা পরিমাণ জানা যায়। কিন্তু এটা বাস্তবিক 'আন্দাজে'র পর্যায়ের সংখ্যা, এ কথা ভোলা উচিত নয়। প্রতি বিঘা জমিতে যদি একটি করে পরিমাপক যন্ত্র রাখা হত, তা হলেই অনেক সঠিক পরিমাণ পাওয়া সম্ভব হত। সচরাচর যে বৃষ্টি-পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে বৃষ্টি মাপা হয়, তার সঙ্গে শিক্ষিত মানুষের অনেকেই পরিচিত। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার প্রতি সেকেণ্ডে, মিনিট, ঘণ্টা ধরে সমান হারে বৃষ্টি পড়ে না। এলাহাবাদে ঐদিন ওই ১'৩ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়তো মাত্র ২ ঘণ্টায় পড়েছিল, বাকি ২২ ঘণ্টায় কোনও বৃষ্টিপাত হয় নি। এই রকম, কলিকাতায় কখনও কখনও এক ঘণ্টাতেই ২ ইঞ্চি অথবা ৪ ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে, কিংবা হয়তো মাত্র অর্ধ ঘণ্টার মধ্যেই ২ ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে থেমে যায়। বিশেষ ধরনের পরিমাপক যন্ত্রে এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাপা হয়। এই রকম অল্প সময়ে খানিকটা মুষলধারে বৃষ্টি হলেই যে পথঘাট ডুবে যায়, তা সকলেই জানেন।

কলিকাতায় এক ঘণ্টার মধ্যে ৪ ইঞ্চি বৃষ্টি ও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত ইতিপূর্বে হয়েছে।

বৃষ্টিপাতের হারের সঙ্গে নদী-নালার বন্যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আর নদীর বন্যার জলের সঙ্গে অতিরিক্ত পাথর, নুড়ি, বালি, মাটি নেমেই নদীর খাত অবরুদ্ধ করে প্লাবনের সৃষ্টি করে। শুধু জল এলে খাত গভীরতর করে চলে যেত।

দামোদরের উৎসের কাছে সারা বছরে প্রায় ৫২ ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে বলে হিসাবে দেখানো হয়। তার মধ্যে ৪৮ ইঞ্চি বৃষ্টি ৫ মাসে—জুন থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে পড়ে। এই ৪৮ ইঞ্চিরও অধিকাংশ হয়তো শুধু আগস্ট মাসেই পড়ে। কিংবা হয়তো আগস্ট মাসের কোনও একদিন ১২ ইঞ্চি বৃটিপাত হয়ে, বাকি কয়দিন সামান্য বৃষ্টি হল, অথবা আদপে বৃষ্টি হল না, এমনও হয়। তবুও বহু বছর ধরে মাপ রেখে, গড়পড়তা হিসাব বার করে দেখা গিয়েছে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ওই অঞ্চলে প্রায় ৫২ ইঞ্চি।

জুলাই মাসের বর্ষায় অল্প অল্প বৃষ্টি হয়ে পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি সিক্ত হয়ে থাকে আর পরে আগস্ট মাসে কোনদিন অত্যধিক হারে বৃষ্টিপাত শুরু হলে দামোদরের খাত দিয়ে সে জল নেমে বন্যার সৃষ্টি করতে পারে।

মে মাসের গ্রীষ্মের শুকনার পরে মাঠঘাট যখন জলের জন্য খাঁ খাঁ করে তখন যদি জুন মাসের মাঝামাঝি কোনদিন অত্যধিক বৃষ্টিপাতও হয়, তার ফলে দামোদর দিয়ে বেশী জল নামবে না। কারণ, সে বৃষ্টির অধিকাংশ জল গাছপালা ও মাটি পাথর শুষে নেবে, অনেকটা শুকিয়ে পুনরায় বাষ্পে পরিণত হবে।

পূর্ব পরিচ্ছেদগুলিতে নদীর জলপ্রবাহ সম্বন্ধে আমরা কিউসেক (cusec) শব্দটির ব্যবহার করেছি। এক কিউসেকের অর্থ প্রতি সেকেণ্ডে এক ঘনফুট জলের প্রবাহ; প্রতি এক মিনিটে ৬০ ঘনফুট জলের প্রবাহ; এবং এক ঘণ্টায় ৩৬০০ ঘন ফুটের জলের প্রবাহ। দামোদরের বন্যায় সাধারণতঃ ২½ লক্ষ × ৩৬০০ = ৯০০,০০০,০০০ ঘনফুট জল এক ঘণ্টায় নামে।

এই রকম বন্যার অবস্থা ২ দিন (৪৮ ঘণ্টা) হয়তো থাকে। সুতরাং এই ৯০ কোটি ঘনফুট জল প্রতি ঘণ্টায় প্রবাহিত হলে ২ দিনে (৪৮ ঘণ্টায়) ৯০ × ৪৮ = ৪৩২০ কোটি ঘনফুট জল দামোদর থেকে হুগলীতে নামে।

জলটা নেমে আসতে সময় লাগে। অর্থাৎ পূর্বের একদিনে যে বৃষ্টি পড়ে, সম্ভবতঃ দুই দিন ধরে সেই জল নামে। দামোদরের উচ্চ উপত্যকার আয়তন প্রায় ৭,০০০ বর্গ মাইল। এই সমস্ত এলাকায় অবশ্য এক সঙ্গে বৃষ্টিপাত হয় না, মোটামুটি অর্ধেকের কাছাকাছি এলাকায় বৃষ্টিপাত হয়ে থাকা সম্ভব। অঙ্কের সুবিধার জন্যে আমরা ধরে নিচ্ছি ৪,৩২০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে একদিন বৃষ্টি-পাতের ফলে এই বন্যা নেমেছে। অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ একদিনে ১ কোটি ঘনফুট জল।

১ বর্গমাইলকে বর্গফুটে পরিবর্তিত করলে,

৫২৮০ × ৫২৮০ = ২৭৮৭৮৪০০ বর্গফুট, = ২.৭৮ কোটি বর্গফুট

অর্থাৎ, ১ দিনের বৃষ্টিপাতে ২.৭৮ কোটি বর্গফুট জমিতে ১ কোটি ঘনফুট জল পড়েছে।

এই জল যদি ওখানে সর্বত্র দাঁড়িয়ে থাকতো, তা হলে তার উচ্চতা হত $\frac{১}{২.৭৮}$ফুট $= \frac{১}{২.৭৮} \times ১২$ ইঞ্চি $=$ ৪.৩ ইঞ্চি।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, দামোদরে ২$\frac{১}{২}$ লক্ষ কিউসেকের বন্যা ২ দিন ধরে নামতে হলে, তার উচ্চ উপত্যকায় প্রায় অর্ধেক অংশে একদিনে ৪.৩ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হলেই চলে।

বৃষ্টির জলের শতকরা ৯০ ভাগ নদীতে নামে পূর্ণ বর্ষার সময়ে, এই রকম ধরা হয়ে থাকে। সুতরাং আরও একটু বেশী বৃষ্টি অর্থাৎ ৪.৭৫ ইঞ্চি বা ৪$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি বৃষ্টি হওয়া দরকার। (কিন্তু অবিরাম অল্প অল্প বৃষ্টির পরে কোনদিন ২।৪ ঘণ্টায় মুষল-ধারে বৃষ্টিপাত হলে কয়েক ঘণ্টায় মধ্যেই সে জল বন্যার আকারে নেমে আসবে)।

উপরের অঙ্কে সরলভাবে বর্ণিত উদাহরণটি পড়ে এ কথা মনে করা উচিত হবে না, আসল ব্যাপারটি এত সোজা। ৪,৩২০ বর্গমাইল পার্বত্য এলাকায় প্রায় পাঁচ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হলেই যে মাত্র ২$\frac{১}{২}$ লক্ষ কিউসেকের বন্যা দামোদরের নিম্নপ্রবাহে নামবে, তা নয়। কারণ, নিম্নভূমিতেও বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত হয়, তার জলও দামোদরের নিম্নপ্রবাহে থাকে, কয়েকদিন আগে থেকে উচ্চভূমিতে যে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়েছে, তার জলও নিম্নপ্রবাহে পূর্ব থেকে থাকে, আবার এ দিকে সহসা একদিনে (২৪ ঘণ্টায়) প্রায় পাঁচ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়ে গেলে ৬$\frac{১}{২}$ লক্ষ কিউসেকের বন্যাও নিম্ন-দামোদরে নামতে পারে। নদী যদি পূর্ব থেকে পূর্ণপ্রবাহে বইতে থাকে তা হলে ৩।৪ ইঞ্চি বৃষ্টি অল্প সময়ে উচ্চ এলাকায় পড়লেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ৬$\frac{১}{২}$ লক্ষ কিউসেকের বন্যা পাওয়া যেতে পারে। এইজন্যে শুধু বৃষ্টি পরিমাপ করেই বন্যার পরিমাপ হয় না, বন্যার জল নদীতে পৃথকভাবে মাপা দরকার।

প্লাবন

নদীর খাতের মধ্যে বন্যার জল সীমাবদ্ধ না থেকে যখন দুইকূল অতিক্রম করে, তখনই প্লাবনের সৃষ্টি হয়। মনে হতে পারে, নদীতে যখন বেশী বন্যা নামে,

তখনই প্লাবন হয়। কিন্তু, সব সময়ে, এ কথা সত্যি নয়। দামোদরেই দেখা গিয়েছে, রণ্ডিয়ায় এণ্ডারসন হেবের-এ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ৬ই লক্ষ কিউসেক বন্যার প্রবাহ মাপা হয়েছে, কিন্তু প্লাবন হয় নি। অথচ ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে দামোদরে মাত্র ২ লক্ষ ৯০ হাজার কিউসেক বন্যার প্রবাহেই সর্বনাশা প্লাবন হয়েছিল বর্ধমান ও হুগলী জেলায়।

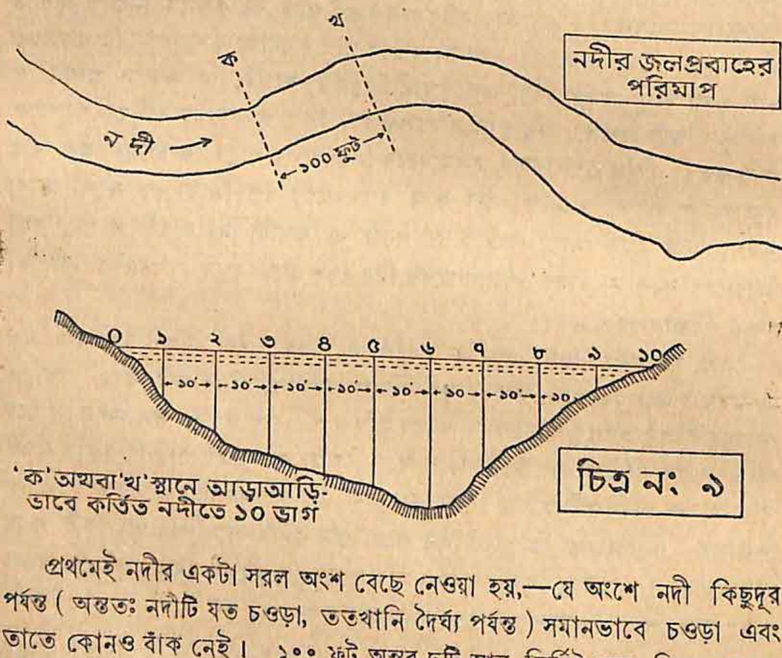
অববাহিকা অঞ্চলে অল্প অল্প বৃষ্টির দিনের পরে ২৪ ঘণ্টায় হঠাৎ ৪।৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হতে পারে দামোদরের মত নদে। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ ধরে মাঝারি রকমের বৃষ্টির দিনের পরে হঠাৎ ওই ৪।৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হলেও প্লাবন হয় না। তার কারণ এই শেষোক্ত মাঝারি রকমের বৃষ্টি নদীর গর্ভ কেটে কেটে গভীরতর করে, তাই হঠাৎ অতিরিক্ত বৃষ্টিও নদীর খাতেই নিকাশ হয়ে যায়। কিন্তু অল্প অল্প বৃষ্টি নদীর গর্ভ কাটতে না পারাতে পূর্বোক্ত ৪।৫ ইঞ্চি বৃষ্টির জল নদীর খাত থেকে উপচিয়ে প্লাবন সৃষ্টি করে। এই থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় নদীখাতে বন্যা নিরোধ করে জলপ্রবাহ রোধ করে দিলে নদী মজে যেতে পারে ক্রমশঃ। বেগোর হানা গড়ে উঠবার পরে দামোদরের বন্যার জল রূপনারায়ণের খাতে বইছে, আর পরিত্যক্ত নিম্ন খাতটি আজ প্রায় পূর্বেকার $\frac{১}{১০}$ অংশে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছে। এখন নিম্ন এলাকার বৃষ্টির জলও এই খাত সম্যক্‌ভাবে নিকাশ করতে পারে না। উচ্চ এলাকায় বন্যা নিরোধের পরে দামোদর-রূপনারায়ণের খাতেরও ওই রকম মুমূর্ষু অবস্থা হবে, এবং স্থানীয় বৃষ্টির ফলেই, এ অঞ্চলে প্লাবন ও জলাভূমি সৃষ্টি হবে। অল্প প্লাবনে লাভই হয়, কিন্তু জলাভূমির সৃষ্টি দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু রূপনারায়ণ, দামোদরের নিম্নাঞ্চলের খাতে জোয়ারের জল যদি সমুদ্রের পলি না আনতো, তা হলে দামোদরের বন্যা নিরোধের ফলেই তারা ক্রমশঃ মজে যেত না। অনেক বিশেষজ্ঞ এ কথাটা না বুঝেই বলেন, বন্যা নিরোধের ফলে দামোদর-রূপনারায়ণের নিম্ন-খাত মজে যাবে। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত নয়।

কুশী, মহানন্দা, তিস্তা প্রভৃতি যেসব নদী গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের মত বড় নদ-নদীতে এসে মিশেছে, তাদের জল অনেক সময়ে প্লাবনের সৃষ্টি করে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র বন্যায় ভরপুর থাকলে। কারণ ত্বরিত গতিতে তাদের জল তখন বেরিয়ে যেতে পারে না এবং পাড়ে উপচিয়ে পড়ে; গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের পরিপূর্ণ বন্যার জলই 'বাঁধে'র মত বাধা সৃষ্টি করে। হিমালয়জাত এই সব নদ-নদী জলের সঙ্গে প্রচুর শিলাখণ্ড (detritus) প্রভৃতি বহন করে এনে নদীর খাতে অবরোধ সৃষ্টি করে প্লাবন ঘটায়। পার্বত্য অঞ্চলের দ্রুত ঢাল সহসা মৃদু ঢালের সমতল ভূমিতে পতন এদের দ্রুত শিলা-অবক্ষেপণের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল।

নদীর জলপ্রবাহ ও বন্যার পরিমাপ

বৃষ্টিপাতের জলের কতটা অংশ নদীর খাতে এসে পড়বে, তা নির্ভর করে অববাহিকার অবস্থা ও প্রকৃতির (character) উপর। গ্রানাইটের মত কঠিন ঘন পাথরের উপরে পতিত বৃষ্টির সমস্তটাই প্রবাহিত হয়ে স্রোতস্বিনীর খাতে পৌছায়, শুধু যেটুকু উত্তাপে শুকিয়ে যায়, সেটুকু ছাড়া। কিন্তু বেলে পাথরের

মত ফোঁপরা পাথর অনেক জল শুষে নিয়ে ভূগর্ভে জমা করে। বন, জঙ্গল, ঘাস, গাছপালা অনেক জল শুষে নেয়, জলপ্রবাহের পথে বাধা সৃষ্টি করে জলকে ভূগর্ভে প্রবেশের সহায়তা করে, তাদের শিকড়ের চতুর্দিকে মাটিতে ছিদ্র থাকায় জলের মাটির ভিতর যাওয়ার সুবিধা হয়। এঁটেল মাটির উপরটা ভিজে গেলে বাকি জল তার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যায়, বেলে মাটির ভিতরে অনেক জল ঢুকে যায়। ভূমির উচ্চাবচতাও বাধার সৃষ্টি করে জলকে দাঁড় করায় ও চাপ সৃষ্টির ফলে বেশী জল ভূগর্ভে ঢোকার অবসর পায়। এই সব কারণে কোনও এলাকায় শুধু বৃষ্টিপাতের পরিমাণ জানা গেলেই, সেখানে নদীতে কত জল প্রবাহিত হবে, তা বলা মোটেই সম্ভব নয়। অববাহিকাতে প্রকৃতি অনুযায়ী, বিভিন্ন নদীর ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ঋতুতে ও দিনে একই পরিমাপের বৃষ্টিপাতের দরুন বিভিন্ন পরিমাণের জল নদীতে পাওয়া যাবে। সেইজন্য, নদীর জলপ্রবাহ মাপবার প্রয়োজন আছে। তাই থেকে বোঝা যায়, অববাহিকার কতটা জল নদী-উপত্যকা পরিকল্পনায় ব্যবহারযোগ্য ভাবে পাওয়া যেতে পারে। বৃষ্টি-পরিমাপক যন্ত্রে শুধু এক নির্দিষ্ট স্থানের বৃষ্টি মেপে সেই অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের 'আন্দাজ' পাওয়া যায় মাত্র। ইঞ্জিনিয়ারেরা যেভাবে নদীর জলপ্রবাহ মাপেন, তারই বিবরণ দিচ্ছি।



চিত্র নং: ৯

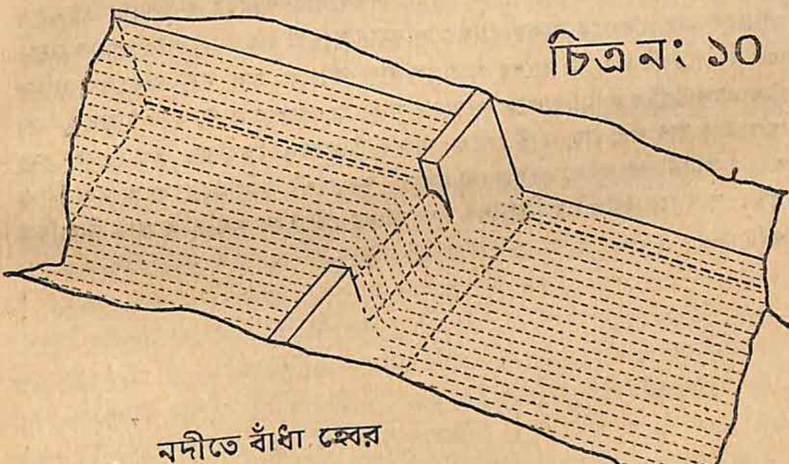
প্রথমেই নদীর একটা সরল অংশ বেছে নেওয়া হয়,—যে অংশে নদী কিছুদূর পর্যন্ত (অন্ততঃ নদীটি যত চওড়া, ততখানি দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সমানভাবে চওড়া এবং তাতে কোনও বাঁক নেই। ১০০ ফুট অন্তর দুটি স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। (চিত্র নং ৯-এর ক ও খ)। এই ১০০ ফুটে জল কোন্ গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে, তাই মাপতে হবে। এই অংশে, দেখতে হবে, নদীর খাতে যেন হঠাৎ কোনও গভীর গর্ত না থাকে।

এখন মুশকিল এই যে, তটের কাছে ও মধ্যভাগে একই গতিতে জল প্রবাহিত হয় না। মাঝখানের (অথবা যেখানে জল সবচেয়ে গভীর) চেয়ে তটের কাছে

গতি মন্থর। আবার তলদেশের গর্ভের মাটির কাছের জল উপরের জলের চেয়ে মন্থর গতিতে বয়। একেবারে জলপৃষ্ঠের জলের চেয়ে একটু নিচে নদীর জলের গতি দ্রুততর। (অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হতে থাকলে কিন্তু জলপৃষ্ঠের জলই দ্রুততর গতিতে চলে)। কাজেই যথাসম্ভব সঠিক ফল পেতে হলে, নদীর প্রশস্ততাকে অনেক অংশে ভাগ করে নিয়ে, প্রতি অংশের জলপ্রবাহের গতি মাপতে হবে, তাদের গভীরতার বিভিন্ন অংশে।

সচরাচর নদীর প্রশস্ততাকে দশ-দশ ফুট অন্তর ভাগ করে নেওয়া হয় বটে, তবে গভীরতার সব অংশের পৃথক পৃথক গতির মাপ নেওয়া হয় না। শুধু উপরের স্রোত মেপেই, তার শতকরা ৯০ অংশ ধরে, কাজ চালানো হয়। যদিও আধুনিক যন্ত্রে (current meter) সব অংশেরই স্রোত সঠিকভাবে মাপা সম্ভব। ছোট ছোট ভেলা ভাসিয়ে ও ১০০ ফুট যেতে (ক থেকে খ পর্যন্ত) সেই ভেলাগুলির কত সময় লাগে তাই ঘড়ি ধরে (stop watch) বার বার মাপা হয়। এই সব মাপের গড় নিলেই গড়পড়তা গতির পরিমাণ (প্রতি সেকেণ্ডের ফুট) জানা যায়। তার পরে জানা প্রয়োজন, 'ক' ও 'খ' অংশে নদীর জলকে আড়াআড়িভাবে কাটলে (cross-section), তাদের ক্ষেত্রফল কত।

চিত্র নং ১০



নদীতে বাঁধা হেবর

এই আড়াআড়ি কর্তিত (cross-section) অংশ দুটির ক্ষেত্রফল নির্ধারণ করতে হলে 'ক' ও 'খ' স্থানে নদীর এপার ওপার অনেক স্থানে গভীরতার মাপ নিতে হয়। কাগজে স্কেলে ড্রইং এঁকে ফেলতে হবে, ওই গভীরতাগুলি দিয়ে তখন সেই ড্রইং থেকে ক্ষেত্রফল বার করা খুবই সহজ, গণিতশাস্ত্র অনুযায়ী। ক্ষেত্রফল দুটি যোগ করে অর্ধেক নিলেই, নদীর এই ১০০ ফুট দৈর্ঘ্যের মধ্যে 'ক' ও 'খ' অংশের আড়াআড়ি কর্তিত অংশের গড় ক্ষেত্রফল পাওয়া যায়। তখন সেই গড় ক্ষেত্রফলকে (বর্গফুট) প্রতি সেকেণ্ডে গড় গতি দ্বারা গুণ করলেই 'কিউসেকে' নদীপ্রবাহ জানা যায়।

সেতু নির্মাণের পোস্তার দূরত্ব স্থির করবার জন্যে বড় বড় নদীতে বন্যার সময়ে এই পদ্ধতিতে জলপ্রবাহ মাপা হয়। (চিত্র নং ১০—পূর্বপৃষ্ঠার দেখুন)

সম্ভব ক্ষেত্রে নদীর খাতে আড়াআড়িভাবে মাটির বাঁধ (barrage) বেঁধে, মাঝে একটা পাকা হ্বের (weir) তৈরি করে নিলে, আর সেই হ্বের-এর উপর দিয়ে জল বের হতে দিলে, শুধু সেই হ্বের-এর উপর জলপৃষ্ঠের উচ্চতার মাপ ও হ্বেরের মাপ থেকেই ফরমুলা (Francis formula) দিয়ে অঙ্ক কষে অতি সহজে জলপ্রবাহের সঠিক পরিমাণ জানা যায়। দামোদর নদে রণ্ডিয়ায় এইরূপ হ্বের-এর সাহায্যে জলপ্রবাহের মাপ রাখা হয়। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মত বড় নদীতে যেখানে সেতু নির্মিত হয়েছে, সেখানে সেতুর পোস্তাগুলির মধ্যেকার জায়গাও অনেকটা হ্বের-এর কাজ করে। কাজেই বন্যার সময়ে জলের গভীরতা মেপেই, ওই পোস্তার ফাঁকের জায়গার মাপের সাহায্যে জলপ্রবাহের মাপের আন্দাজ পাওয়া যায়। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষই প্রধানতঃ বড় বড় নদীর প্রবাহের মাপ রাখেন। নদীর ঢাল জানা থাকলে, বন্যার প্রবাহিত জলের উচ্চতা থেকেই ফরমুলার সাহায্যে জলপ্রবাহের পরিমাণের আন্দাজ পাওয়া যায়।

অপেক্ষাকৃত ছোট নদীতেই দ্বিতীয় উপায়টি অবলম্বিত হয়। জলের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণের জন্য নদীর ও উপনদীগুলির সারা বছরের জলপ্রবাহ এইভাবে মাপলেই অববাহিকার জলের বার্ষিক পরিমাণ পাওয়া যায়, নদী পরিকল্পনার জন্য। এই জল নির্ধারিত স্থানে বাঁধের আড়ালে দাঁড় করালে জল ওই অঞ্চলের ভূমির উচ্চাবচতা সঠিক জানা থাকলে জরিপের সাহায্যে, কতখানি উঁচু হয়ে দাঁড়াবে, তা অঙ্ক কষে বার করা যায়, তাই থেকে বাঁধের উচ্চতাও স্থিরীকৃত হয়, এবং কত জমি জলনিমজ্জিত হবে, তাও জানা যায়। ভূয়োদর্শী ইঞ্জিনিয়ারেরা অনেক দিকে লক্ষ্য রেখে স্বল্প ব্যয়ে বাঁধ নির্মাণের জন্য বাঁধের উপযুক্ত অবস্থিতি স্থান নির্ধারিত করে নেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বন্যায় নদীর গর্ভ কাটে কেন ?

সকলেই লক্ষ্য করেছেন, কোনও স্থান বা জিনিসের উপর দিয়ে অনেকক্ষণ বা অনেকদিন পর্যন্ত সামান্য জলও প্রবাহিত হলে সেই স্থান বা জিনিসের ক্ষয় হয়। যাঁরা ঝরনা দেখেছেন, তাঁরা জানেন, জলের ধারা খুব শক্ত পাথরের উপরও তার ক্ষয়নশক্তির পরিচয় রেখে দেয়। শিলা যত নরম জাতীয় হবে (মর্মর প্রভৃতি চুনাপাথর, বেলে পাথর, শ্লেট প্রভৃতি) জলে ততই শীঘ্র শীঘ্র তার ক্ষয়। সাধারণ মাটির তো কথাই নেই।

জলের একটা দ্রাবক শক্তি আছে। অনেক পদার্থই জলে দ্রাব্য, যেমন চিনি, লবণ, ফটকিরি প্রভৃতি। শিলার মধ্যেকার লবণজাতীয় দ্রাব্য পদার্থ জলে গুলে যায়, তাতে শিলার কাঠিন্য নষ্ট হয়। তা ছাড়া বৃষ্টির জল আকাশে বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে পড়বার সময়ে, বায়ু থেকে কারবনিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, সালফিউরিক এসিড প্রভৃতি তেজস্কর দ্রাবক রাসায়নিকের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। কাজেই ঝরনা বা নদীর জলেও এই এসিডগুলি থাকে এবং এরা শিলার কয়েকটি উপাদানের উপর রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় তাদের দ্রবীভূত করে। সুতরাং শিলার ত্বক চূর্ণ হতে থাকে।

দুটি ঘন পদার্থ ঘসাঘসি করলে তাদের গাত্রত্বক চূর্ণ হয়। জলের ঘর্ষণে কঠিন পদার্থের ত্বক ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে।

চূর্ণ, ক্ষয়িত, শিলার যে-অংশ দ্রবনীয়, তা জলে গুলে গিয়ে জলের সঙ্গে মিশেই বাহিত হয় ঝরনা আর নদীর প্রবাহের সঙ্গে। কিন্তু যে অংশ গুলে যায় না, সেই চূর্ণ অংশগুলি বালি, পলি প্রভৃতির আকারে বাহিত হতে চেষ্টা করে।

আমরা উপরের বাক্যে 'চেষ্টা করে' কথাটি ব্যবহার করছি, কারণ এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটির উপরই নির্ভর করছে নদী প্রভৃতি জলপ্রবাহের গর্ভ কাটার আসল কারণ উপলব্ধি করা। জলের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ক্ষয়-কার্যকারিতা অনেক সময় সাপেক্ষ, অনেকটা কঠিন পদার্থ দ্রবীভূত করতে যুগ যুগ সময় লাগে। সচরাচর বন্যার সময়ে নদীর তলদেশের বহু পরিমাণ মাটি যে ক্ষয়িত হয়ে যায়, সেখানে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া কিছুই কাজ করে না বললেই হয়। জলের প্রবাহের শক্তির দরুন বালি, পলি প্রভৃতির 'বাহিত হওয়ার চেষ্টা'ই নদীর বন্যায় গর্ভ কাটার প্রধান কারণ।

নদীতলস্থ পদার্থের এই চেষ্টা কেন আসে গতিশীল জলের সংস্পর্শে এসে ?

পদার্থ-বিজ্ঞানের তত্ত্বের একটি মূলসূত্র এ প্রশ্নের উত্তর—যাকে Law of Inertia বলে। গতিশীল পদার্থের সংশ্রবে তার শক্তি গ্রহণ করে সকল পদার্থই গতিশীল হতে চেষ্টা করে।

দেখা যায়, এই 'চেষ্টা'র ফলে সূক্ষ্মতর বালুকা ও মাটির কণাগুলি তলদেশ থেকে উপরে উঠে জলের সঙ্গে বাহিত হতে থাকে। গতি যত বেশী, অর্থাৎ স্রোতের শক্তি যত বেশী, তত বেশী পরিমাণ মাটি ও বালির কণিকা জলকে বেশী ঘোলা করে নিয়ে জলের সঙ্গে বাহিত হতে থাকে। একটু বড় বড় দানার নুড়ি বা

বালি তলদেশেই গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যদি স্রোত প্রখর হয়। দানার আয়তনের ও জলের গতির পরিমাণের উপরই নির্ভর করে তাদের 'গড়িয়ে চলা'। জলের গতি অপেক্ষাকৃত কম হলে, তারা নড়তে পারে না। যে জল প্রতি সেকেণ্ডে তিন ফুট গতির বেগে বইছে, সে জলের তলায় বালি নুড়ি নড়ে না। প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচ ছয় ফুট গতিবিশিষ্ট জলপ্রবাহের সঙ্গেই কিছু কিছু বালি নদীর গর্ভ বেয়ে চলতে থাকে, বড় দানার নুড়ি নড়াতে আরও বেশী গতি দরকার।

জল তরল পদার্থ বলে সামান্যতম ঢালু জমি পেলেই গতি প্রাপ্ত হয়। নুড়ি, বালি প্রভৃতির ঘন পদার্থ, জমির ঘর্ষণশক্তির বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় অল্প ঢালে গতি পায় না, এক-একটা সীমার বেশী ঢাল পেলে আপনিই গতি পায়। (এই সীমারেখা angle of repose-এর উপর নির্ভর করে এই সব পদার্থের গতি)। কিন্তু গতিবিশিষ্ট জলপ্রবাহের সংস্পর্শে এসে এরা অপেক্ষাকৃত অল্প ঢালেও গতিবিশিষ্ট হতে পারে। গঙ্গা, মিসিসিপি প্রভৃতি নদীতে লক্ষিত হয়েছে, যেখানে নদীর তলদেশের ঢাল প্রতি মাইলে ৫।৭ ইঞ্চি, সেখানেও নদীর বন্যার সময়ে জলের গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে জলের গতি বৃদ্ধি পায়। বালি, মাটি প্রভৃতি ঘন পদার্থ কিন্তু তাদের স্তূপের উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গেই অল্প ঢালে গতিবিশিষ্ট হয়ে যায় না বা তাদের গতির বৃদ্ধি হয় না—জলের মত তরল পদার্থের সঙ্গে এইখানে তাদের পার্থক্য। জল জমে শক্ত বরফ হলে অথবা তুষারের স্তূপও উচ্চতায় বৃদ্ধির সঙ্গে অল্প ঢালে অধিক গতিবিশিষ্ট হতে পারে না। কিন্তু বন্যার সময়ে গভীরতা বৃদ্ধি পেয়ে জল অতিরিক্ত গতিশক্তি আহরণ করে সে শক্তি তলদেশের ঘনপদার্থে সংক্রামিত করে (transmit), কাজেই সেই ঘনপদার্থও তখন নড়তে চেষ্টা করে। এখন, এই অবস্থায় নুড়ি, বালি, মাটি চলতে শুরু করবে কিনা, সেটা নির্ভর করে ঘর্ষণশক্তির বিপরীত প্রতিক্রিয়ার উপর। অর্থাৎ চালাবার শক্তি এই ঘর্ষণশক্তির চেয়ে বেশী হওয়ামাত্রই তারা চলতে শুরু করবে।

কোনও এক প্রকৃতির বালি অথবা মাটির স্তূপের কোনও ঢালে স্বতঃই নড়া সম্ভব, সেটা পর্যবেক্ষণ করে নির্ণয় করা শক্ত নয়। মূলতঃ এই পার্থিব জিনিসগুলি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলেই গতিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু নদীর গর্ভে, জলের মত তরল পদার্থের তলায় চাপা থাকায় আবার এই সব বস্তুর ঘনত্ব অনুযায়ী গতি প্রাপ্তির একটা প্রারম্ভিক সীমা আছে। নিউটনের বস্তুর গতিতত্ত্বের নিয়ম অনুযায়ী (Newton's Laws of Motion) যে কোনও পদার্থের স্থিরতা ও গতি নির্ণয় করা যায়, যদি সমস্ত পরিস্থিতি জানা থাকে। নদীর তলের বালি বা মাটি বন্যার সময়ে যে রকম প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, আর যে সমস্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তার প্রত্যেকটিকে সমীক্ষা করতে পারলে, তবেই আমরা বলতে পারি কোন্ নদীর, কোন্ অংশে, কত গভীর জলের বন্যায় তার তলদেশের বালি, মাটি বাহিত হবে এবং গর্ভ কতখানি কাটবে। বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের নিয়মগুলি সর্বত্রই একই ভাবে খাটবে; জানা দরকার শুধু নদীর তলস্থ বালি, মাটির স্তরের প্রকৃতি, জলের গভীরতা এবং গতির পরিমাণ ও আশপাশের ঔদিক অবস্থা।

ইতিপূর্বে এক পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি, গঙ্গার বন্যায় গভীরতম বন্যার সময়েই গভীরতম খাত সৃষ্টি হয় না—বন্যার নামবার $\frac{3}{4}$ অথবা $\frac{2}{3}$ গভীরতা উপস্থিত হলেই

গভীরতম খাত সৃষ্টি হয়। এই তথ্যটি ঔদিকশাস্ত্রের অনেক বিশেষজ্ঞকে ধাঁধায় ফেলেছে। এ বিষয়ে, পর্যবেক্ষণের ফলে, এই আপাত বিপরীত সমস্যার সমাধানে আমি একটি সিদ্ধান্তে এসেছি। মনে রাখতে হবে (যা পূর্বেই বলেছি) প্রবাহিত জলের গভীরতার বিভিন্ন অংশে গতির হার বিভিন্ন থাকে, তলদেশে থাকে সবচেয়ে কম। স্থির গর্ভের সংস্পর্শে জলের তলটিও স্থির। গর্ভ যখন জলে কাটে, ঘর্ষণের প্রতিক্রিয়া উৎক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানের জলের গতিও (পূর্বোপেক্ষা) বাড়ে, সেইজন্যে আবার কাটবার শক্তি বাড়ে। সুতরাং জলের গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে কাটার বৃদ্ধিই স্বাভাবিক। কিন্তু নদীতে যখন বন্যার জন্য গভীরতা বাড়তে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে গর্ভের উপর ঔদিক চাপও (Hydrostatic pressure) বাড়তে থাকে আর যখন বন্যা কমতে থাকে তখন এই চাপও কমতে থাকে। এ দিকে গর্ভের শক্ত মাটির তলাতে অপেক্ষাকৃত বালুময় বহুরন্ধ্র মাটির স্তরেও (porous layer of earth) জল প্রবেশ করেছে। যেখানে বন্যা নদীর পাশের ভূমিতে উপচিয়ে প্লাবন সৃষ্টি করেছে, সেখানে দু পাশের জমির ভূগর্ভস্থ জলপৃষ্ঠ উচ্চতর হয়ে দু পাশের জলের চাপও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই চাপ মাটির ভিতরে ভিতরে নদীর গর্ভের তলদেশে ঊর্ধ্ব দিকে চাপ দিতে থাকে, ঔদিক নিয়মানুসারে। এই ঊর্ধ্ব দিকের চাপ (upward pressure) যখন বেশী রয়েছে, তখন বন্যা কমে আসার সময়ে নদীর খাতের মধ্যে জলের গভীরতা কম হয়ে আসায় নিম্নমুখী চাপ কম হয়। কাজেই অতিরিক্ত ঊর্ধ্বমুখী চাপ চাড় দিয়ে গর্ভের মাটি তুলে দেয়, আর সে মাটি নদীর জলের সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে চলে যায়। আমার অভিমত এই যে, বন্যা কমে আসবার সময়ে (২/৩ থেকে ১/৩ গভীরতা হয়) গঙ্গা-পদ্মার মত নদীর গর্ভ কাটবার কারণ শুধু এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তাদের গর্ভের নিচের মাটির স্তরগুলির বিশেষত্ব লক্ষ্য করলেই। পদ্মার মত নদীতে বন্যা কম হবার সময়ে, নদীর পাড়ে দেখা যায়, নদীর জলপৃষ্ঠের চেয়ে উঁচু জায়গা থেকে জলধারা নামছে। সুতরাং নদীর জলের চেয়ে দুই পাশের ভূগর্ভস্থ জলপৃষ্ঠের উচ্চতা বেশী রয়েছে। দেশের যে অংশে গঙ্গা পদ্মা অপেক্ষাকৃত বালিমিশ্রিত বিভিন্ন স্তরের পাললিক মৃত্তিকা দিয়ে প্রবাহিত এবং যে অংশে গঙ্গা-পদ্মার প্লাবন দুকূল উপচায়, সেখানেই বন্যা কমে আসবার সময়ে গর্ভ কাটে, অন্যত্র বন্যা বাড়বার সময়েই সবচেয়ে বেশী গর্ভ কাটে।

দেখা যাচ্ছে, বন্যায় নদীর গর্ভ কাটার কারণের অনুধাবন প্রসঙ্গে অনেক জটিলতা রয়েছে। বিচারের সময়ে সকল অবস্থিতি ও কারণগুলি বিচার্য করতে ভুল হয়ে যায় অনেক বিশেষজ্ঞের, তাই ধুয়া তোলা হয় নদীর জলপ্রবাহ ও পলিবহন, গর্ভকাটা প্রভৃতি 'অজ্ঞেয়' ও 'অজ্ঞাত' সূত্র ধরে ঘটে। কিন্তু ঔদিক মূলসূত্রগুলি বাস্তবিক সর্বত্রই খাটবে। প্রয়োজন শুধু বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণ। এইরূপ পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে আমরা নিশ্চিতই বলতে পারবো, কখন, কোথায়, কোন্ বন্যায়, কোন্ নদীর গর্ভ কতটা কাটবে। ৭০।৮০ বছর আগেও বড় বড় লৌহ-সেতু নির্মাণের সময়ে সমস্ত বৈজ্ঞানিক কারণ জানা না থাকায়, সে সময়ে যেসব সেতু নির্মিত হয়েছে, হয় তারা প্রয়োজনের চেয়ে অত্যধিক মজবুত, না হয় দুর্বল। ইংল্যাণ্ড-স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে যোগাযোগকারী টে-নদীর সেতু ক্যালিডনিয়ান এক্সপ্রেস ট্রেন সুদ্ধই ঝড়ের সময়ে জলে পড়ে গিয়েছিল। আজ কিন্তু অনেক

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমাদের হাতে এসেছে আর সেতু নির্মাণের পৌর্তিক জ্ঞান বিজ্ঞানসম্মত অবস্থায় এসেছে।

জলের মত তলর পদার্থের গতি ও শক্তি-বিজ্ঞান (Hydraulics) ও বিমান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সঙ্গে বায়বীয় পদার্থের গতি ও শক্তিতত্ত্ব (Aero-dynamics) প্রভৃত সাহায্য করছে আজ নদী-বিজ্ঞানের চর্চায়। কাজেই বন্যায় নদীর গর্ভ কাটা সম্বন্ধে আজ আমাদের জ্ঞান অনেক প্রসারিত হয়েছে, কিছুই 'অজ্ঞেয়' (undeterminable) নয়।

পদার্থের গতির দরুন তার ভরবেগ (momentum) উৎপন্ন হয়। এক পাউণ্ড ওজনের একটি পদার্থের টুকরা যদি প্রতি সেকেণ্ডে এক ফুট বেগে ধাবিত হয়, তা হলে তার 'এক-ফুট-পাউণ্ড-সেকেণ্ড' ভরবেগ। দু পাউণ্ড ওজনের পদার্থখণ্ডের গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক ফুট হলে তার ভরবেগ যা হবে, এক পাউণ্ড পদার্থের গতি প্রতি সেকেণ্ডে দুই ফুট হলেও তার ভরবেগ সমানই হবে (২ ফুট-পাউণ্ড-সেকেণ্ড)। সুতরাং ছোট্ট জিনিসের গতি বৃদ্ধি পেলে তার ভরবেগ বৃদ্ধি পায়। এইজন্যই রাইফেলের একটি ছোট্ট বুলেট, তার প্রচণ্ড ভরবেগে শক্ত হাড়ও ফুটো করতে পারে। এক ছোট্ট হাতুড়ি দিয়ে বার বার আঘাতে পেরেক শক্ত কাঠে ঠুকে দেওয়া যায়। বন্যার সময়ে গঙ্গার অথবা দামোদরে একশত মাইল খাত জুড়ে যখন বিপুল জলরাশি গতিবেগ নিয়ে ছুটতে থাকে তখন বন্যার জলের ভরবেগ খাতের গর্ভের মাটি কাটতে পারে।

এক ঘনফুট জলের ওজন প্রায় ৬২½ পাউণ্ড, কাজেই এক কিউসেক জল-প্রবাহের ভরবেগ ৬২½ ফুট-পাউণ্ড-সেকেণ্ড। এক পাউণ্ড ওজনের মাটি এক ফুট দূরে সরাতে 'এক-ফুট-পাউণ্ড' **কাজ** হয়। **শক্তি** এই কাজ করতে পারে। সুতরাং ২½ লক্ষ কিউসেক অথবা ৬½ লক্ষ কিউসেক বন্যার জলের ভরবেগ-জনিত শক্তি যে বিপুল মাটি সরানোর **কাজ** করতে পারে, তা সহজেই বোঝা যায়। যেসব অন্যান্য কারণে (ঘর্ষণশক্তি, চাপ প্রভৃতি) বন্যায় নদীর খাতে এই অঙ্ক অনুযায়ী বিপুল মাটি কেটে যায় না, তা পূর্বেই বলেছি। যখন অবস্থা অনুকূল হয়, তখনই সবচেয়ে বেশী মাটি কাটে। গঙ্গার বন্যার সময়ে এই রকম অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন খাতে বন্যার জল কমতে থাকে, কিন্তু দুই পাড়ে (বা এক পাড়ে) প্লাবনের সৃষ্ট জলপৃষ্ঠ উচ্চতর থাকে। রূপনারায়ণ দামোদরের নিম্ন অংশে (ডায়মণ্ডহারবারের নিচে) এইরূপ অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় জোয়ারের পরে ভাটা শুরু হলে, অথচ তখন রূপনারায়ণ দিয়ে বন্যার উচ্চ জল আসছে প্রচণ্ড ভরবেগ নিয়ে। কাজেই বন্যা চরগুলি কেটে নিম্ন-হুগলীর নাব্য-প্রণালী পরিষ্কার রাখে।

লোহা, পিতল প্রভৃতি ঘন পদার্থ দিয়ে হাতুড়ি, রাইফেলের বুলেট তৈরী হয়। তাদের ভরবেগের কার্যকারিতার চেয়ে বন্যার জলের ভরবেগের কার্য-কারিতা জোরালো। পদার্থ-বিজ্ঞান থেকে আমরা জানি সচরাচর প্রায় সমস্ত পদার্থেই চাপ দিলে তা নমনীয়। বায়ু প্রভৃতি বায়বীয় পদার্থ খুবই নমনীয়, অর্থাৎ চাপের বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের আয়তন কমে। রবারের টুকরা, স্বর্ণপিণ্ড, পিতলের টুকরা, লৌহ টুকরা, পাথর, মাটি প্রভৃতিও চাপবৃদ্ধির সঙ্গে অল্পবিস্তর

নমনীয়। কিন্তু জল প্রায় অনমনীয়। (প্রতি বায়ুমণ্ডলের চাপে per each atmospheric pressure, অর্থাৎ প্রতি বর্গ ইঞ্চির উপর ১৪·৭ পাউণ্ড চাপে, জল তার আয়তনের ০·০০০০৪৬২ ভগ্নাংশ মাত্র কমে)। আর সেইজন্যে জলের স্থিতিস্থাপকতা গুণ লোহা, পিতল, পাথর, মাটি প্রভৃতির চেয়ে অনেক বেশী। দামোদরের বন্যা যখন বর্ধমান থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত খাতে পূর্ণ প্রবাহে প্রবাহিত হয়, তখন এক বিশালায়তন স্থিতিস্থাপক অনমনীয় পদার্থে বিপুল প্রচণ্ড ভরবেগের শক্তি আশ্রয় নেয়, সেই শক্তি গর্ভের মাটিতে সংক্রামিত হয় আর দুর্বল অংশ কাটে; উহার চাপ দিয়ে, যেমন ইস্পাত, লোহার ত্বক কেটে দিতে পারা যায়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলতে হলে বলবো, নদীর বন্যার জলের ভরবেগ তার গর্ভস্থ মাটিতে সংক্রামিত হয়, সে মাটিও ছুটতে চায়। শুধু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ, মাটির অণুগুলির পরস্পর জুড়ে থাকার শক্তি (cohesive force), বিপরীত প্রতিক্রিয়া (friction) সে ছুটে চলা নিবারণ করতে চায়। গর্ভস্থ মাটির যে অংশে যখন এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, এই শক্তিগুলি বন্যার ভরবেগের শক্তির চেয়ে দুর্বলতর হয়, তখনই নদীর গর্ভ কাটে।

এই সমস্ত কথা মনে রাখলে সহজেই বোঝা যায়, দামোদরের ৬½ লক্ষ কিউসেক আকস্মিক বন্যার সময়ে, বর্ষায় যখন হুগলী নদীর নিম্নাঞ্চল জলে ডুবে থাকে আর রূপনারায়ণ প্রচণ্ড ভরবেগের বন্যায় ভরপুর থাকে, জোয়ার-ভাটার সহযোগিতায় হুগলীর গর্ভে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, সে অবস্থাতেই গর্ভ কেটে তার নাব্যতা রক্ষা পায়। ফরাক্কা ব্যারেজের সাহায্যে গঙ্গার অনুপ্রবিষ্ট জল দামোদরের বন্যার মত ভরবেগ সৃষ্টি করতে পারে না। এই জন্য, দামোদরের বন্যা নিরোধের ফলে কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা ধ্বংস হয়ে গেলে ফরাক্কা ব্যারেজে তার প্রতিকার হবে না।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বাংলা দেশের তরুণ ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে বলতে চাই। বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্বগুলি অনেক সময়ে মনের সামনে স্পষ্টভাবে না থাকার জন্য আমাদের দেশের পরিকল্পনায় বিরাট ভুল করে ফেলছেন অনেক পদস্থ ব্যক্তি। মূলতত্ত্ব না বুঝেও একজন সাধারণ তাঁতি অবলীলাক্রমে তার তাঁত চালাতে পারে গতানুগতিক ভাবে, গাড়োয়ানে গো-যান চালায়, মোটর-চালক মোটর চালায়—কিন্তু তাঁতের যান্ত্রিক উৎকর্ষ সাধন করতে, গো-যানের ব্যবহারোপযোগিতা বাড়াতে অথবা মোটর ইঞ্জিনের কাছ থেকে সবচেয়ে কম খরচে উৎকৃষ্ট কাজ আদায় করতে বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্বের সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় দরকার।

আজ আমার সঙ্গে একমত হয়ে অনেক শ্রদ্ধেয় ইঞ্জিনিয়ার তাঁদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে অনুমান করতে পারছেন, দামোদরের উচ্চ উপত্যকার বন্যা নিরুদ্ধ হলে নিম্নাংশে দামোদরের খাত মজে যাবে। কিন্তু মূল তত্ত্বগুলি সম্পূর্ণভাবে সামনে রেখে বিশ্লেষণ করতে না পারাতে তাঁরা ধরতে পারছেন না, আমি কেন বলছি, ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা ধ্বংস হবে। বন্যা নিরুদ্ধ হলেই, নদীর প্রশস্ততা ও গভীর খাত সংকীর্ণ ও ভরাট হয়ে যাবে, এ কথা সর্বত্র সত্যি হতে পারে না। নদীর খাতকে মজানোর জন্যে অপরাপর কারণ থাকা দরকার—সে দিকে তাঁরা লক্ষ্য না রেখেই সাধারণভাবে আমার সঙ্গে একমত হয়েও

বলতে পারছেন না, এত শীঘ্র কেন নিম্ন-হুগলীর নাব্যতা ধ্বংস হবে। দামোদরের ক্ষেত্রে তাঁদের শেষ সিদ্ধান্ত ও আমার সিদ্ধান্ত মূলতঃ মিলে গেলেও, তঁদের বিচার সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত নয়—তরুণ ইঞ্জিনিয়ারদের কথাটা মনে রাখতে বলছি।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের রহস্য

আমাদের দেশের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচেষ্টা

সম্প্রতি (২০।৭।৫৪) রুড়কিতে ইঞ্জিনিয়ারদেব সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ জানিয়েছেন যে, প্রায় ১০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, সেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে। (এই টাকা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমস্ত বরাদ্দ টাকার প্রায় অর্ধেক। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল ২০৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, সম্প্রতি ১৭৫ কোটি টাকা বর্ধিত করে ২২৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে)। পরিকল্পনার ফলে আবাদী জমির সেচ-দেওয়া অংশের পরিমাণ ১৩% থেকে১৮%এ বৃদ্ধি হবে। আর বিদ্যুৎ উৎপাদন ডবল হবে,—ভারতবর্ষের জনসংখ্যার মাথাপিছু ০.০০৫ K. W. (কিলোওয়াট) থেকে মাথাপিছু ০.০১ K. W. বিদ্যুৎ উৎপাদনশক্তির যন্ত্রপাতি বসানো হবে। মনে রাখা উচিত, এই সমস্ত বিদ্যুৎশক্তি শুধু জল-বিদ্যুৎ-শক্তি নয় ; বোকারোর তাপবিদ্যুৎ-এর মত উৎপাদন কেন্দ্রও এই সংখ্যার মধ্যে ধরা হয়েছে। তবুও, এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিপুল জল-বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের কথা হচ্ছে আমাদের দেশে, যা ইতিপূর্বে কল্পনার অতীত ছিল, যদিও দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য তার প্রয়োজন রয়েছে বহুদিন থেকেই।

আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। শ্রীনন্দ সম্প্রতি যে ১০০০ কোটি টাকা সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বরাদ্দ হয়েছে বলেছেন, সেটা ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে যেন সামঞ্জস্যহীন মনে হয়। তখন তাঁরা বলেছিলেন :

বহুমুখী সেচ ও শক্তি উৎপাদন পরিকল্পনা (Multipurpose Irrigation & Power Projects)	২৬৬ কোটি টাকা
শক্তি উৎপাদন (Power)	১২৭ „ „
সেচ (Irrigation)	১৬৮ „ „
	মোট—৫৬১ কোটি টাকা

উক্ত সংখ্যার সঙ্গে কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের (Agriculture and Community Development) জন্যে বরাদ্দ ৩৬১ কোটি টাকা যোগ দিলে মোট ৯২২ কোটি টাকা হয়। হয়তো এইভাবে হিসাব করে আর বর্তমানে খরচ প্রথম বরাদ্দের চেয়ে ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়ায়, ১০০০ কোটি টাকা বলা হচ্ছে।

যাই হোক, একটা কথা খুবই স্পষ্ট যে আমাদের দেশ আজ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে অভাবনীয় টাকা খরচ করতে প্রস্তুত হচ্ছে। সুতরাং সাধারণ মানুষের কৌতূহলের অভাব নেই, এই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের রহস্য জানতে।

বিদ্যুৎ সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের রহস্য বুঝতে হলে প্রথমেই দরকার বিদুৎ সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান। সৌভাগ্যক্রমে আজ অনেক পাঠকেরই সে জ্ঞান আছে। তাঁরা জানেন, নানা উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে:

১] দুটি বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ (যেমন কাচ ও রেশম কাপড়ের টুকরা) ঘসলে তাপ ও বিদুৎ উৎপাদিত হয়।

২] সালফিউরিক এসিড প্রভৃতির মধ্যে দুই রকম ধাতুর (যেমন তামা ও দস্তা) পাত পরস্পর থেকে কিছুটা ব্যবধানে, প্রায় সম্পূর্ণ ডুবিয়ে রেখে তাদের মাথা একটি ধাতুর তারের (সাধারণতঃ তামার তার) সাহায্যে সংযুক্ত করা হয় যদি, তা হলে ঐ তারে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এই রকম ব্যবস্থাকে ব্যাটারির সেল বলে। মোটর গাড়িতে এর খুব প্রচলন। আর ইলেকট্রিক টর্চগুলিতেও এক প্রকার সেল ব্যবহৃত হয়।

৩] চুম্বক তার কাছে চুম্বক শক্তির ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। যদি সেই ক্ষেত্রে, কুণ্ডলি পাকানো (coils) ধাতুময় তার ঘোরানো যায়, তা হলে সেই তারে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে। সাধারণ ম্যাগনেটো, ডাইনামো, তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জেনারেটর প্রভৃতি এই চুম্বকের ক্ষেত্রে কুণ্ডলি পাকানো (coils) তার ঘোরানোর ফলের সুযোগ নিয়েই তৈরী হয়েছে।

একটা নির্দিষ্ট চুম্বক শক্তির ক্ষেত্রে হত অধিক সংখ্যক কুণ্ডলি যত দ্রুততর ঘোরানো হবে, তত বেশী বিদুৎশক্তির প্রবাহ বইবে ওই কুণ্ডলি পাকানো তারগুলির মধ্যে।

আবার সুবিধা এই যে, সাধারণ লৌহের চারপাশে তার জড়িয়ে, সেই তারে বিদ্যুৎশক্তি প্রবাহিত করলে ওই লৌহখণ্ড চুম্বকে পরিণত হয় আর চুম্বক শক্তির ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। বিদ্যুৎশক্তির পরিমাণ বাড়ালে চুম্বক-ক্ষেত্রের শক্তিও বাড়ে। এই শক্তির ক্ষেত্রে তারের কুণ্ডলি 'ঘোরানোর ব্যবস্থা' করতে পারলেই হল। অর্থাৎ, অন্য ব্যবস্থাগুলি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য, এই 'ঘোরানোর ব্যবস্থা'র দ্রুতীকরণই আসল কথা।

ম্যাগনেটোতে হাতল ধরে একজন মানুষ হাত দিয়ে ঘুরিয়ে সামান্য বিদ্যুৎ-শক্তি (১/১০ K. W.) উৎপাদন করতে পারে। তৈল অথবা বাষ্প চালিত ইঞ্জিনের সাহায্যে 'ঘোরানোর ব্যবস্থা'য় হাজার কিলোওয়াট শক্তির বিদ্যুৎ উৎপাদন সহজ কথা। আর পাহাড়ের মাথার জল নিচে নামতে যে শক্তি পায়, সেই জলশক্তির সাহায্যে 'ঘোরানোর ব্যবস্থা' করে আমরা লক্ষ কিলোওয়াট শক্তির জলবিদ্যুৎ (Hydro-electricity) উৎপাদিত করি।

তৈল ও বাষ্পচালিত ইঞ্জিনে তৈল, কয়লা প্রভৃতি ইন্ধন পোড়াতে হয়, সেই ইন্ধনের দাম অনুযায়ী বেশ খরচ পড়ে। এই সব ইন্ধন পুড়ে যে 'তাপশক্তি' উৎপাদিত হয়, সেই রকম 'শক্তি' ঝরনা, নদীর উচ্চস্থান থেকে নিম্নে অবতরণের প্রপাতে স্বতঃই উৎপাদিত হচ্ছে। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতেই মনে হয়, এই

'জলশক্তির' জন্য কোনও খরচ নেই। কিন্তু এই জলশক্তি ব্যবহার করতে, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে, যেসব বিরাট আয়োজনের প্রয়োজন সেই আয়োজনই অনেক সময়ে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য।

তৈলচালিত ইঞ্জিন ও বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের সাহায্যে ছোটখাটো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র যেখানে-সেখানে অতি সহজেই স্থাপন করা যেতে পারে। যতক্ষণ দরকার, শুধু ততক্ষণই চালিয়ে (ততক্ষণ ইন্ধন পুড়িয়ে) সস্তায় একটি ছোট বাড়ির বিজলী বাতির ব্যবস্থা এই উপায়েই হওয়া সম্ভব। আবার কলিকাতার মত শহরে, যেখানে কাছেই কয়লাখনি রয়েছে আর সস্তায় প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়, সেখানে বাষ্পচালিত টারবাইন ইঞ্জিনের সাহায্যে বিরাট জেনারেটরে বিদ্যুৎ উৎপাদনই করাই সস্তা ও সহজ বিবেচিত হয়েছিল।

সমতলভূমির শহরের জনবসতি ও শিল্পাঞ্চল থেকে বহুদূরে দুর্গম, বন্য, পার্বত্য এলাকাতেই জল উপর থেকে নিচে নামে, সেখানেই জলশক্তি উৎপাদন করে। সেই রকম দুর্গম ও সুদূর এলাকায় জলশক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তাকে ব্যবহৃত হবার এলাকায় আনাবার ব্যবস্থা করতেই এত আয়োজন ও ব্যয় করতে হয় যে, অনেক সময়েই মজুরি পোষায় না। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে হলে সমস্ত দিক হিসেব করে দেখা হয়। তাই বাস্তবক্ষেত্রে জলশক্তি অপচয় হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময়ে তার ব্যবহার হয় না। 'ব্যবসায়ীর দৃষ্টিকোণ' থেকে বিচার করেই সিদ্ধান্ত করা হয়, কোন্ জলশক্তি ব্যবহারযোগ্য এবং কোন্‌টি নয়। আর ব্যবসায়ের কথা এলেই, বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদের দিনে, নানা শিল্পের উন্নয়নের কথা এসে পড়ে, যেগুলি কায়েমীস্বার্থের খাতিরে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি আর পর্যাপ্ত জল-বিদ্যুৎ-শক্তির বাজার গড়ে ওঠে নি। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ আমাদের দেশকে অনেক শিল্পে তাদের উপর নির্ভরশীল করে রেখেছে, শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করে নি।

সাম্প্রতিক কালে কল্যাণরাষ্ট্রে 'বহুমুখী' (multipurpose) পরিকল্পনার মাধ্যমে পূর্বেকার অনেক অব্যবহার্য জলশক্তিও ব্যবহৃত হতে চলেছে। কল্যাণরাষ্ট্রে মানুষের প্রতিভা ও শক্তি থেকে প্রাকৃতিক শক্তি পর্যন্ত সমস্ত শক্তিরই পূর্ণ ও সম্যক্ ব্যবহারের আয়োজন সম্ভব, কিছুই অপচয়িত হতে দেবার কথা নয়। ব্যবসায়ীর দৃষ্টিকোণ থেকে হিসেব রাখার প্রয়োজন হয় না, দেখতে হয় মানুষের সত্যিকারের ভালো করতে পারবে কিনা। বহুমুখী পরিকল্পনায় যে বিরাট আয়োজন ও বিপুল অর্থব্যয়ে হয়, তা ব্যবসায়ী দলের ইঞ্জিনিয়ারদের স্বপ্নেরও বাইরে ছিল। তাই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে লালিত-পালিত ইঞ্জিনিয়ারের দল আমাদের দেশের আজকের পরিকল্পনায় এত ভুলভ্রান্তি করছেন। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশ আজও সেই পূর্ণ কল্যাণরাষ্ট্র হতে পারে নি, আমরা আজও আধা-ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে বাঁধা, তাই আজও অপচয়ের অভাব নেই। দামোদর পরিকল্পনায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করবার ধাপ্পা দিয়ে কার্যতঃ বিপুল পরিমাণ তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদনের আয়োজন হয়েছে বোকারোর কেন্দ্রে। প্রায় দুই লক্ষ কিলো-ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র বোকারো থেকে গত সাত বছরের চেষ্টায় মাত্র ২৮ হাজার কিলোওয়াট ব্যবহার করবার ব্যবস্থা করা গিয়েছে। প্রধানতঃ বিদ্যুৎ-

শক্তি পরিবহন ব্যবস্থার অভাবেই কয় বছর ধরে এত অর্থের অপচয় হচ্ছে। রাষ্ট্র অর্থব্যয়ের ভার নিয়েছে, বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হলেও ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়। সাধারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেউলে হয়ে যেত এরকম ক্ষয়ক্ষতির ফলে। নানারূপ বাকবিভূতি বিস্তার করে রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা দেশের সাধারণ মানুষকে সত্য কথা বুঝতে দিচ্ছেন না।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ইতিহাস

ভারতবর্ষে দার্জিলিং-এই প্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গৃহীত হয় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে। প্রথম যুগে স্বাভাবিক জলপ্রপাতের কাছেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি স্থাপিত হয়েছিল। মুশৌরী, গোদক, পাইকারা, সিমলা, শিলং, নেপালের ফুরপিং ও সুন্দরীজল প্রভৃতির জলপ্রপাত এই ভাবে ব্যবহৃত হয়।

নদীর খাতে আড়াআড়ি বাঁধ বেঁধে কাবেরী, নর্মদা, উল প্রভৃতি নদীর জল দিয়ে কৃত্রিম জলপ্রপাত সৃষ্টির কাজ পরবর্তী যুগে সাধিত হয়। নৈনিতালে 'তাল' অর্থাৎ হ্রদের জলও ব্যবহার করা হয়, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে।

সেচ-খালের জলও বাঁধ বেঁধে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে কাশ্মীর ও জম্মুর মাহোরা ও রণবীর খালে। উত্তর প্রদেশের গঙ্গা-খালের প্রপাতও ব্যবহৃত হয়েছে।

টাটা কোম্পানীই প্রথম বৃষ্টির জল বাঁধের আড়ালে সঞ্চিত করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় নিয়োগ করেন বোম্বাই অঞ্চলে। বর্তমান যুগের দামোদর, মহানদী (হীরাকুঁদ) পরিকল্পনায় বৃষ্টির জলই বাঁধের আড়ালে বিশাল হ্রদে আটক রেখে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের আয়োজন হচ্ছে।

ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ব্রিটেন, জার্মানি, অষ্ট্রিয়া, ইতালি, কানাডা, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ স্বাভাবিক জলপ্রপাত থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় অগ্রণী। বর্তমান যুগে সোভিয়েত দেশ ও আমেরিকা নদী বেঁধে ও বৃষ্টির জল আটকে রেখে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অতি বিরাট পরিকল্পনা সম্ভব করেছেন প্রথমে। ইউরোপের আল্‌পস পর্বত এলাকায়, স্কটল্যাণ্ডে, কানাডায় গলিত তুষারের জলই প্রধানতঃ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের শক্তির যোগান দেয়।

জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিবরণ

এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভের দিকেই বলেছি, জলশক্তি দিয়ে জেনারেটরকে 'ঘোরানোর ব্যবস্থা' করাই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান কথা। এই 'ঘোরানো' সারা বছর ধরে মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে চললেই সুবিধা হয়। রাত্রে যখন বিদ্যুৎ বাতি জ্বলে অথবা দিনে যখন বিদ্যুৎচালিত কারখানায় কাজ হয়, তখনই বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন বেশী, আবার বছরের এক ঋতুতেই (শীতকালে) বেশী বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন হয়। অথচ স্বাভাবিক জল কোথাও সারা বছর সমান হারে প্রবাহিত হয় না। বর্ষাকালে, কিংবা গলিত তুষারের দেশে গ্রীষ্মকালেই নদীতে বেশী জল প্রবাহিত হয়, অপর সময়ে কম। সুতরাং প্রথমেই দরকার, উপযুক্ত উচ্চ স্থানে সারা বছরের প্রয়োজনীয় জল মজুদ করে রাখা, আর নিয়ন্ত্রিত প্রবাহে ছাড়া।

দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানে যেখানে ঝরনার জলই বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়, সেখানে ঝরনা বা 'ঝোরা'র জল কৃত্রিম নালার সাহায্যে সরোবরে আনা হয়। এই সরোবর পর্বতের স্বাভাবিক উচ্চ স্থানে স্থাপিত, সুতরাং নিচে বিদ্যুৎ উৎপাদন ঘাঁটিতে উচ্চ চাপে নামে। কিন্তু যেসব নদীতে অথবা যেখানে বৃষ্টির বা গলিত তুষারের জল মজুদ করে যথেষ্ট উচ্চতার চাপ সৃষ্টি করার প্রয়োজন কৃত্রিম উপায়ে, সেখানে সুউচ্চ বাঁধ নির্মাণই প্রথম কাজ। এই বাঁধ ভালো এঁটেল মাটি দিয়েই তৈরি করা যায়। অথবা পাথরের গাঁথনি কিংবা রি-ইনফোর্সড কংক্রীট অথবা সাধারণ কংক্রীটেও নির্মিত হতে পারে। বড় বড় আধুনিক পরিকল্পনায় এই বাঁধই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যয়সাধ্য প্রথম কাজ। বহুদিক বিবেচনা করে অভিজ্ঞ, ভূয়োদর্শী ইঞ্জিনিয়ার এই বাঁধের উপযুক্ত অবস্থিতি স্থান নির্দিষ্ট করতে পারেন। এ বিষয়ে ভুল হলে বিপর্যয় ঘটতে পারে—যেমন খারাপ ভিত্তির স্থানে যদি এই বাঁধ নির্মিত হয়ে যায়। হিসাব করে জলের প্রাপ্যতা ও উচ্চতার প্রয়োজন অনুযায়ী এই বাঁধের উচ্চতা ও গঠন ডিজাইন করা হয়।

বাঁধ (Dam) থেকে জল ব্যবহারের পূর্বে 'পলি নিরোধক' ব্যবস্থার সাহায্যে জলকে মাটি, বালি প্রভৃতি থেকে পৃথক করা হয়। যেসব দেশে শীতকালে জল জমে বরফ হয়ে যায়, সেখানে তার প্রতিষেধক ব্যবস্থা করতে হয়।

বাঁধ থেকে জল নিয়ে কতকগুলি আনুষঙ্গিক ব্যবস্থায় 'পেনস্টক' (Penstock) নামক পাইপের (নলের) সাহায্যে নিম্নে জেনারেটরে নিয়ে যাওয়া হয়। পেনস্টক এক-দেড়মাইল লম্বাও হয়, কিন্তু দৈর্ঘ্যে যত ছোট হয় (অর্থাৎ জেনারেটর থেকে বাঁধের উচ্চতা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য হলেই) সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু ঠিক খাড়া নিচেই জেনারেটরের ঘাঁটির অবস্থিতি স্থান পাওয়া যেতেই পারে না, কাজেই পেনস্টক কিছু দীর্ঘ হয়েই পড়ে।

যে শক্তি-ঘাঁটিতে (Power-House) জেনারেটর থাকে, সেটির অবস্থিতি স্থান বিশেষ যত্ন সহকারে ঠিক করতে হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কৃত্রিম হ্রদ থেকে জলকে পাহাড়ে টানেল কেটে বহুদূরে পেনস্টকের মুখ পর্যন্ত আনা হয়, পূর্ণ চাপে। আর পেনস্টকের ভিতর দিয়ে পৌঁছে সেই জল শক্তি-ঘাঁটির জেনারেটরটি ঘোরায়। দূরে পরিবহনের ফলে জলের চাপ খুব নষ্ট না হয় অথবা বর্ষার বন্যায় বাঁধের উদ্বৃত্ত জল ঘাঁটি ভাসিয়ে না নিয়ে যায়, প্রভৃতি অনেক দিক বিবেচনা করে এই কেন্দ্রের (ঘাঁটির) অবস্থিতি ঠিক করা হয়। সুতরাং পেনস্টককে পাহাড়ের গা বেয়ে, ছোট ছোট নালা অতিক্রম করে বহুদূর যেতে হয়। ইস্পাত-লোহার পাত দিয়েই সচরাচর পেনস্টক নির্মিত হয়। কোথাও পাহাড়ে অনতিদীর্ঘ টানেল কাটার প্রয়োজন হয়, আবার ছোট ছোট নালা অতিক্রম করতে সাইফন (Syphon) ব্যবহারও করতে হয়। পেনস্টকের জলে প্রচণ্ড চাপ থাকে, সুতরাং এটা খুব মজবুত হওয়া চাই। তা ছাড়া, উঁচু-নিচু স্থান অতিক্রম করতে ভিতরের চাপের দরুন উঠে না পড়ে কিংবা বেঁকে না যায়, সেই জন্য স্থানে স্থানে পেনস্টককে 'নোঙর' করে আটকাতে হয় কংক্রীট প্রভৃতির দৃঢ় বন্ধনে। বাস্তবিক, পেনস্টকের সঙ্গে অনেক পূর্তকার্য প্রয়োজন।

জলের সঙ্গে বায়ু মিশ্রিত থাকে, পেনস্টকের লম্বা যাত্রাপথে জলের চাপের

তারতম্যে সেই বায়ু বুদ্‌বুদ্‌ আকারে জমা হয়ে গোলমাল করতে পারে পেনস্টকে জলপ্রবাহে। তাই মাঝে মাঝে এই বায়ু নিঃসরণের জন্য (এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে বায়ু প্রবেশ করাবার জন্যও) 'এয়ার ভাল্‌ভ' (Air-valve) লাগাতে হয় পেনস্টকে।

শক্তি-ঘাঁটিতে পেনস্টক-পাইপের মুখ ক্রমে সংকীর্ণতর করে নিয়ে জেনারেটরের সঙ্গে এক ধুরে (Axle) লাগানো পেল্‌টন চাকা বা টারবাইনের চাকায় প্রবেশ করানো হয়।

পেল্‌টন চাকা অথবা টারবাইন চাকার গঠনের অনেক উন্নতি হয়েছে। ধুর বা মেরুদণ্ডের চারধারে বহুসংখ্যক ছোট ছোট বালতি সাজানো থাকে একটা বিরাট চাকায়। পেনস্টকের জলের চাপ এই পর পর সজ্জিত বালতিগুলিতে পড়লে টারবাইনের চাকা ঘুরতে থাকে। আর এই টারবাইন-চাকার ধুরের (Axle) সঙ্গে এক সরলরেখায় জেনারেটরের চাকার ধুর। সুতরাং টারবাইন ঘোরার ফলে জেনারেটরও ঘোরে আর তারের কুণ্ডলিগুলির মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হতে থাকে।

টারবাইনের ভিতর থেকে আর এক দিক দিয়ে জল বহির্গত হয়ে 'টেল-রেস' (Tail race) পথে নালা দিয়ে নদীতে বা খালে গিয়ে পড়ে, নাব্যতা বা সেচের কাজের জন্যে ব্যবহৃত হবার জন্যে কিংবা অপচয়িত হবার জন্যে।

এমনিভাবে জেনারেটরে যে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হল, তা ব্যবহারে পাঠাবার আগে আরও কয়েকটি স্তরের প্রক্রিয়ার প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ একরকম উচ্চ চাপে (High Voltage) বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। বহুদূরে পাঠানোর জন্যে ট্রান্‌সফরমারের (Transformer) সাহায্যে তার চাপ আরও বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হতে পারে। ছোট ছোট কেন্দ্রে সে চাপ কমানোর প্রয়োজনও হয়, সোজাসুজি ব্যবহারের জন্যে। সাধারণতঃ ৪৪০ ভোল্‌ট, ২২০ ভোল্‌ট অথবা ১১০ ভোল্‌টে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয়। বেশী চাপে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। অথচ দূর থেকে অল্প চাপে বিদ্যুৎ পাঠাতে খুব মোটা তামার তার লাগে, তাতে মূল্য অনেক বেশী হয়ে যায়। উচ্চ চাপে (৩৩,০০০ ভোল্‌ট প্রভৃতি) শত শত মাইল তামার তার অনেক সরু হলেও চলে, খরচও কম পড়ে। তাই শক্তিকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ পরিবহনের পূর্বে তার চাপ বর্ধিত করে নেওয়া হয় ট্রান্‌সফরমারের সাহায্যে।

বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনার বিশেষত্ব

উদ্ভাবনী শক্তি ও বুদ্ধির ব্যবহারে পৃথিবীর জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনায় নানাস্থানে নানা বিশেষত্ব আছে। শক্তির উৎস জল। সেই জল ঝরনার বা 'ঝোরা'র জল হওয়ার দরুন টিনের তৈরী নালায় অনেকগুলি ঝোরা থেকে জল সংগৃহীত হয় দার্জিলিং-এর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে। সেই জল সরোবরে সঞ্চিত হয়ে পেনস্টকে ঢোকে। দার্জিলিং-এ বারো মাসই অল্প অল্প বৃষ্টি হয়, ঝোরাগুলি সম্পূর্ণ শুকায় না কখনও, শীতকালের শেষের দিকে তাদের প্রবাহ কমে যায় মাত্র। তাই দার্জিলিং-এ খুব বড় আয়তনের সরোবরের প্রয়োজন হয় নি। বিদ্যুৎশক্তির চাহিদার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঝোরা থেকে জল সংগৃহীত হয়েছে।

অনেক ছোট ছোট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে নদী বা ঝরনাগুলির সর্বনিম্ন প্রবাহের পরিমাণের উপরে নির্ভর করেই পরিকল্পনা করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রেও খুব বড় কৃত্রিম সরোবরের প্রয়োজন হয় নি।

নদীতে সারা বছর জলপ্রবাহ সমান থাকে না, কাজেই অনেক পরিকল্পনায় শুকনার দিনে অল্প পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। অথচ সে সময়েই বিদ্যুতের চাহিদা হয়তো খুব বেশী। এরূপ ক্ষেত্রে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রেই আবার তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত করতে হয়, সারা বছরের সকল সময়ের চাহিদা মেটাবার জন্যে। এই অজুহাতে দামোদর পরিকল্পনায় বোকারোতে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সচরাচর শতকরা ১০ থেকে ৩০ অংশের তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থার প্রয়োজন হতে পারে। দামোদর পরিকল্পনায় ১০০ অংশের চেয়ে বেশী তাপবিদ্যুতের আয়োজন হয়েছে। ফলে, বস্তুতঃ, দামোদর পরিকল্পনা তাপবিদ্যুতেরই কেন্দ্র বলতে হয়, জলবিদ্যুতের নয়। আমরা এই ব্যবস্থার নানা সমালোচনা করেছি আর আমাদের বিশ্বাস 'গোড়ায় গলদে'র জন্যেই এরকম অদ্ভুত ব্যবস্থা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যবস্থাপকমণ্ডলী জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থাই বানচাল করে দিয়েছে।

অস্ট্রিয়ার গ্লক্‌নার কাপ্রান জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে আদপেই তাপবিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। অতিরিক্ত জলপ্রবাহের সময়ের কিছু জল (৭০,০০০ একর ফুট) সঞ্চিত করে পর্বতশৃঙ্গে অত্যুচ্চ ট্যাঙ্কে তুলে দেওয়া হচ্ছে পাম্পের সাহায্যে। (এই পাম্প অবশ্য, জলবিদ্যুতেই চালানো হবে)। অল্প জলপ্রবাহের ঋতুতে, সেই অত্যুচ্চ ট্যাঙ্ক থেকে যে অতিরিক্ত চাপ পাওয়া যাবে, তারই সাহায্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের চাহিদা পুরাপুরি মেটানো হবে। দামোদর পরিকল্পনায় এই রকম ব্যবস্থাই হতে পারতো, যদি দেশের লোকের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে এই পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হত।

বিদ্যুৎ-সম্বন্ধীয় টেকনিকাল শব্দ

বিদ্যুৎ সম্বন্ধে অনেক টেক্‌নিকাল শব্দ ব্যবহৃত হয়। সচরাচর ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থ বোঝা শক্ত নয়। H. P. (Horse-Power বা অশ্বশক্তি), K. W. (কিলোওয়াট) প্রভৃতি শব্দগুলি এবং K. W. H. (Kilowatt Hour, কিলোওয়াট আওয়ার) অথবা B. T. U.-ইউনিট প্রভৃতি শব্দের যথার্থ জ্ঞান না থাকলে আজকের দিনের নদী পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটা ঝাপসা ধারণা ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না।

ওজনের 'একক' এবং তাদের পরস্পর সম্বন্ধ

সোনা, রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণার আদান-প্রদানের সময়ে আমরা 'ভরি' বা 'তোলা' অথবা 'আউন্স' শব্দটি ব্যবহার করি। তেমনি পিতল, তামা, লৌহ প্রভৃতি গুরুভার ধাতুর সম্বন্ধে 'পাউণ্ড', 'সের', 'মণ', 'হন্দর' (CWT), 'টন' প্রভৃতি শব্দের সঙ্গেও খুব পরিচত আমরা এবং এই সব শব্দ শুনে একটা নির্দিষ্ট ধারণাও আমাদের মনে উদয় হয়। জল প্রভৃতি তরল পদার্থের পরিমাণের মাপের জন্যে, 'সের', 'পাউণ্ড', 'গ্যালন', 'ঘনফুট'-ও আমাদের মনে

নির্দিষ্ট ধারণা সৃষ্টি করে। তেমনি যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক 'শক্তি'র পরিমাণ সম্বন্ধে কতকগুলি 'একক' (unit) ব্যবহৃত হয়, আর তাদের নির্দিষ্ট অর্থও আছে। এই সকল একক পরস্পর সম্বন্ধাবদ্ধও বটে। তাদের কথা ক্রমশঃ বলছি।

৮০ তোলা বা ভরিতে ১ সের। ৪০ সেরে একমণ। আবার ৮২ পাউণ্ডে প্রায় একমণ অর্থাৎ ১ সের প্রায় ২ পাউণ্ডের সমান—এসব অনেকেই জানেন। সুতরাং ২২৪০ পাউণ্ডে ১ টন হলে তা প্রায় ২৭ মণের সমান হবে, এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না।

তেমনি আবার ১ ঘনফুট জল প্রায় ৬২½ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৩১ সের ওজনের। সুতরাং ১ কিউসেক জলের প্রবাহ মানে প্রায় ৬২½ পাউণ্ড বা ৩১ সের জলের প্রতি সেকেণ্ডে প্রবাহ।

১ গ্যালন জলের ওজন ১০ পাউণ্ড বা প্রায় ৫ সের। সুতরাং ৬¼ গ্যালন জলে ১ ঘনফুট জল, আর ১ কিউসেক জলের প্রবাহ প্রায় ৬¼ গ্যালন জলের প্রতি সেকেণ্ডে প্রবাহ।

এক ঘণ্টায় যখন ৩৬০০ সেকেণ্ড, তখন ১ ঘণ্টা ধরে ১ কিউসেক জলের প্রবাহ হইলে ৩৬০০ × ৬২½ পাউণ্ড অথবা $\frac{৩৬০০ \times ৩১}{৪০}$ মণ জলের প্রবাহ বয়ে গিয়েছে, এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না। ১ ঘণ্টায় ১ কিউসেক জল ৩৬০০ × ৬¼ গ্যালন জল ঢালবে।

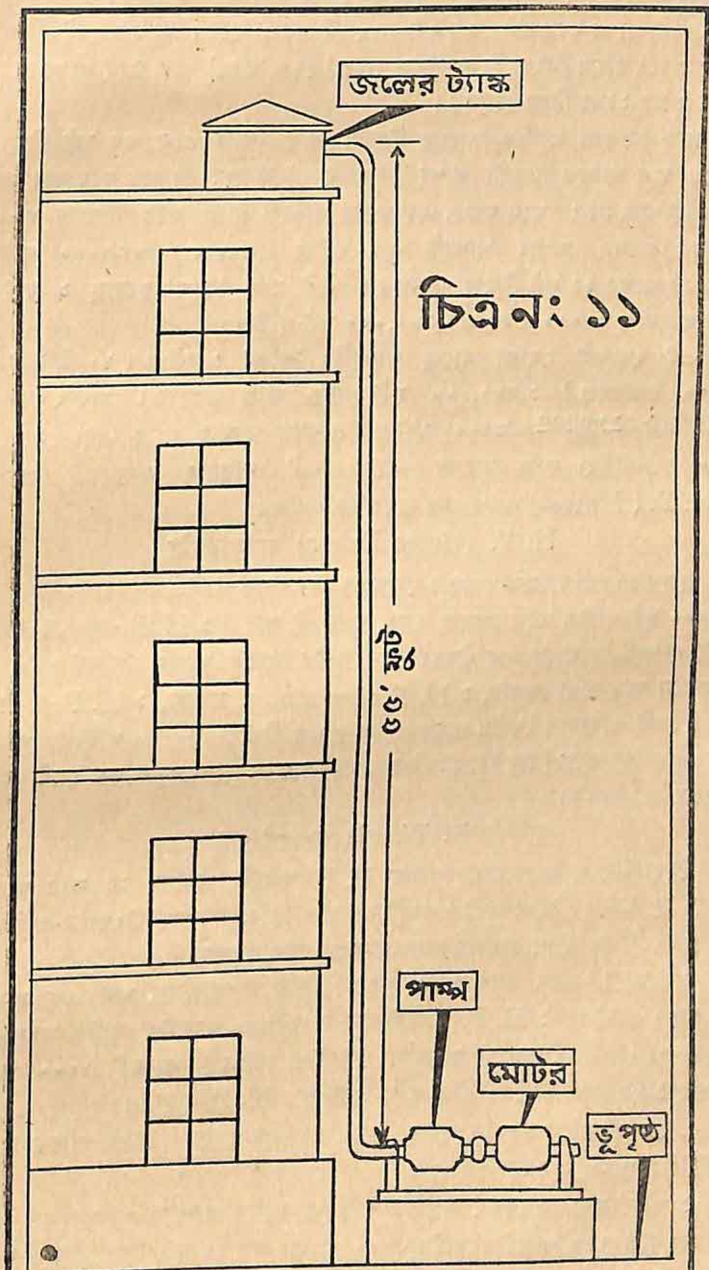
কাজ

দ্রব্যের ওজনের বেলায় আমরা যেমন চাক্ষুষ দেখে, মিলিয়ে মিলিয়ে, তুলনা করে পরিমাণ উপলব্ধি করতে পারি, শক্তির বেলায় কল্পনা ও স্মরণ-শক্তির প্রয়োজনীয়তা একটু বেশী।

প্রথমেই বুঝতে হবে 'শক্তি'র পরিচয় 'কাজ'। অর্থাৎ দ্বিগুণ, তিনগুণ, চতুর্গুণ 'কাজ' দেখে আমরা বুঝি দ্বিগুণ, তিনগুণ, অথবা চতুর্গুণ 'শক্তি' প্রয়োগ করা হয়েছে।

১ টন ওজনকে ১ মাইল বহন করলে ১ 'টন-মাইল' 'কাজ' হয়। কলিকাতা থেকে একটা লরী ৫ টন মাল (লরীর ওজন সুদ্ধ) যদি ১২ মাইল দূরে ব্যারাকপুরে নিয়ে যায়, তা হলে ১২ × ৫ অর্থাৎ ৬০ টন-মাইল কাজ করা হয়।

তেমনি ১ পাউণ্ড ওজনকে ১ ফুট নিয়ে যেতে ১ ফুট-পাউণ্ড কাজ হয়। এই 'এক-ফুট-পাউণ্ড'ই যান্ত্রিক কাজের সচরাচর প্রচলিত 'একক' (unit)। (বৈজ্ঞানিকেরা ও ব্রিটেন, আমেরিকার আওতার বাইরের মানুষেরা, গ্রাম—gramme, সেন্টিমিটার—centimetre সহযোগের একক ব্যবহার করেন)। ১ টন-মাইল কাজ ২২৪০ × ৫২৮০ ফুট-পাউণ্ড কাজের সমান। ছোট ছোট কাজের বেলায় ফুট-পাউণ্ড ব্যবহৃত। কিন্তু রেলওয়ে ট্রেন অথবা জাহাজের কাজের বেলায় 'টন-মাইল' এবং 'ফুট-পাউণ্ড' দুইই ব্যবহৃত হয়। কলিকাতা থেকে বর্ধমান প্রায় ৭২ মাইল অর্থাৎ ৭২ × ৫২৮০ ফুট। ৫ টন মাল এই ৭২ মাইল দূরে নিয়ে যেতে ৩৬০ টন-মাইল কাজ হয়। ফুট-পাউণ্ডে কাজের পরিচয় দিতে হলে অঙ্কটি বৃহদাকার হয়ে যায় অর্থাৎ ৭২ × ৫২৮০ × ৫ × ২২৪০ ফুট-পাউণ্ড। সেই জন্যেই ক্ষুদ্র-বৃহৎ কাজ ভেদে বিভিন্ন এককের প্রয়োজন হয়েছে।



চিত্র নং: ১১

শক্তি

একটা পাম্প যখন জল তোলে তখন সেটি 'কাজ' করে। আবার সেই পাম্পটি যে চালায়, (মানুষ কিংবা ইলেক্‌ট্রিক মোটর) সেও 'কাজ' করে, তাই পাম্প চলে। (পূর্ব পৃষ্ঠায় ১১নং চিত্রে দেখুন)।

চার-পাঁচতলা বাড়ির ছাদের উপরে, ভূমি থেকে প্রায় ৫৫ ফুট উঁচুতে, ট্যাঙ্কে জল ভরতে একটা পাম্প 'কত কাজ' করছে, তা অঙ্ক কষে বার করা মোটেই শক্ত নয়। মনে করুন, এক ঘণ্টায় পাম্পটি ট্যাঙ্ক ভরে দিয়েছে ৩৬০০ গ্যালন জলে। অর্থাৎ পাম্পটি এক ঘণ্টায় ৩৬০০×১০=৩৬০০০ পাউণ্ড ওজনের জলের ৫৫ ফুট উঁচুতে তুলেছে। এই তার 'কাজ' হয়েছে ১ ঘণ্টায়, যার পরিমাণ, ৩৬০০০×৫৫=১,৯৮০,০০০ ফুট-পাউণ্ড।

এই থেকেই বোঝা যাচ্ছে পাম্পটির 'শক্তি' ১ ঘণ্টায় (৬০ মিনিটে বা ৩৬০০ সেকেণ্ডে) ১,৯৮০,০০০ ফুট-পাউণ্ড কাজ করবার। অর্থাৎ পাম্পটি ১ মিনিটে $\frac{১৯৮০০০০}{৬০}$=৩৩০০০ ফুট-পাউণ্ড কাজ করতে পারে এবং সেকেণ্ডে ৫৫০ ফুট-পাউণ্ড কাজ করতে পারে। এই পরিমাণ শক্তিকেই আমরা ১ H. P. (Horse-Power বা অশ্বশক্তি) বলি।

H. P. (Horse Power) বা অশ্বশক্তি

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে যন্ত্র ১ সেকেণ্ডে ৫৫০ ফুট-পাউণ্ড অথবা ১ মিনিটে ৩৩০০০ ফুট-পাউণ্ড কাজ করতে পারে, তাকেই আমরা ১ H. P.-এর যন্ত্র বলি। ওই পাম্পটি চালাতে যে বৈদ্যুতিক মোটর লাগে তারও 'শক্তি' ১ H. P. (এখানে মনে রাখা দরকার, ১ H. P. পাম্প চালাতে, বস্তুতঃ, ১ H. P.-র চেয়ে একটু বেশী শক্তিমান মোটর লাগে। আর জল ট্যাঙ্কে তুলতে পাইপে, পাম্পে ঘর্ষণ প্রভৃতির জন্যে কিছু 'কাজ' নষ্ট হয়, তাই বস্তুতঃ পাম্পকে আরও বেশী কাজ করতে হয়েছিল)।

K. W. (কিলোওয়াট)

বৈদ্যুতিক শক্তির বেলায় আমরা H. P. কথাটি ব্যবহার না করে অনেক সময়ে K. W. (কিলোওয়াট) শব্দটি ব্যবহার করি, বিদ্যুৎ উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট মৌলিক ব্যাপারগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্য।

'কিলো'র মানে হাজার বা সহস্র। 'কিলোওয়াটে'র অর্থ এক হাজার (সহস্র) ওয়াট। ১ H. P.-র মোটর না বলে, ৭৪৬ ওয়াটের মোটর বলা হয়, কারণ ৭৪৬ ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তিই ১ H. P-র সমান। কাজেই ১০০০ ওয়াট অথবা ১ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি প্রায় ১·৩ H. P.-র সমান।

১ ভোল্‌ট চাপে ১ অ্যাম্পেয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে ১ ওয়াট শক্তি লাগে। এইটিই বিদ্যুৎশক্তির একক।

১ ওয়াট কত জোরের বৈদ্যুতিক শক্তি তার বেশ আন্দাজ পাওয়া যায় যখন আমরা বুঝি ৭৪৬ ওয়াটের মোটর ৩৬০০ গ্যালন জল ৫৫ ফুট উচ্চে ট্যাঙ্ক ১ ঘণ্টায় ভরতে পারে; অথবা যখন আমরা জানি আমাদের বড় বড় পাখার একখানি ঘোরাতে প্রায় ৮০ ওয়াট লাগে আর ১০০ ওয়াটে পানের দোকানের উজ্জ্বল বাতির একটি জ্বলে।

বলা হচ্ছে, ৬০% চাহিদার চাপে দামোদর পরিকল্পনায় শেষ পর্যন্ত মোটামুটি ৩ লক্ষ কিলোওয়াট (৩ লক্ষ হাজার ওয়াট অর্থাৎ ৩০ কোটি ওয়াট) বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হবে। শুধু যদি পানের দোকানের উজ্জ্বল বাতি জ্বালানো হয়, তা হলে ওই বিদ্যুৎশক্তি সারা সময় ৩০ লক্ষটি ঐরূপ বাতি জ্বালিয়ে রাখবে। এবং আমাদের উপরোক্ত উদাহরণের ৪।৫-তলা বাড়ির মত প্রায় ৪ লক্ষ (৩·৯ লক্ষ) বাড়ির ছাদের প্রতিটি ট্যাঙ্কে প্রতি ঘণ্টায় ৩৬০০ গ্যালন জল তুলে দেবে।

ওয়াট-এর পরিমাণ বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানে ভোল্‌ট এবং অ্যাম্পায়ারের গুণফল, V × A ; তাই K. W. না লিখে K. V. A.-এও লেখা হয়। আবার ১ হাজার কিলোওয়াট অর্থাৎ ১০০০ K. W. না বলে ১ মিলিয়ন ওয়াট বা ১ M. W.-ও লেখা হয়।

K. W. H. (কিলোওয়াট-আওয়ার বা কিলোওয়াট-ঘণ্টা)
B. T. U. 'ইউনিট'

১০০০ ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি, অর্থাৎ ১ K. W. বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে যখন ১ ঘণ্টা ধরে কাজ নেওয়া হয়, তখনই সেই কাজ করাতে ১ K. W. H. অথবা ১ B. T. U. অথবা ১ 'ইউনিট' শক্তি খরচ হল।

এই ১ ঘণ্টার মাপেই বৈদ্যুতিক শক্তি বাজারে বিক্রয় করা হয়। সচরাচর একেই আমরা 'ইউনিট' বলি। (B. T. U. অর্থাৎ 'বোর্ড অব ট্রেড ইউনিট' কথাটি থেকেই বিলাতের ওই 'ইউনিট' কথাটি বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচলিত হয়েছে আমাদের দেশে)। মিটারে এই 'ইউনিট' মেপেই গৃহে গৃহে বিদ্যুতের দাম আদায় করা হয়।

আমাদের পূর্বোক্ত দোকানের উদাহরণে ১০০ ওয়াটের উজ্জ্বল বাতি যদি কোনদিন ১০ ঘণ্টা জ্বলে (অথবা প্রতিদিন ২ ঘণ্টা জ্বলে ৫ দিনে একুনে ১০ ঘণ্টা হয়) তা হলে ১০০০ ওয়াট-ঘণ্টা (বা কিলোওয়াট-ঘণ্টা), K. W. H. বা ১ ইউনিট বিদ্যুৎশক্তি খরচ করবে। উদাহরণের পাম্পের মোটর ১ ঘণ্টাতেই ০·৭৪৬ ইউনিট অর্থাৎ প্রায় ¾ ইউনিট বিদ্যুৎশক্তি টানবে।

বাতি, পাম্প, জাঁতাকল, বড় বড় কারখানার মোটর প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শহরে 'ইউনিটে'র দাম বিভিন্ন হারে আদায় করা হয়। কোথাও জাঁতাকল, পাম্প প্রভৃতির জন্য ইউনিট মাত্র ১ আনা দরে বিক্রি হয়, কিন্তু বাতির বেলায় ৬ আনা বা ৮ আনা আদায় করা হয়। যে সমস্ত কারণে এই দরের বিভিন্নতা হয় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করবার সময়ে, তা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

পূর্বেই বলেছি, দামোদর পরিকল্পনা ৬০% চাপের চাহিদায় প্রায় ৩ লক্ষ কিলোওয়াট তাপ ও জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করবে শেষ পর্যন্ত। সুতরাং প্রতিদিন, ২৪ ঘণ্টায়, ৩ × ২৪ = ৭২ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে।

মোটামুটি দু আনা হিসাবে ইউনিটের দর ধরলে ৯ লক্ষ টাকার বিদ্যুৎ দৈনিক বিক্রি হবে। যদি বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের 'বাজার' গড়ে তোলা হত, তা হলে এক আনা দরেও ৪½ লক্ষ টাকার দৈনিক বিদ্যুৎ

বিক্রির আয়, ভালো আয় বলেই গণ্য হত। ১ বছরে, সে ক্ষেত্রে আয় হত ৪২/২×৩৬৫=১৬ কোটি ৪২২ লক্ষ টাকা। জলবিদ্যুৎ সরবরাহে চলতি খরচ খুবই কম। তাই দামোদর পরিকল্পনায় পূর্বেকার প্রচার মত জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হলে, শুধু বিদ্যুতের আয় থেকেই ১০ বছরে অন্ততঃ ১০০ কোটি টাকা পরিকল্পনার পুঁজি বাবদ ব্যয়ের দরুন উঠে আসতো। দুঃখের বিষয়, কার্যতঃ দামোদর পরিকল্পনায় শুধু তাপবিদ্যুৎই উৎপাদিত হবে, তার চলতি ব্যয় অত্যধিক, কাজেই সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ অসম্ভব, পরিকল্পনার পুঁজির ব্যয় কখনই উঠে আসবে না।

আগামী ১৫।২০ বছরের মধ্যে দামোদর পরিকল্পনায় ব্যবস্থিত প্রায় ২ লক্ষ কিলোওয়াট তাপবিদ্যুৎ ব্যবহারের 'বাজার' গড়ে উঠবে বলে মনে হচ্ছে না। পরিকল্পনার এইখানেই একটা বিরাট গলদ রয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিল্প গড়ে তোলার ব্যবস্থা আমাদের প্রথম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনায় করা হয় নি। কৃষিকার্যে সেচের কাজেও বিরাট পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রচলিত করাবার সম্ভাবনা ছিল, তাও হয় নি।

আমাদের সমালোচনার ফলে একটা জিনিস লক্ষ্য করে আমরা আরও ক্ষুব্ধ হচ্ছি। সরকারী প্রচার বিভাগ দামোদর পরিকল্পনার লক্ষ্য প্রচার করতে জলবিদ্যুৎ কথাটি প্রায় ছেড়ে দিয়ে শুধু 'বিদ্যুৎ' কথাটি বাবহার করছেন। 'ব্যবহারের ব্যবস্থা হয় নি'—সমালোচনার ফলে সরকার আদপেই উৎপাদনের আয়োজনই বন্ধ রাখতে চেষ্টাশীল বলে মনে হচ্ছে। নানা ওজুহাতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ বিলম্বিত হচ্ছে। প্রায় দুই লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ লক্ষ্যের মধ্যে ছিল, কিন্তু এ পর্যন্ত মাত্র ৮০০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের আয়োজন ডি.ভি.সি. করতে পেরেছেন। তারও মাত্র ২ হাজার K. W. ব্যবহৃত হচ্ছে! 'যন্ত্রপাতি পাওয়া যাচ্ছে না'—ওজুহাতে বাকি উৎপাদন-আয়োজন স্থগিত রাখা হচ্ছে। বোকারোর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ২ লক্ষ K. W. লক্ষ্যের দেড় লক্ষ K. W. বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা শেষ হয়েছে, তথাপি মাত্র ২৮ হাজার K. W. বিদ্যুৎ কার্যতঃ উৎপাদিত হচ্ছে! এই সব থেকেই বোঝা যায়, পরিকল্পনার গলদ কতখানি। 'ঘোড়া হলেই চাবুক হয়' নীতিতে বিশ্বাস করে যাঁরা আশ্বস্ত থাকতে চান এই ভেবে যে এখনও ব্যবস্থা না হয়ে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তো সব ব্যবস্থাই হয়ে যাবে, সুতরাং এত হল্লা করা কেন? হল্লা এই জন্য যে, তার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, তার কোনও আশাও বর্তমান কর্ণধারদের কাছ থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। চাবুক জোগাড় হতে হতে ঘোড়ার প্রাণান্ত হয়ে যাবে। বিশেষতঃ তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি অমর নয়। বরং তাদের ক্ষয়িষ্ণুতা খুবই দ্রুত। বিদ্যুৎ ব্যবহারের ব্যবস্থা হতে হতে আবার নতুন উৎপাদন-যন্ত্রপাতি বসাতে হবে!

ভারতে বিদ্যুৎশক্তির বর্তমান মূল্য

উপরে দু আনা, এক আনা বিদ্যুৎ ইউনিটের মূল্য বলা হয়েছে, শুধু সরলভাবে বোঝবার জন্যই। সাধারণ গৃহস্থ এবং ছোট ছোট ও মাঝারি কলকারখানা এই রকম দামে এবং এর চেয়ে বেশী দামে বিদ্যুৎ কিনতেই বাধ্য বটে!

বর্তমানে ভারতে বিজলীর গড়পড়তা দাম বড় বড় শিল্পের জন্য পৌনে আট পাই এবং ট্রাম কোম্পানি প্রভৃতি পায় পৌনে সাত পাই হিসাবে ইউনিট পিছু। ডি.ভি.সি. কিন্তু আট পাই দরে বিক্রির ব্যবস্থা করছেন। ছোট, মাঝারি কারখানা, সাধারণ কারিগর ও গৃহস্থকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয় নি। কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশকে বর্তমানে ৪৫ হাজার K. W. বিদ্যুৎ বিক্রির চুক্তি হয়েছে আট পাই দরে। তারা চড়াদামে সাধারণ লোককে বেচবে। একসঙ্গে ৩০ হাজার K. W. যারা কিনবে, তাদেরই ডি.ভি.সি. বিদ্যুৎ বেচবে। কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই, চুক্তি অনুযায়ী, পাঁচ বছর পরে ৮৫ হাজার K. W. বিদ্যুৎ নেবে।

পশ্চিমবঙ্গের জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুতের হিসাব

সরকারী হিসাব থেকে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে (দামোদর পরিকল্পনা বাদ দিয়ে) এযাবৎ ৫৩০ হাজার K. W. বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। এই ৫ লক্ষ ৩০ হাজার K. W-এর মধ্যে একা কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই-ই ৪ লক্ষ ৫০ হাজার K. W. বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। দামোদর পরিকল্পনা থেকে পাঁচ বছর পরে ৮৫ হাজার K. W. বিদ্যুৎ সংগ্রহ করবে কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই। দামোদর পরিকল্পনা থেকে আরও বিদ্যুৎশক্তি পশ্চিমবঙ্গে নেবার আয়োজন হচ্ছে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় পাওয়া যাবে ৪ হাজার কিলোওয়াট (K.W. পূর্ব-রেলপথ বৈদ্যুতীকরণের জন্যে বিদ্যুৎশক্তি দরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রস্তাব করেছেন, দুর্গাপুরে ৬০ হাজার K. W. তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র বসাবেন (দামোদর পরিকল্পনায় তাঁদের আস্থা নেই বুঝি?)। উত্তরবঙ্গে জলঢোকা পরিকল্পনা যদি রূপায়িত করা যায়, তা হলে প্রায় ৮।১০ হাজার K.W. জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়বে পশ্চিমবঙ্গে।

সমস্ত ভারতবর্ষে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা হয়েছে ২৩ লক্ষ ৪ হাজার K.W. (তাপবিদ্যুৎ ১৫ লক্ষ ৭৩ হাজার K.W. এবং জলবিদ্যুৎ ৭ লক্ষ ৩১ হাজার K.W.)।

এই থেকে দেখা যাচ্ছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গেই ভারতবর্ষের মোট বিদ্যুতের প্রায় শতকরা ২০।২৫ ভাগ উৎপাদিত হবার ক্ষমতা হয়েছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জলশক্তি ও সেচের জলের হিসাব

জলশক্তির হিসাব

বৃষ্টির জল মাপবার ও নদীর জলপ্রবাহে জলের পরিমাণ মাপবার প্রণালীর পরিচয় ইতিপূর্বে দিয়েছি। এখন বোঝা দরকার, জলের শক্তির কথা। জলের শক্তিকেই রূপান্তরিত করে জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত। জলশক্তি আবার সরাসরিও ব্যবহার করা যায়।

নদীর স্রোতে যখন নৌকা ভেসে যায়, সেটা জলশক্তিরই কাজ। পাহাড়ের জঙ্গলে বড় বড় গুরুভার গাছ কেটে, জলের স্রোতে ভাসিয়ে লোকালয়ে ব্যবহারের জন্য আনা হয় জলশক্তির সাহায্যে।

স্রোতস্বিনী নদীতে বালতি লাগানো চাকা বসিয়ে, স্রোতের তোড়ে ঘুরিয়ে জাঁতাকল চালানো হয় অনেক দেশে। আবার উচ্চতার জন্য জলের চাপ সৃষ্টি হয়, সেই চাপের সাহায্যে হাইড্রলিক প্রেস, হাইড্রলিক ক্রেন প্রভৃতি যন্ত্র চালানো হয়। পাটের গাঁইট বাঁধবার জন্য হাইড্রলিক প্রেসের ব্যবহার অনেকেরই কাছে সুপরিচিত। কলিকাতা বন্দরে অনেকগুলি হাইড্রলিক ক্রেনের সাহায্যে জাহাজে ভারী ভারী মাল বোঝাই অথবা জাহাজ থেকে খালাস করা হয়। এই সব ক্ষেত্রে জলশক্তি রূপান্তরিত না করে সরাসরি ব্যবহার করা হয়।

সমস্ত জলশক্তিরই মূল কারণ উচ্চতার জন্যে জলের 'চাপ' সৃষ্টি। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ফলে উচ্চস্থ জলে চাপ সৃষ্টি হয়। আর এই চাপের ফলেই, সুবিধা পেলে, উপরের জল নিচে নামে, পাহাড়ের গা বেয়ে, জমির ঢাল অবলম্বন করে। একই ঢালের নালায় বর্ষায় যখন জলের গভীরতা (উচ্চতা) বৃদ্ধি হয়ে চাপ বৃদ্ধি হয়, তখন তার গতিও বৃদ্ধি পায়—এটা অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। শুকনার দিনে গঙ্গা-পদ্মার জলের স্রোতের চেয়ে বর্ষায় ভরা গঙ্গার জলের স্রোত যে অনেক বেশী তা সকলেই জানেন। ভাগীরথী-হুগলী নদীতে কোনও একটি ঘাটে জোয়ার শেষ হয়ে গেলে যখন ভাটা পড়তে আরম্ভ করে, তখনই ভাটার টান সর্বাধিক থাকে, ভাটার সময় যখন প্রায় শেষ হয়ে আসে, তখন টান অনেক কম ওই একই ঘাটে। কারণ জলের গভীরতা তখন কমে গিয়েছে, কাজেই চাপ কমে গিয়েছে, তাই গতিও কম হয়েছে। জোয়ারের বেলা ঠিক উলটা, যত সময় উত্তীর্ণ হয়, তত উচ্চতা বাড়ে ও স্রোতের বেগ বাড়ে।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে জলের চাপের শক্তি দিয়ে টারবাইন যন্ত্র ঘোরানো হয়, আর সেই টারবাইনের ধূর (Axle)-এর সঙ্গে সমসূত্রে জেনারেটরের ধূর, তাই জেনারেটর ঘোরে। তার ফলেই কুণ্ডলিপাকানো তারে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। এ কথা পূর্বেই বলেছি। এখন দেখা দরকার ওই টারবাইন ঘোরানোর জলশক্তির পরিমাপ কি ভাবে করা হয়।

পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি ১ H. P.-র পাম্প কেমন করে ৪।৫-তলা বাড়ির ৫৫ ফুট উঁচু ছাদের ট্যাঙ্কে ৩৬০০ গ্যালন (৩৬০০ পাউণ্ড) জল ১ ঘণ্টার মধ্যে

তুলতে পারে, একটি ১ H. P. শক্তির মোটরের সাহায্যে ৭৪৬ ওয়াট বিদ্যুৎশক্তি খরচ করে।

এখন ব্যাপারটা উলটা দিক থেকে ভাবুন। ৫৫ ফুট উপর থেকে ৩৬০০ গ্যালন বা ৩৬০০০ পাউণ্ড জল ট্যাঙ্ক থেকে নিম্নমুখী পাইপের সাহায্যে যদি ১ ঘণ্টার মধ্যে নামানো যায়, তা হলে প্রতি সেকেণ্ডে ১ গ্যালন বা ১০ পাউণ্ড জল নামবে। এই জলের পাইপের শেষ মুখ যদি পাম্পের বদলে টারবাইনের বালতিতে গিয়ে জল ঢেলে দেয়, তা হলে টারবাইন ঘুরবে আর 'মোটর'টাকে ঘোরাবে। এই মোটর এখন জেনারেটর হয়ে গেল আর তাতে ১ ঘণ্টায় ৭৪৬ ওয়াট (১ H. P.) শক্তির বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। সুতরাং বোঝা গেল, জল ৫৫ ফুট উপর থেকে প্রতি সেকেণ্ডে ১ গ্যালন বা ১০ পাউণ্ড হিসাবে নামলে ১ H. P.-র শক্তি সৃষ্টি করতে পারে। উচ্চতায় অবস্থিতির জন্যে জলের মধ্যে 'অন্তর্নিহিত' সুপ্ত (Potential Engergy)-শক্তি থাকে। জল যখন প্রবাহের বেগ পায় তখন এই সুপ্ত-শক্তি বেগ-শক্তিতে (Kinetic Energy) পরিণত হয়। একটা বাঁধের আড়ালে জলাশয়ে যখন জল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তখন ওই বাঁধে আর নদীর তলায় প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। বাঁধে ফুটা (sluice) খুলে দিলে জল বেগে বহির্গত হয়। পিচকারিতে চাপ সৃষ্টি করে জলকে দূরে নিক্ষেপ করা যায় সকলেই জানেন।

জলের উচ্চতা অনুযায়ী তার 'কাজ' করবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ১ গ্যালন বা ১০ পাউণ্ড জল ৫৫ ফুট উঁচু থেকে ৫৫০ ফুট পাউণ্ড কাজের ক্ষমতা রাখে—এটাই তার অন্তর্নিহিত সুপ্ত-শক্তি। আবার $\frac{১}{১০}$ গ্যালন বা ১ পাউণ্ড (মাত্র অর্ধসের) জল যদি ৫৫০ উর্ধ্বে থাকে, তা হলেও তারও ওই ৫৫০ ফুট-পাউণ্ড কাজের ক্ষমতা থাকে। সুতরাং উচ্চতা বৃদ্ধি করতে পারলে অল্প পরিমাণ জলও, উচ্চতার অনুপাত অনুযায়ী, অধিক কাজ করতে পারে। সহজেই বোঝা যাচ্ছে, মাত্র $\frac{১}{১০}$ পাউণ্ড জল ৫৫০০ ফুট (এক মাইলের কিছু বেশী) উপর থেকে যদি প্রতি সেকেণ্ডে নামে, তা হলে ওই ১ ছটাকের কম জলই ১ H. P. শক্তি উৎপাদন করতে পারে। এই কারণে ইউরোপের আল্‌পস পার্বত্য অঞ্চলে, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে জলের অতি উচ্চে অবস্থিতির সুযোগ নিয়ে অল্প জলেও বিপুল জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। মাত্র ১,৪২,০০০ একর-ফুট জলাধারে জল ৪১০০ ফুট (১ মাইলের কিছু কম) উচ্চতা থেকে ৪,৫০,০০০ H. P. জল-বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের সাহায্য করবে অস্ট্রিয়ার গ্লক্‌নার কাপ্রান পরিকল্পনায়। অর্থাৎ দামোদর পরিকল্পনার দ্বিগুণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে যদিও এখানে জলাধার দামোদর পরিকল্পনার জলাধারের সিকি ভাগ ($\frac{১}{৪}$) মাত্র।

দামোদর পরিকল্পনায় মাত্র ১০০।১৫০ ফুট উচ্চচাপে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রস্তাব রয়েছে, কৃত্রিম বাঁধের সাহায্যে (প্রস্তাবিত আইয়ার ড্যাম ২৫০ ফুট উঁচু)। কাজেই বহু পরিমাণ জল ব্যবহৃত হচ্ছে। দামোদর পরিকল্পনার পরামর্শদাতা বিশেষজ্ঞেরা প্রথম থেকেই যে ভাবে সমস্যাটিকে বিচার করেছিলেন, তাতে তাঁরা আনুষঙ্গিক 'তাপবিদ্যুৎ' উৎপাদনেই বেশী ঝোঁক দিয়েছিলেন। দামোদর উপত্যকার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২০০০ ফুট, কাজেই আল্‌পস পার্বত্য এলাকার মত সুউচ্চ চাপে জলবিদ্যুতের সম্ভাবনা এখানে নেই বটে, কিন্তু পাহাড়গুলির

সাহায্যে ৪০০।৫০০।৬০০ ফুট উচ্চতার স্থবিধা পাওয়া যেত ছোট ছোট উপনদী-গুলির প্রবাহে। বিশেষজ্ঞেরা এই উপনদীগুলির জলপ্রবাহের পরিমাণ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ না করেই তাড়াহুড়া করে তাঁদের পরিকল্পনা তৈরি করেন। (অথচ চাতুর্যের সঙ্গে সাফাই লিখে রেখে গিয়েছেন, 'তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে')! দামোদর উপত্যকায় মোট জলের পরিমাণ তাঁদের যথেষ্ট মনে হয় নি এবং শেষ পর্যন্ত প্রচুর 'তাপবিদ্যুৎ' উৎপাদনের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে দিয়েছেন তাঁরা !!

মাত্র ৭।৮টি বড় বড় বাঁধের পরিকল্পনা না করে, উপনদীগুলির অববাহিকার জলের পরিমাণ সঠিক নির্ণয় করে, বহুসংখ্যক উচ্চতর বাঁধের দ্বারা অনেক বেশী জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব ছিল, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায়। সে ক্ষেত্রে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটির মোটেই প্রয়োজন হত না ; আর মূল্যবান জ্বালানি কয়লার অপচয় হত না, অথবা চলতি খরচের আধিক্যে দামোদর পরিকল্পনায় বিদ্যুতের এত উচ্চ মূল্য বাঁধারও প্রয়োজন হত না। কয়লার খনির কয়লা একদিন ফুরিয়ে যাবে, সমঝে বুঝে খরচ না করলে। তা ছাড়া ধাতু ও রসায়ন শিল্পে অপর ব্যবহারেও কয়লার প্রয়োজনীয়তা প্রচুর। ভবিষ্যতে কয়লার অনটন হওয়ারই সম্ভাবনা। বছরে বছরে বৃষ্টিপাত হয়ই, জলের কোনদিন সম্পূর্ণ অভাব হবার সম্ভবনা নেই। জলের খুব স্থষ্ঠু বিজ্ঞান ও অর্থনীতি সম্মত ব্যবহার দামোদর পরিকল্পনায় হয় নি। তাড়াহুড়া ছাড়াও এর কারণ অন্য, অনুসন্ধান করলেই বোঝা যায় সে কথা।

আল্‌পস পর্বত এলাকার মত খুব স্থউচ্চ চাপে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা হিমালয় পর্বত এলাকায় থাকা সম্ভব। তবে, সেসব এলাকা ভারতবর্ষের গণ্ডীর বাইরে তিব্বতে। তবুও, কুশী, তিস্তা, জলঢোকা প্রভৃতি পরিকল্পনা স্থষ্ঠুভাবে করা হলে অপেক্ষাকৃত উচ্চ চাপে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব আমাদের দেশে। এই সব পরিকল্পনায় সমগ্র জল না আবদ্ধ করে শুধু আংশিক জলের সাহায্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চেষ্টা করলেই পরিকল্পনায় ব্যয় অনেক কম হয়।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, জল যেখানে প্রচুর, সেখানে উপযুক্ত অবস্থিতি স্থান পেলে, অল্প উচ্চতার চাপেই অনেক বেশী জল ব্যবহার করে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। উত্তর প্রদেশের গঙ্গাখাল জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা এই নীতিতে কাজ করছে। বাংলার স্থন্দরবন অঞ্চলে, জোয়ারের জল যেখানে ১৮ থেকে ৩০ ফুট উচ্চ হয়, সেখানেও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব।

সেচের জলের হিসাব

খালের সাহায্যে সেচ-ব্যবস্থায় একটি বিশেষ ধরনের জলের হিসাব প্রচলিত আছে। ইংরেজীতে তাকে duty of water বলা হয়, অর্থাৎ সেচের জলের 'কর্তব্য'। এক কিউসেক জলের প্রবাহ কত পরিমাণ জমিতে সেচ দিতে পারে, তাই নির্দেশ করে এই হিসাব।

ভূগর্ভস্থ জলকে অথবা জলাশয়ের জলকে পাম্প দিয়ে তুলে যখন ছোট ছোট ক্ষেতে জলসেচ করা হয় তখন ফসল অনুযায়ী কাঠা পিছু অথবা বিঘা পিছু কত গ্যালন জল তোলা হয়, তাই থেকেই হিসাব জানা যায়। ইঁদারা থেকে দড়ি-

বালতি অথবা 'মোটরে'র সাহায্যে জল তোলার হিসাব গ্যালনে রাখা যায়। এ হিসাব অপেক্ষাকৃত সরল। কিন্তু খালে প্রবাহিত জল যখন স্লুইসের সাহায্যে কৃষিভূমিতে প্রবাহিত করা হয়, তার হিসাব এই 'কর্তব্যে' ধরে রাখা হয়।

খালের জল সাধারণতঃ প্রতি সেকেণ্ডে ৩ থেকে ৫ ফুট গতিতে চলে। সেই জলপ্রবাহ যখন কৃষিক্ষেত্রে প্রবাহিত হয় তখন তার গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১ থেকে ২ ফুট অথবা আরও কম। বিভিন্ন ফসলের উপরই জলের পরিমাণ নির্ভর করে। ধান প্রভৃতি ফসল এক সময়ে অনেক জল চায়। আলু, কপি, সর্ষপ, তুলা, ইক্ষু প্রভৃতির প্রয়োজন বিভিন্ন।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, যেখানে বর্ষার বৃষ্টিপাত প্রচুর, সেখানে সাময়িক অভাব মেটানোর জন্য খালের জল সরবরাহ করে ধান-জমিতে যে জল দেওয়া হয়, সে জমির পরিমাণ খালের প্রতি এক কিউসেক জল-পিছু ৯০ থেকে ১০০ একর। আর অনাবৃষ্টি হলে খালের ১ কিউসেক জলে মাত্র ২০।৩০ একর ধান-জমিতে চাষ হওয়া সম্ভব। রবিশস্যের বেলায় ১ কিউসেক জলের প্রবাহে ২০০ একর জমি চাষ করা যায়। এই জমির পরিমাণগুলিকেই সেচের জলের 'কর্তব্য' বলা হয় (১ কিউসেক পিছু)। অর্থাৎ রবিশস্যে জলের 'কর্তব্য' ২০০ একর, ধানী জমিতে ২০।৩০ থেকে ৯০।১০০ একর।

খালে কত জল প্রবাহিত করাতে হবে, এবং খালের আয়তন, ঢাল প্রভৃতি স্থির করতে হলে, যে শ্রেণীর চাষে সেচ আবশ্যক তা জানা বিশেষ প্রয়োজনীয়। তবেই duty ('কর্তব্য') স্থির করে খালের ডিজাইন করা সম্ভব।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নদী পরিকল্পনার সাধারণ কথা

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা

সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য প্রতি পাঁচ বছরে শিল্প, কৃষি, শক্তি-উৎপাদন, শিক্ষা-ব্যবস্থা, আবাসস্থল, বাস্তু, স্বাস্থ্য, দেশরক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়ের জন্যে ছক তৈরি করে নিয়ে, ব্যয়ের অর্থ বরাদ্দ করে, রাষ্ট্রের তরফ থেকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয় নূতন তন্ত্রে সোভিয়েত দেশে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে। এ রকম ব্যবস্থায় পশ্চাদ্‌পদ দেশের অভাবনীয় উন্নতি বিশ্ববাসীর চোখ খুলে দিয়েছে।

আজকের আমাদের দেশের সরকারী ক্ষমতার কর্ণধারেরা সে দিন সোভিয়েত দেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা, বৃটিশদের সঙ্গে স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রায়ই উল্লেখ করতেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে শাসনক্ষমতা হাতে পেয়ে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁরাও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কাজ শুরু করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে আজও আধা ঔপনিবেশিক অর্থনীতি চলছে, কাজেই সোভিয়েত দেশের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নামটিই শুধু অনুকরণ করে গভর্নমেণ্টের বার্ষিক বাজেট-গুলি পাঁচ বছরের কাঠামোয় ফেলা হয়েছে। আসলে যে আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে, দেশের জনসাধারণের সহযোগিতায়, জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন উন্নতির ব্যবস্থা, তা বর্তমান কাঠামোতে হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রের সরকার তাঁদের আরব্ধ কাজে জনসাধারণের সমর্থন পাচ্ছেন না। জনসাধারণ যে কাজ যে ভাবে চাইছে, সরকার সে কাজ সে ভাবে করতেও সমর্থ অথবা ইচ্ছুক নন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দরুন স্টার্লিং ব্যালান্স ও কিছু সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করেই তাঁদের কাজ শুরু হয়েছে। ফলে আমাদের দেশের শোষণব্যবস্থা ভোল ফিরিয়ে একটা নতুন রূপ নিয়েছে। কাজেই এই কয় বছরে এখনই অবস্থা সঙিন হয়ে উঠছে, সরকারও জনসাধারণের কাছে ঋণের আবেদন করে যথেষ্ট সাড়া পাচ্ছেন না। ১৪৪ ধারা ও অর্ডিনান্সের চাবুক চালিয়ে জনসাধারণের 'কল্যাণে' বাঁধের জন্য জমি সংগ্রহ ও সেচের ব্যবহার করাতে হচ্ছে। কোথাও সাধারণ মানুষের উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না, সরকারী কাজে। অত্যাচারী মোগল বাদশাহেরা যেমন বিরাট দুর্গ, প্রাসাদ, অট্টালিকায় সে যুগের স্মৃতি রেখে গিয়েছেন, আজকের দু-চারটি বড় বড় বাঁধ, শহরের অট্টালিকা প্রভৃতিও তেমনি সাধারণ মানুষের দুর্দশার ভিত্তির উপরে গঠিত ইমারতের নিদর্শন বলেই গণ্য হবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখবন্ধে বলা হয়েছে :

The central objective of planning in India is to raise the standard of living of the people and to open out to them opportunities for a richer and more varied life—ভারতে পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং ধনবত্তর ও বিচিত্রতর জীবনযাত্রার সুযোগসুবিধার পথ খুলে দেওয়া।

কিন্তু কার্যতঃ দেখা যাচ্ছে, ধনীরাই ধনবত্তর হচ্ছেন, আর দরিদ্র জনসাধারণ দরিদ্রতর হচ্ছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিঃস্ব হয়ে ক্রমশঃ সর্বহারায় পরিণত হচ্ছে, সতী নারীর দল বেশ্যার দলে ভিড়ছে। মানুষের কাজ করবারই সুযোগসুবিধা ক্রমশঃ কমে এসে বেকারের দল ভয়াবহরূপে বেড়ে চলেছে। থার্মোমিটার ও ব্যারোমিটার যেমন বায়ুমণ্ডলের তাপ ও চাপের পরিমাণ জানায়, তেমনি ভারত-রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের বর্তমান অবস্থাও দেখাচ্ছে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভারতকে কোথায় নিয়ে ফেলছে। আধা-ঔপনিবেশিক কাঠামোতে শুধু নতুন কায়েমীস্বার্থ সৃষ্টি করে নবরূপে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের পথ ও সুযোগ করে দিচ্ছে।

প্রথম যখন ভারতবর্ষের বিপুল জনবলের সাহায্য না নিয়ে বিদেশ থেকে মাটি কাটা ও জমি চষার যন্ত্রপাতি আনাবার দিকে ঝোঁক দেখা গেল সরকারের, তখনই সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, রাশিয়া বা আমেরিকায় মাথা-পিছু ভূমি অনেক, সেখানে যন্ত্রপাতির যত প্রয়োজন, আমাদের দেশে তত নয়। আমাদের দেশে জমি-পিছু অনেক মাথা, কাজেই জনবলের সাহায্যেই পরিকল্পনার কাজগুলি রূপায়িত করার চেষ্টা করা উচিত। তখন আমার কথায় কর্ণপাত করা হয় নি। কারণ বিদেশী যন্ত্রপাতি ফাঁপানো মূল্যে (inflated price) আমদানি কার্যের মধ্যেই কর্ণধারদের ব্যক্তিগত স্বার্থ বেশী পুষ্টি পেয়েছে, তথাকথিত বৈদেশিক সাহায্যের টোপের সাহায্যে এখানকার মানুষের কষ্টার্জিত ধন রুই-কাতলার মত গেঁথে নিয়ে গিয়েছে সাম্রাজ্যবাদীরা। সেই সব যন্ত্রপাতি অনতি-বিলম্বে অকেজো হয়ে গিয়েছে। আজ কিন্তু চীনের উদাহরণ দেখে (চীনের লোক-সংখ্যার অনুপাতে ভূমি অনেক কম) সরকারী মহল জনবলের সাহায্য নেওয়ার কথা বলতে আরম্ভ করেছেন তাঁদের পরিকল্পনার রূপায়ণে। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন সাধিত না হলে, ভারতবর্ষের জনবল ব্যবহারের যোগ্যতা এঁরা অর্জন করতে পারবেন না, এ কথা জানিয়ে রাখা প্রয়োজন মনে করছি।

সরকারী পরিকল্পনার নীতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এ গ্রন্থে নেই। সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে এইটুকু উল্লেখ করেই ছেড়ে দিচ্ছি। 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' নামটির মোহ আছে, ধূর্তেরা সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করছে।

বাধ্যতামূলক প্রজাসাধারণের পরিশ্রমে জমিদারের বিরাট প্রাসাদ ও বিশাল আম্র-কানন তৈরী হলেও, তার সুখ ও ফলভোগ করে জমিদারই, প্রজারা নয়। যে দেশে প্রজাদেরই সুখ ও ভোগের জন্যে তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় অট্টালিকা ও বাগান তৈরী হয়, সে দেশের কথা আলাদা। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে ইমারত নির্মাণ ও আম্র-কানন পত্তনের সমস্যা ও টেক্‌নিক দুই দেশেই একই। নদী পরিকল্পনার রীতি মূলতঃ সর্ব দেশে ও সর্বকালে একই, যুগে যুগে বিজ্ঞানের দেওয়া নতুন জ্ঞানের সঙ্গে, টেক্‌নিকের উন্নতিতে নতুন পদ্ধতির সঙ্গে, কাজের গতি ও সুষ্ঠুতায় কিছু পার্থক্য দেখা যায় মাত্র। জমিদারের দেওয়া প্রাচীরের সুদৃঢ় বঞ্চনার বাধা ভেঙে ফেলে প্রজারা যেমন একদিন অট্টালিকা ও ফলবাগানের সুখভোগে অংশীদার হতে পারে, তেমনি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে আজকের নদী পরিকল্পনা একদিন হয়তো জনসাধারণের সুখসুবিধার কারণ হবে। তাদের

কাছে সত্যিই 'ধনবত্তর ও বিচিত্রতর জীবনযাত্রার পথ খুলে যাবে'। আমাদের মত ইঞ্জিনিয়ারদের, আজকের দিনে, এটাই একমাত্র সান্ত্বনা হতে পারতো, যদি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দিক থেকে বিচার করলে পরিকল্পনাগুলি সর্বথা সুষ্ঠু দৃঢ়ভিত্তিতে গড়ে উঠছে বলে বিবেচিত হত। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, তাও বলা যায় না আজকের অনেক পরিকল্পনাকে।

বহুমুখী পরিকল্পনার লক্ষ্য

এর আগে বলেছি, প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকলেও, নিছক ব্যবসায়ী দৃষ্টিতে অনেক জলশক্তিই ব্যবহারযোগ্য বিবেচিত হয় না। কিন্তু শক্তিশালী রাষ্ট্র, সুষ্ঠু বহুমুখী পরিকল্পনার (Multipurpose Project) মাধ্যমে, জনসাধারণের হিতার্থে সকল নদীকেই ব্যবহার করতে পারে। কল্পনাশক্তি, বুদ্ধি, অর্থ, উদ্যম প্রভৃতির সম্যক্ ব্যবহারেই অসম্ভবও সম্ভব হয়। তাই আজকের দিনে সাধারণ কল্যাণকামী রাষ্ট্রে (Welfare State) বহুমুখী পরিকল্পনার জন্ম হয়েছে। কল্যাণরাষ্ট্রে সুশিক্ষিত মননশক্তি অপূর্ব উদ্ভাবনী শক্তির জননী।

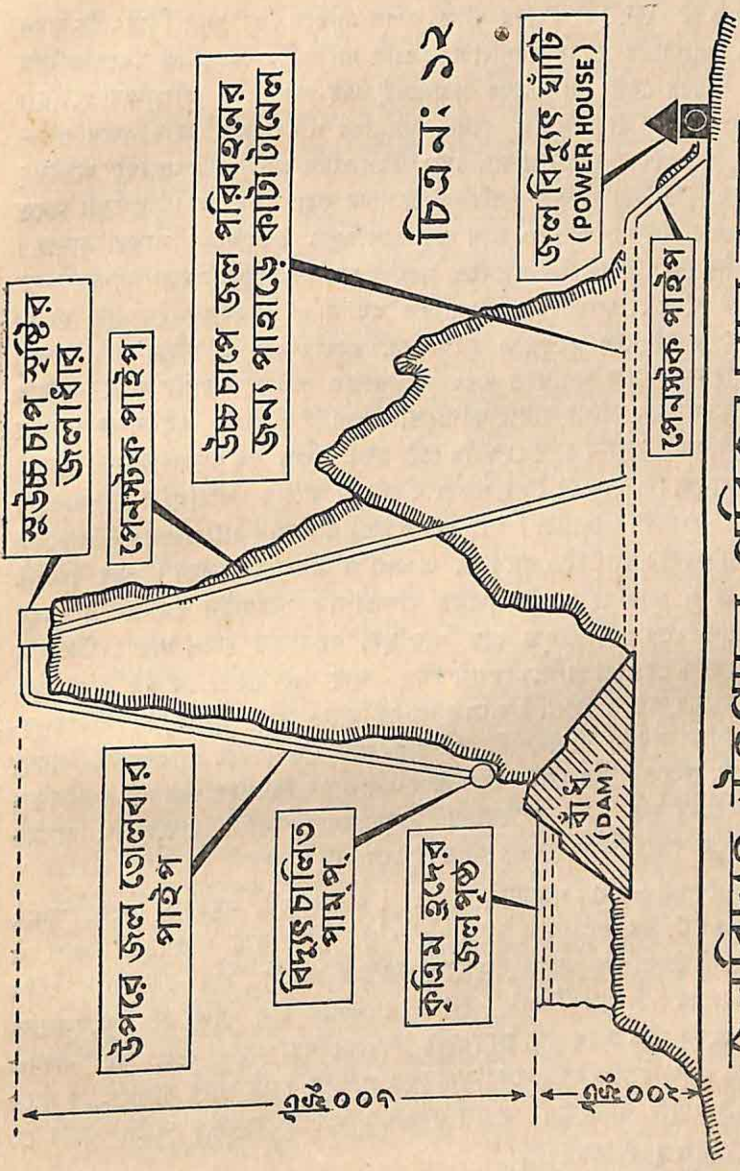
বহুমুখী নদী পরিকল্পনায় লক্ষ্য মোটামুটি নিম্নলিখিত কয় ভাগে বিভক্ত করা যায় :—১] জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, ২] বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ৩] কৃষির উন্নতি ৪] জল-নিষ্কাশণ ও নতুন জমি উঠিত করানো, ৫] মজা-নদীর পুনরুদ্ধার, ৬] নাব্যপ্রণালীর উন্নতি ও সৃষ্টি, ৭] শহরে ও শিল্পে জল সরবরাহ, ৮] মৎস্য-চাষের সুযোগ বৃদ্ধি, ৯] জলক্রীড়া প্রভৃতি আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা, ১০] স্বাস্থ্যনিবাস পত্তন, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি প্রভৃতি।

॥১॥ জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন

জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন (চিত্র নং ১২) ব্যবস্থায় প্রাথমিক ব্যয় অত্যন্ত বেশী। পুঁজির সুদ ধরলে, অনেক ক্ষেত্রেই উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তির মূল্য অত্যন্ত বেশী হয়ে পড়ে। তাই সর্বত্র উপযুক্ত জলশক্তি থাকা সত্ত্বেও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা সম্ভব হত না।

কিন্তু, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষির উন্নতি, নাব্যপ্রণালীর উন্নতি ও সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলির মূল্য যদি ধরা যায় তবে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন একটা **উপরিলাভে** পরিণত হয় দেশের পক্ষে। কিন্তু এই সমস্তগুলি একসঙ্গে করতে যে বিপুল পুঁজি, অর্থের প্রয়োজন, সে অর্থ শুধু শক্তিশালী রাষ্ট্রই সংগ্রহ করতে পারে। রাষ্ট্রকেও এত টাকা সংগ্রহ করতে (যেমন দামোদর পরিকল্পনা আরম্ভ হয়েছিল ৫৫ কোটি টাকার বরাদ্দের উপরে, কিন্তু এখনই ৬০ কোটি টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে, ৪ ভাগও হয় নি, সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত ২০০।২৫০ কোটি টাকা লাগবে এর পিছনে) বেশ বেগ পেতে হয়। অত্যুগ্র উৎসাহে, তাড়াহুড়া করে প্রথম চোটে অর্থ অপব্যয় করে পরিকল্পনার কাজ শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত করাই শক্ত হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশের নদী-উপত্যকা পরিকল্পনায় বিদেশী ঋণ গ্রহণকে আমরা প্রথম থেকেই অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখেছি। সাধ্যাতীত পরিকল্পনা গ্রহণের কোনই প্রয়োজন ছিল না। কারণ, আমাদের সাধ্যের মধ্যেই এমন পরিকল্পনার আয়োজন সম্ভব ছিল, যার সাহায্যে ৫।১০ বছরেই আমরা যথেষ্ট ধনবৃদ্ধি করে



পরিকল্পনা বৃহত্তর করতে পারতাম। আজকের মত 'ল্যাজে-গোবরে' হতে হত না। গত ৫।৬ বছর ধরে আমরা এ কথা বার বার বলছি।

আজ দামোদর পরিকল্পনায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের আয়োজন নানা ওজুহাতে 'স্থগিত' রাখা হচ্ছে, যদিও ব্যয়বহুল বাঁধের কিছু কিছু হয়ে গিয়েছে। বোকারোতে অনর্থক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনা করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তাই ১০।২০ বছরের জন্যে পেছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই তাপবিদ্যুৎ

(২ লক্ষ K. W.) বিতরণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না হলে তো আর বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃথা। আমাদের দেশের জনসাধারণের প্রতি দায়িত্বহীন বৈজ্ঞানিক 'বিশেষজ্ঞ'দের আর তাদের দেশীয় দালালদের পরামর্শেই এই অসমীচীন কাজ করা হয়েছে। তাড়াহুড়া করে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন, দামোদর পরিকল্পনায় বর্ষার সময়ে প্লাবন সৃষ্টির জল থাকলেও, পর্যাপ্ত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে যথেষ্ট জলেরই অভাব! সারা বছর চাহিদা মাফিক জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব নয়। সুতরাং সমস্ত বিদ্যুতের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ শুধু তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে। পৃথিবীর কোথাও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহের বাৎসরিক সমতা রাখতে এত অধিক পরিমাণে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় না। পৃথিবীতে কোথাও হয় না বলেই যে আমাদের দেশেও এ ব্যবস্থা ভুল, আমার শুধু এ যুক্তি নয়। কয়লা উৎপাদনের অঞ্চলে অবস্থিতি এবং অপেক্ষাকৃত খারাপ কয়লার গুঁড়া ব্যবহার করা যাবে এমন বয়লার বসিয়ে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে, এই যুক্তি দেখিয়ে বোকারোর বোকামি চাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়। কিন্তু ওই খারাপ কয়লার গুঁড়ার সঙ্গে হয়তো বিশেষভাবে বৈদেশিক স্বার্থ জড়িত আছে। খারাপ কয়লা ব্যবহার করলে বয়লারের (boiler) আয়ু অনেক কমে যায় আর efficiencyও কিছুতেই ভালো কয়লার মত দিতে পারে না, এ কথা অবিসংবাদিত সত্য। শুধু বিদেশী বয়লার ও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের বাষ্পচালিত টারবাইন জেনারেটর যেসব যন্ত্রপাতি দেশান্তরে উদ্বৃত্ত হয়ে পড়েছিল, আমাদের দেশে অন্যায় উচ্চমূল্যে তাড়াতাড়ি সেগুলো চালিয়ে দেওয়া হল। অথচ এই কেন্দ্র থেকেও তাপবিদ্যুৎ পরিবহনের অন্যান্য যন্ত্রপাতি আজও পাওয়া যাচ্ছে না! (সম্প্রতি সোনারপুর-আরাপাঁচ অঞ্চলে জলনিকাশী ব্যবস্থার জন্যে যে বিদ্যুৎ পরিবহনের ব্যবস্থা হয়েছে, শুনতে পাচ্ছি, সেই বিদ্যুৎ গ্রাম এলাকায় সরবরাহের কথা আছে। কিন্তু পরিবহনের জন্য এমন আয়তনের ট্রান্সফরমার বসানো হয়েছে যে, গ্রামের লোককে সস্তায় বিদ্যুৎ দেওয়া অসম্ভবই হবে)।

পরেশনাথ-তুণ্ডি পাহাড়ের উচ্চতা (৪,৪৮০ ফুট, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে, অর্থাৎ ২,০০০ ফুট উচ্চ উপত্যকার উপরে ২,৪৮০ ফুট), পঞ্চকোট পাহাড়ের উচ্চতা ও দামোদর উপত্যকায় অন্যান্য পাহাড়ের উচ্চতার সুযোগ নিয়ে সুউচ্চ-চাপ সৃষ্টির জলাধারের (Surge Tank) সাহায্যে পেনস্টককে চাপ বৃদ্ধি করে অপেক্ষাকৃত কম জলেই উচ্চ চাপে সস্তা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব ছিল এবং এখনও আছে। ভবিষ্যতে দামোদরের জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা এই ভাবে সংস্কৃত হতে পারে বলেই আমার অভিমত। খারাপ কয়লারও অন্যান্য ব্যবহার আছে—আর সে প্রয়োজনও খুবই অগ্রগণ্য।

জলবিদ্যুৎ সম্বন্ধে প্রধান কথা হচ্ছে, একবার এর প্রথম আয়োজন হয়ে গেলে, এর উৎপাদনের দরুন চলিত ব্যয় অত্যন্ত অল্প। সুতরাং সুষ্ঠু পরিকল্পনায় জলবিদ্যুৎ নামমাত্র মূল্যে বিলি করা যায় দেশের শিল্প, কৃষি, পরিবহন প্রভৃতির উন্নতি জন্য। আজ যে দামোদর পরিকল্পনার বিদ্যুৎ নামমাত্র মূল্যে পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে শুধু পরিকল্পনায় সুষ্ঠুতার অভাবে। এলুমিনিয়ম, লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি ধাতু উৎপাদন-শিল্পে যদি খুব কম মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ

না করা যায়, তা হলে আমাদের দেশে ওই সব শিল্পজাত, পৃথিবীর বাজারের তুলনায়, অত্যন্ত চড়া মূল্যেরই হবে। যেসব দেশের কাছে আমরা আজ এলুমিনিয়ম প্রভৃতির জন্যে পরমুখাপেক্ষী, মজার কথা এই যে, সেই সব দেশের বিশেষজ্ঞরাই আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধারদের পরামর্শদাতা হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁরা এমন পরামর্শ দিয়ে এমন ব্যবস্থা করিয়েছেন যে, আমাদের দেশে আজ স্বল্প মূল্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না, আর আমাদের বহুযুগ পর্যন্ত ওই সব দেশের উপরই ওই সব শিল্পজাত ধাতুর জন্যে মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। নিছক কল্পনা ও অনুমানের উপর নির্ভর করে আমি এ সব কথা বলছি, মনে করলে ভুল হবে। বৃহৎ বৃহৎ শিল্প, বিশেষতঃ বিদ্যুৎ শিল্পের কার্টেলের কথা কর্মজীবনে দেশবিদেশে ব্যক্তিগতভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছি। ছলে, কৌশলে, যুদ্ধবলে, পৃথিবীর বাজার চিরদিনের জন্যে করায়ত্ত রাখার গভীর ষড়যন্ত্রে তীক্ষ্ণধী-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সহযোগিতা তাদের একচেটিয়া। আজ যে আমরা তাদেরই খপ্পরে পড়ে গিয়েছি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই আজ দামোদর নদী পরিকল্পনায় বহু বিঘোষিত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিবর্তে তাপবিদ্যুৎ দেখছি। সামান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিরাট বাঁধে অর্থ অপচয় করে দেড় হাজার মাইল খাল কাটা হয়েছে, কৃষিক্ষেত্রে সেচ-ব্যবস্থার জন্য, যার কোনই প্রয়োজন ছিল না। একবার এইভাবে কৃষিকার্যে দামোদর নদের জলের ব্যবহার কায়েমীস্বার্থে পর্যবসিত করতে পারলে, দেশের লোকের একটা অংশই আবার জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে দামোদরের জল ব্যবহার করতে বাধা দেবে! সাধে কি সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ধুরন্ধররা 'কৃষির উন্নতি'র অবস্থা দেখে বর্তমান সরকারের সুখ্যাতি ঘোষণায় পঞ্চমুখ হয়েছেন !! কোনও দেশকে একবার কৃষিভিত্তিক আধা-ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে বাঁধতে পারলে, সে দেশে এই রকমে, 'শিল্পীকরণ' (industrialise) অসাধ্য হয়ে যায়।

এরা আজ 'সুপরামর্শ' দানের নাম করে নিজেদের স্বার্থপুষ্টি করার জন্য চাতুর্য, ছলনা, ভণ্ডামি, তোষামোদি প্রভৃতি সমস্ত অস্ত্রই প্রয়োগ করছে আমাদের দেশে।

বিজ্ঞান ও টেক্‌নিকের সাহায্য সর্ব দেশ থেকে সর্বভাবেই কাম্য—কিন্তু **মূল-পরিকল্পনায়** বিদেশীয় বুদ্ধি গ্রহণ করলে আমরা ঠকতে বাধ্য। তার জন্য আমাদের দেশে সুশিক্ষিত মননশীল পরিকল্পকের অভাব নেই। কিন্তু সরকারী পরিকল্পনার নীতি-নির্ধারণে দেশের মননশীল সম্বুদ্ধগণের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে বিদেশী ঠগদের পরামর্শ ই গ্রহণ করা হয়েছে।

দামোদর পরিকল্পনাকে দেশের সত্যিকারের স্বার্থে নিযুক্ত করতে হলে এর খালের সাহায্যে সেচ-ব্যবস্থাকে এখনই নাকচ করা উচিত। জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা-গুলি মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করে নতুন বুদ্ধিতে সুসংস্কৃত করতে হবে। অতি সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহই হওয়া উচিত দামোদর পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য। আর সে বিদ্যুৎ কৃষি, শিল্প প্রভৃতিতে যাতে সুষ্টুভাবে পরিপূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়, তার জন্যে সমস্ত আয়োজন সর্বাগ্রে করা উচিত।

শুধু দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার জলবিদ্যুৎ সম্বন্ধে যা বলা হল, তা অন্যান্য নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার সম্বন্ধেও প্রায় সমানভাবে প্রযোজ্য। বস্তুতঃ নদী-উপত্যকা পরিকল্পনায় বহুমুখী লক্ষ্যের মাধ্যমে জলবিদ্যুৎ প্রায় বিনামূল্যে সরবরাহ

করা যায়। দামোদর পরিকল্পনায় সমগ্র ব্যয়ের শতকরা ৫৮ ভাগ বহন করছে পশ্চিমবঙ্গ, কাজেই এর মারফত বাংলা দেশের লাভ-ক্ষতি বুঝে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক বাঙালীই অনুভব করবেন।

॥২॥ বন্যা নিয়ন্ত্রণ

নদীতীরে বসবাস স্থবিধাজনক দেখে মানুষ যেমন এক দিকে নদীতীরে বসতি স্থাপন করেছে (মরুভূমিতে অথবা পাহাড়ের মাথায় নয়), তেমনি অপর দিকে নদীর বন্যা চেষ্টা করেছে মানুষের সে বসতি উচ্ছেদ করতে। নদীর প্লাবনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যুগে যুগে মানুষ নানা পন্থা অবলম্বন করেছে। প্লাবনের বৈজ্ঞানিক কারণ সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই এক পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। এখানে শুধু নিয়ন্ত্রণের কথাই বলবো।

বর্তমান যুগের বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার জন্ম হয়েছে প্রধানতঃ মানুষের বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা থেকে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও টেক্‌নিকের ঔৎকর্ষ ও সামাজিক জীবনযাপনের নতুন সূত্র আবিষ্কারই এ যুগের মানুষকে সাহায্য করেছে বন্যার জলকে আয়ত্তে এনে বহুমুখী পরিকল্পনায় ব্যবহার করতে।

কিন্তু বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রথম পদ্ধতি নিশ্চয়ই নদীর দুই তীরে সমান্তরাল বাঁধ (embankment)। আদিম যুগে বন্যার কবল থেকে ধনপ্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে করতে মানুষ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিল নদীর তীরে বন্যার পরে স্বাভাবিক ভাবেই বাঁধ (natural levees) গড়ে ওঠে, আর সেই বাঁধ জল উপচিয়ে পড়া রোধ করে। প্রথম হয়তো এই স্বাভাবিক বাঁধগুলিকে মাটি দিয়ে উচ্চতর করে তাদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করেছিল কোনও বুদ্ধিমান মানব-গোষ্ঠী। সুপ্রাচীন কালে নদীর দুই পাড়ে সমান্তরাল মাটির বাঁধ (embankment) বেঁধে দেওয়াই বন্যার প্রকোপ থেকে জনপদ রক্ষার একমাত্র উপায় বলে বিবেচিত হয়েছিল। বন্যা নিয়ন্ত্রণের অপরাপর পদ্ধতি ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করেছে আর শেষপর্যন্ত উচ্চ আড়াআড়ি বাঁধের (Dam) সৃষ্টি হয়েছে। এই উচ্চ আড়াআড়ি বাঁধে নদীর উচ্চ অববাহিকা এলাকায় বৃষ্টিজল কৃত্রিম হ্রদে অবরুদ্ধ করা হয় আর সেই জল নিয়ন্ত্রিতরূপে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ প্রভৃতি বহুমুখী কল্যাণের কাজে ব্যবহৃত হয়। এইরূপে আধুনিক কালে বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাই নদী-উপত্যকায় বহুমুখী পরিকল্পনার জন্ম দিয়েছে। সোভিয়েত দেশ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত তাঁদের দেশে বহুমুখী পরিকল্পনার প্রচলন করেন। টেনেসি ও মিসিসিপির বন্যা নিয়ন্ত্রণে টেনেসি ভ্যালি পরিকল্পনা খুবই সাফল্য অর্জন করেছে। আমাদের দেশের বর্তমান নদী-উপত্যকা পরিকল্পনাগুলি, বিশেষতঃ দামোদর পরিকল্পনা, ওই টেনেসি পরিকল্পনা থেকেই প্রেরণা পেয়েছে। আবার অন্ধ অনুকরণের ফলে কতকগুলি বিশ্রী সমস্যারও সৃষ্টি করেছে।

আমেরিকার টেনেসি-মিসিসিপি, উড়িষ্যার মহানদী, পশ্চিমবঙ্গের দামোদর, চীনের হোয়াংহো ও ইয়াংসি, সোভিয়েত দেশের শিরদরিয়া, আমুদরিয়া প্রভৃতি নদী এবং ইউরোপের পো, রাইন, ডন, ড্যানিয়ুব, ভল্‌গা প্রভৃতি নদী তাদের বন্যার ধ্বংসলীলার জন্যে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত। পশ্চিমবঙ্গে উত্তরাঞ্চলের হিমালয়জাত

নদীগুলি সর্বনাশা বন্যায় দেশের জনপদের কি ক্ষতি করে, তা আমাদের অনেকেরই জানা আছে। কারণ, আমাদের অনেকেই সেই সব বন্যার ক্ষয়ক্ষতিতে ভুক্তভোগী। বিহারের শোন, কুশী, গণ্ডক ও আসামের ব্রহ্মপুত্র ও উপনদীগুলির বিধ্বংসী লীলার কথা আজ আর কারও অবিদিত নেই।

কিন্তু নদীর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা জানেন, সব নদীতেই বন্যা হয় না। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশের নদীগুলির মধ্যে দামোদরের বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণই কিছু বেশী ছিল। অন্যান্য নদীগুলির উচ্চ অববাহিকা খুব বিস্তৃত নয়, কাজেই তাদের বন্যার প্লাবন গুরুতর নয়। তা ছাড়া বন্যার জলের বাহিত পলির প্রকৃতি ও পরিমাণ এবং নদীর ঢালের প্রকৃতি বিশেষভাবে নদীর খাতের স্বরূপ নির্ধারণ করে, যার ফলে উচ্চ অববাহিকার স্বল্প জলেও নদীর 'প্লাবন-তলে' (flood plain) প্লাবনের সৃষ্টি করতে পারে। উত্তরবঙ্গের হিমালয়জাত নদীগুলি তাদের বিশিষ্ট প্রকৃতির জন্যই বিশেষভাবে প্লাবন-প্রবণ। আর একটু চিন্তা করলে এ কথা বোঝাও শক্ত নয় যে, বিভিন্ন নদীর প্রকৃতি অনুযায়ী তার বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। একপ্রকার পদ্ধতিতে এক এক শ্রেণীর নদীর 'প্লাবন-তলে' বন্যা নিয়ন্ত্রিত করা যায়, অন্য শ্রেণীর নদীর পক্ষে অন্য পদ্ধতি অবলম্বনীয়।

তা ছাড়া যে অঞ্চলে নদী প্রবাহিত হচ্ছে, সেখানে মানুষ বসতির ঘনতা ও সম্পদের উপরই বন্যা নিয়ন্ত্রণের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ভর করে। তাই দামোদরের বন্যা খুব স্বল্প পরিমাণ জমি অল্প সময়ের জন্য ডুবিয়েই পূর্বকালের কুশী-তিস্তার মহাপ্লাবনের চেয়ে বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। কুশী, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় হাজার হাজার বর্গমাইলে যুগ যুগ ধরে প্লাবনের ধ্বংস ও সৃষ্টিলীলা চলেছে, কিন্তু আধুনিক কালে বসতি ও সম্পদের দাবির ফলেই এতদিনে ওই সব নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের কথা উঠেছে। কলিকাতা শহরের সঙ্গে উত্তর ভারতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারতো বলে দামোদরের সামান্য বন্যাও পূর্বকালে অনেক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। উত্তরবঙ্গের আত্রেয়ীর বন্যা গত বিশের দশকে দার্জিলিং-এর সংযোগ ছিন্ন করে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

বন্যাপ্রবণ নদীগুলিতে প্লাবন একটি স্বাভাবিক ঘটনা। কেউ কেউ ভ্রান্ত ধারণার প্রচার করেন, নদী-উপত্যকায় মানুষের ক্রিয়াকলাপই বুঝি নদীর স্বাভাবিক কাজে বাধা দিয়ে বন্যা ও প্লাবনের সৃষ্টি করেছে। এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। নদী-উপত্যকায় মানুষের বসতির ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে উপযুক্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণের অভাবে অথবা পরাজয়ে। কিন্তু মানুষের নদী-শাসনের কাজগুলিই নদীর স্বাভাবিক বন্যাপ্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস করতে পেরেছে। যেখানে এই সব শাসনের কাজ হয় নি, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত জনবিরল পার্বত্য ও বন্য অঞ্চলে, প্রাকৃতিক নিয়মে সেখানেও বন্যাপ্রবণ নদীতে ভীষণ প্লাবন হয়, বনের পশু ও অসহায় অল্প সভ্য মানুষের প্রাণ হানি করে। মানুষ বন্যা নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করবার আগে অনেক নদী তার স্বাভাবিক কাজে বার বার খাত পরিবর্তন করেছে। প্রত্যেক নদীর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানসম্মত সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির নদী-শাসনের কাজ দিয়েই মানুষ বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

পূর্বেই বলেছি, বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাচীনতম পদ্ধতি হল নদীর দুই পাড়ে সমান্তরাল মাটির বাঁধ (embankment) বেঁধে দেওয়া। প্রাচীনকালে এই পদ্ধতিই বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় বলে বিবেচিত হয়েছিল। বন্যার জল এই সমান্তরাল বাঁধের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে প্রবাহিত হয়। তার ফলে বন্যা কমে আসবার সময়ে, বাহিত পলি নদীগর্ভেই অবক্ষিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে, আর গর্ভটিকে ক্রমশঃ উঁচু করেছে। এইরূপে নদীর খাত জমা-পলিতে উচ্চতর হয়ে যাওয়ায় পরবর্তী বন্যা ওই সমান্তরাল বাঁধের চেয়ে উচ্চতর হয়েছে ; কাজেই ওই বাঁধ আরও উঁচু করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এইভাবে নদীর গর্ভ উঁচু হতে হতে ক্রমশঃ দুই পাশের ভূভাগ থেকেও উঁচু হয়ে গিয়েছে। কাজেই হঠাৎ কোনও বছর বাঁধ ভাঙলে ভীষণতর বন্যা ধ্বংসলীলা সাধন করেছে ওই বন্যাপ্রবণ নদী-উপত্যকায়। তবুও আজ এই রকম বাঁধের রক্ষাকবচের সাহায্যেই চীনারা হোয়াংহো অববাহিকায় যে ভূভাগে চাষবাস-বসতি করে জীবনধারণ করতে বাধ্য, সে ভূভাগের পরিমাণ সম্পূর্ণ ইংলণ্ড দেশটির চেয়ে কম নয়। চীনের সমান্তরাল বাঁধই হয়তো পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম বন্যা নিয়ন্ত্রণের বাঁধ। এই বাঁধ বোধ করি স্মরণাতীত কালেই প্রথম দেওয়া হয়েছে, অববাহিকার জনপদ রক্ষা করবার জন্য। তখন নদী সম্বন্ধে জ্ঞান বিজ্ঞানের পর্যায়ে ওঠে নি, কাজেই চীনাদের উপায়ান্তর ছিল না। মাঝে মাঝে এই বাঁধ ভেঙে অকস্মাৎ ভীষণ প্লাবনে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। বাঁধকে আরও উচ্চতর করে 'গড়ে' তোলা হয়েছে। কিন্তু বন্যার বিভীষিকার হাত থেকে হোয়াংহো উপত্যকায় আজও চীনারা নিষ্কৃতি পায় নি। চীনের ইয়াংসির বাঁধ আজ প্রায় ১০০ ফুট উঁচু হয়ে গিয়েছে। বর্তমান বৎসরের বন্যার সঙ্গে যুঝতে চীনারা সদাসতর্ক গণতান্ত্রিক গভর্নমেন্টের সহযোগিতায় লক্ষ লক্ষ জনবল নিযুক্ত করেছিল। আমেরিকায় মিসিসিপি নদীর বন্যাও এই রকম সমান্তরাল বাঁধে নিয়ন্ত্রিত হত, আবার মাঝে মাঝে ভেঙে গিয়ে বিধ্বংসী প্লাবনের সৃষ্টি করতো। মিসিসিপির উপনদী টেনেসি নদী পরিকল্পনার মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণের সুষ্ঠু পদ্ধতি অবলম্বিত হচ্ছে। তা ছাড়া, নদী-শাসনের কাজে মিসিসিপির খাত সরলায়িত ও গভীরতর করবার চেষ্টাও আরম্ভ হয়েছে।

এই রকম সমান্তরাল বাঁধ দামোদরেও বোধ হয় ২।৩ হাজার বছর পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল। সে বাঁধও ক্রমশঃ উচ্চতর করতে হয়েছিল। তবুও মাঝে মাঝে ভেঙে গিয়ে প্লাবনের জলে বর্ধমান ও হুগলী জেলায় ক্ষতি করেছে।

সুন্দরবনে এই রকম বাঁধ আর ভেড়ি এবং জলনিকাশ খালের সাহায্যে উত্থিত করানোর কাজ শুরু হয়েছে, হাজার হাজার বছর পূর্বে। হল্যাণ্ডেও এই রকম বাঁধ ও জলনিকাশের জন্যে পাম্পের ব্যবহার সে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভূভাগ রক্ষা করে। জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে জমি উত্থিত করার কাজে এই রকম বাঁধের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। নদীর ধারের শহরের নিম্নাংশ (বিশেষতঃ যেসব নদী যে অংশে খাত পরিবর্তন করে না) এই রকম মাটির বাঁধ দিয়ে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা অনেক ক্ষেত্রে বেশ সুষ্ঠু পদ্ধতি। বিহারের পাটনা শহরের একাংশ গঙ্গার বন্যা থেকে এবং রাজশাহী শহরের

একাংশ পদ্মার বন্যা থেকে এইরূপে সুষ্ঠুভাবেই রক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু সম্প্রতি বিহারের কুশী নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য এই রকম সমান্তরাল বাঁধ নির্মাণ করবার যে পরিকল্পনা হয়েছে, তা খুব বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে বলে অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করতে পারছেন না। কুশী হিমালয়ের উচ্চ অববাহিকা থেকে যে প্রচুর শিলাখণ্ড ও পলি আনে বন্যার জলের সঙ্গে, সেই পলি তার খাতে জমা হয়ে শীঘ্রই এই বাঁধকে অকেজো করে ফেলবে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক নদীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য আর একটি সুষ্ঠু পদ্ধতি হল নতুন নতুন খালে উদ্বৃত্ত জল ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া। বারানসী শহরকে গঙ্গার বন্যার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য আমাদের দেশে প্রাচীনকালে এই পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছিল। বরুণা ও অসি বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কাটা-খাল ছাড়া আর কিছু নয়, অনেক বিশেষজ্ঞের এই অভিমত। এই খাল দুটির উপচানো জলের সেচ-ব্যবস্থা কাশীরাজ্যে কৃষিকার্যে নিশ্চয়তা এনে 'অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার' সৃষ্টি করেছে। আমাদের দেশে এই সুপ্রাচীন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত সুন্দর কাজ দিচ্ছে।

আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে 'আসাম ট্রিবিউন' পত্রিকায় আমি একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলাম; সমান্তরাল খালের নাব্যপ্রণালীর জাল সৃষ্টি করে ব্রহ্মপুত্রের বন্যার অতিরিক্ত জল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিলে বন্যার প্রকোপ হ্রাস পাবে,—আমার প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় তারই বিবরণ ছিল; বন্যা শুধু জলই বহন করে আনে না, বাহিত পলি নদীর খাতে জমা হয়েই প্লাবনের কারণ ঘটায়। আমার প্রস্তাবিত এই নাব্যখালের জলের সাহায্যে এই বন্যা-বাহিত পলি দেশময় নিম্নভূমিতে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। সচরাচর খালগুলি নাব্য কার্যেই ব্যবহৃত হবে, বন্যার সময়ে উদ্বৃত্ত জল তাদের পথে ঘুরানো-ফিরানো ও নিয়ন্ত্রিতভাবে উপচানোর ব্যবস্থা থাকবে। সংখ্যায় ও দৈর্ঘ্যে যথেষ্ট খাল-পথের পত্তন করতে পারলে আসামের বন্যা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত করা যায় এই পদ্ধতিতে। আর্থিক সামর্থ্য ও সময় অনুকূল হলে যখন ব্রহ্মপুত্রের কোনও কোনও উপনদীতে উচ্চ আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি নদী-উপত্যাকার বহুমুখী পরিকল্পনা গৃহীত হবে, তখন এই নাব্যখালগুলিকে সেই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা মোটেই শক্ত হবে না।

উক্ত পরিকল্পনা 'আসাম ট্রিবিউনে' প্রকাশিত হবার পরে আমি ভারত-গভর্নমেণ্টের কাছেও পাঠাই। গত বছর (১৯৫৩) কলিকাতায় 'স্বাধীনতা' পত্রিকা আমার পরিকল্পনাটি প্রকাশ করেছিলেন। অনুরূপ উপায়ে এবং কিছু কিছু নদীর খাত উন্নয়ন করে বন্যার প্রকোপ কমানোই উত্তরবিহার, উত্তরবঙ্গ ও আসামের বন্যা-সমস্যা সমাধানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলেই আমি মনে করি।

সম্প্রতি মিঃ এস. সি. মজুমদারের গঙ্গা-গ্যারেজ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, লক্ষ্য করলাম, তার মধ্যে আমার উক্ত ব্রহ্মপুত্রের বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে গঙ্গা-তিস্তা যুক্ত করবার যে নাব্যখালের নির্দেশ দিয়েছি, সেইরূপ খাল কাটা তিনি সমর্থন করেছেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে আমি যখন উক্ত প্রস্তাব ভারত গভর্নমেণ্টের কাছে পাঠাই তখন তিনি CWINC-এর সঙ্গে

সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাই সম্ভবতঃ আমার প্রস্তাবিত এই গঙ্গা-তিস্তার খালটি তাঁর মনে ধরেছিল।

পৃথিবীর মধ্যে ফ্রান্সে পূর্তবিদ্যা খুবই উন্নত। যদিও দেশটি আমাদের অখণ্ড বাংলা দেশের চেয়ে সামান্যই বড়, তথাপি প্রায় ৪০ হাজার মাইল নাব্য জলপথ রয়েছে ওই দেশে। ফলে ফ্রান্সে বন্যার প্রকোপের কথা শোনা যায় না। রাস্তা, রেলপথ, এরোড্রোম প্রভৃতি পূর্ত কাজগুলি যেমন মেরামত করে সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, ফ্রান্সে এই নাব্যখালগুলিও তেমনি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। আমাদের দেশে এ যাবৎ নদীর স্বাভাবিক জলপথও মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কোনই ব্যবস্থা হয় নি, সেই কারণে বন্যার প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কোনও কোনও নদীতে বন্যার ধ্বংস-লীলার প্রকোপ কমাবার জন্য তৃতীয় পদ্ধতি হল নদীর খাতে আড়াআড়িভাবে নিচু বাঁধ (ব্যারেজ) নির্মাণ। এইরূপ ব্যারেজের সাহায্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ-ব্যবস্থার ফলে বৃষ্টি-বিরল মিশরের নীল নদের ও সিন্ধু দেশের সিন্ধু নদের নিম্নভূমিতে বন্যার জল ক্ষতি না করে বরং উপকারই করে। কিন্তু এই পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ ও খালের সাহায্যে সেচ-কার্যের ব্যবস্থা উত্তর-পূর্ব ভারতের নদীগুলির বন্যা সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। উচ্চ অববাহিকায় আকস্মিক প্রচুর বৃষ্টিপাতের জল সুষ্ঠুভাবে নিকাশ করা 'সেচের খালের' কর্ম নয়। আমার প্রস্তাবিত নাব্যখাল-পথের জালই শুধু সে কাজ করতে পারে।

নানারূপ নদী-শাসন প্রক্রিয়ায় নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করেও কোনও কোনও নদীর বন্যাপ্রবণতা কমানো যায়। আমার প্রস্তাবিত নাব্যখালের জালের সঙ্গে নদীর পুরানো খাতের উন্নয়নও প্রয়োজন। আসাম, উত্তরবঙ্গ ও বিহারের কোনও কোনও নদীর খাতের গভীরতা আংশিকভাবে বৃদ্ধি করা খুবই প্রয়োজন। কিন্তু শুধু এই গভীরতা বৃদ্ধির উপর নির্ভর করেই বন্যার প্রকোপ সম্পূর্ণ আয়ত্বে আনা যাবে না। বন্যার জলের সঙ্গে বাহিত পলির কথা ভুললে চলবে না। উত্তরবঙ্গের তিস্তা অথবা আসামের ব্রহ্মপুত্রের খাত খুব গভীর করে নিলে, পূর্ববঙ্গে (পাকিস্তানে) বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে এবং বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হবে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার দরকার। পূর্ববঙ্গের নদীগুলির খাতের গভীরতা বৃদ্ধির সমুচিত ব্যবস্থা না হলে উচ্চাংশ থেকে আনীত পলি এখানকার নদী গর্ভে সঞ্চিত হয়ে খাতগুলিকে আরও নষ্ট করবে। এবারকার উত্তর-পূর্ব ভারতের বন্যার জল নেমে পূর্ববঙ্গে যে ভীষণ প্লাবনের সৃষ্টি করেছে তা অবিদিত নেই কারও। আবার এই বন্যার ফলে সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগন্তুক বাস্তহারার ভিড় বেড়ে গিয়েছে, তাও অজ্ঞাত নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ীই এ দুটি দেশ পরস্পর সহযোগিতা করতে বাধ্য।

নদীর বন্যার জল সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনার চেষ্টা হচ্ছে নদীর উচ্চ অববাহিকার খাতে আড়াআড়ি উঁচু উঁচু বাঁধ বেঁধে কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি করে। এই আড়াআড়ি উঁচু বাঁধই (Dam) বহুমুখী পরিকল্পনায় বন্যা নিরোধের প্রধান আঙ্গিক। দামোদরের বন্যা প্রধানতঃ মাইথন ও পাঞ্চেৎ পাহাড়ের বাঁধেই নিরুদ্ধ হবে। এই রকম বাঁধই যে দামোদরের বন্যা নিরোধের একটি শ্রেষ্ঠ উপায়, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। তবে, আগেই বলেছি, এরকম বাঁধ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। মননশীল মানুষের

প্রতিভা আজ বহুমুখী পরিকল্পনার কথা উদ্ভাবিত করতে পেরেছে বলেই দামোদরের বন্যা নিরোধে এই শ্রেণীর বাঁধ নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে।

আমি যখন দামোদরের বন্যা নিরোধী মাইথন ও পাঞ্চেৎ বাঁধের ফলে কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা অচিরাৎ ধ্বংস হবে বলেছি, তখন অনেকে মনে করেছেন, আমি বুঝি এই শ্রেণীর বাঁধের সহোয্যে দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রণের বিরোধী। এ ধারণা ভুল। আমার বক্তব্য এখানে একটু পরিষ্কার করে দেওয়া, বোধ করি উচিতই হবে। আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে সুষ্ঠু বহুমুখী পরিকল্পনায় এই ধরনের বাঁধের কার্যকারিতা খুবই সুফলপ্রসূ হতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট আনুষঙ্গিক অন্যান্য সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হওয়া উচিত। এই উঁচু বন্যা বিরোধী বাঁধ নির্মাণের ফলে যে সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, তার মধ্যে কলিকাতা বন্দরে সমুদ্রগামী জাহাজের নাব্যপ্রণালী ধ্বংস হওয়াই প্রধানতম। সর্বপ্রথমে আমিই এই সমস্যাটির দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিন্তু তাঁদের হাবভাব আজ পর্যন্ত বিস্ময়জনক। এ বিষয়ে পূর্ণ আলোচনা পূর্বেই করেছি। দামোদরের সামান্য বন্যায় যে ক্ষতি হত, তার সঙ্গে জমির উর্বরতা বৃদ্ধিকারক পলি জমিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে উপকারও হত প্রচুর। লাভক্ষতির হিসাব করে সম্ভবতঃ লাভের অঙ্কই বেশী ছিল, ইহাও অনেক বিশেষজ্ঞের অভিমত। আজ উচ্চ-দামোদরের বন্যা নিরোধের ফলে কলিকাতা বন্দর ধ্বংস হলে পশ্চিমবঙ্গের যে ক্ষতি হবে, সে ক্ষতি অপূরণীয়। আমি তাই বলতে চাই, বিকল্প বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুষ্ঠু উপায়ে কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষা করাও দামোদর পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত কুমুদভূষণ রায় প্রভৃতি ইঞ্জিনিয়ারেরা নদী-উপত্যকায় প্রবাহ-নিরোধী এই রকম উচ্চ বাঁধ (dam) নির্মাণের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই পদ্ধতিতে দামোদরের বন্যা নিরোধে সুফলের চেয়ে কুফলই বেশী হবে বলে তাঁরা মনে করেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা বলেছেন, এ পদ্ধতিতে নিম্ন এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রিত হবে না। নদী-খাতের অবনতির দরুন নিম্ন এলাকায় অত্যধিক বৃষ্টিপাতই প্লাবন ও নতুন জলাভূমি সৃষ্টি করবে। বাঁধ দিয়ে উচ্চ এলাকার বন্যার জল নিরোধের ফলে দামোদর-রূপনারায়ণের নিম্ন-খাত মজে যাবে, আর জল নিকাশের ব্যবস্থা নষ্ট হবে।

কিন্তু এঁদের সমস্যাটির বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত নয়।

বৈজ্ঞানিক বিচারে তাঁদের কথা মাত্র আংশিকভাবে সত্য অথবা সত্য নয়। তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, বন্যার জল নিরোধের সঙ্গে সঙ্গে বালি ও পলি নিরুদ্ধ হবে, কাজেই মধ্য ও নিম্ন-খাত মজার প্রধান কারণ থাকবে না। তা ছাড়া অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য উপায়েই দামোদরের মধ্যপ্রবাহের খাতকে বন্যা নিরোধের 'কুফলে'র হাত থেকে রক্ষা করা যায়, নানারূপ নদী-শাসন প্রক্রিয়ায়। জোয়ারের সঙ্গে আনীত বঙ্গোপসাগরের পলি নিম্ন-হুগলীর খাত মজিয়ে দেয়—এঁদের বিশ্লেষণ সে দিকে লক্ষ্য রাখে নি।

কলিকাতা বন্দরের সমুদ্রগামী জাহাজের নাব্যপ্রণালী প্রধানতঃ দামোদরের বন্যাগুলির ভরবেগই রক্ষা করে এসেছে এতদিন। সেই বন্যার ভরবেগগুলির

অভাবে বঙ্গোপসাগরের মণ্ডপলি অচিরাৎ (কয়েক বছরের মধ্যেই) ওই নাব্য-প্রণালী ধ্বংস করে দেবে। ফলে কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষা খুবই দুরূহ। এখনই সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

একটা কথা উঠেছে, বন্যা নিরোধের জন্য নির্মীত আড়াআড়ি উঁচু বাঁধগুলির পিছনে বালি, নুড়ি, পলি জমে এদের পিছনের কৃত্রিম হ্রদ ২০।২৫ বছরেই ভরে যাবে। জাপান ও আমেরিকায় এ রকম ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এর প্রতিকার করা যায়। সুতরাং কথাটাতে অনর্থক গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়।

বালি, নুড়ি ও পলির পরিমাণ হ্রাস করবার জন্য প্রয়োজন উচ্চ উপত্যকায় ভূমির ক্ষয় নিবারণ। ওই এলাকায় বনভূমি সৃষ্টি করলে এবং ঘাস ও গুল্মাদি আগাছার জন্ম বৃদ্ধি করলে জমির ক্ষয় অনেকাংশে নিবারিত হতে পারে। শিলার প্রকৃতি অনুযায়ী জমির ক্ষয়প্রবণতা কম অথবা বেশী হয়। দামোদরের উচ্চ উপত্যকায় ভূমির প্রকৃতি হিমালয় অঞ্চলের চেয়ে এ বিষয়ে অনুকূল। সুতরাং বনভূমি সৃষ্টি করলে দামোদরেব উচ্চ উপত্যকার ভূমিক্ষয় অনেকটা নিবারিত হবে। ঝরনাগুলির ক্ষয়কারিতা হ্রাস করবার জন্য তাদের খাতে ছোট ছোট আড়াআড়ি বাঁধ (ব্যারেজ) দেওয়া যায়। আর ভূমির ক্ষয় নিবারিত হলে জলে বাহিত বালি, নুড়ি ও পলির পরিমাণ অনেক কমে যাবে নিশ্চয়ই। সুতরাং কৃত্রিম হ্রদের তলদেশে কম পরিমাণ বালি, নুড়ি, পলি জমা হবে এবং বাঁধগুলির আয়ু বৃদ্ধি পাবে। তা ছাড়া সুলভ জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত করতে পারলে যান্ত্রিক উপায়ে বছরে বছরে অবক্ষেপিত পলি অতি সহজে হ্রদের তলদেশ থেকে সরিয়ে চারপাশে নালা ও নিম্নভূমি ভরাট করা যায়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশনের জল সরবরাহ বিভাগে পলতায় পলি-থিতানো জলাধারের পলি যান্ত্রিক উপায়ে অতি সহজে সরানোর ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছিল। কলিকাতা পোর্ট কমিশনারের খালের পলি, এইরূপ পদ্ধতিতে স্থানান্তরিত করে বেহালার কাছে অনেক নিম্নভূমি উঠিত করানো হয়েছে। নিউ আলিপুর কলোনি, নতুন টাকশাল, নৌবিদ্যা কলেজ প্রভৃতি এইরূপে উঠিত জমিতেই পত্তন করা হয়েছে।

উচ্চ পার্বত্যভূমি এলাকায় বনভূমি সৃষ্টি করলেই যে জমির ক্ষয় সম্পূর্ণ নিবারিত হবে, এ কথা মোটেই সত্যি নয়। শিলার গুণ অনুযায়ী তার ক্ষয়প্রবণতা। সুতরাং অনেক শিলা, বনভূমি থাকা সত্ত্বেও বৃষ্টিপাত প্রভৃতি নৈসর্গিক কারণে ক্ষয়িত হবে কিছু কিছু। বনভূমি থাকা সত্ত্বেও সেখান থেকে বাহিত পলি কৃত্রিম হ্রদের তলদেশে সঞ্চিত হবে নিশ্চয়ই। সেই পলি সরিয়ে দেবার পদ্ধতি উদ্ভাবন করতেই হবে, তা না হলে আড়াআড়ি উঁচু বাঁধের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাবে। রেলওয়ে, বন্দর, বিমান ঘাঁটি প্রভৃতিকে রক্ষা করবার জন্য যেমন দিন দিন নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবিত হচ্ছে, তেমনি নদী-উপত্যকা পরিকল্পনায় বাঁধ ও কৃত্রিম হ্রদ (যা পূর্ত কাজের মধ্যে সবচেয়ে অর্বাচীন) প্রভৃতিকে রক্ষা করবার জন্যে নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবিত হবেই। মানুষের প্রতিভা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবে না।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের নদীগুলির বন্যা নিয়ন্ত্রণ আজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সম্প্রতি একটি নীতি প্রকাশ করেছেন। তিন পর্যায়ে এই কাজ তাঁরা করবেন। প্রথম পর্যায়ে দুই বছরে শহর রক্ষা প্রভৃতির

জন্য কিছু কিছু সমান্তরাল বাঁধ দেওয়া হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে পাঁচ বছর ধরে মাপজোখের কাজ হবে। আর তৃতীয় পর্যায়ে, পর্যবেক্ষণাদির কাজ শেষ হয়ে গেলে প্রয়োজনীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

আমার মনে হয়, সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যার ফলে উদ্ভূত জনমতের চাপে ভারত সরকারের এই প্রকাশিত নীতি একটি 'ভাঁওতা' ছাড়া কিছু নয়। এ শুধু সমস্যা সমাধানের কাজ স্থগিত রাখার একটা ফন্দি। তাঁদের উপদেষ্টাবর্গের প্রস্তাবিত পন্থা খুবই ব্যয়বহুল। ভ্রান্ত পরিকল্পনায় এ যাবৎ অর্থ-অপচয়িত হয়ে আজ ভারত সরকারের অর্থ-সঙ্কটই উপস্থিত হয়েছে। কাজেই নতুন পরিকল্পনায় হাত দেওয়া তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য। ইচ্ছা থাকলে, 'পর্যবেক্ষণাদির কাজ,' বাস্তবিক উত্তরবঙ্গে শুধু বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু 'পর্যবেক্ষণ' কয়েক মাসেই শেষ করা যায়। তবুও জানি, জনমত প্রবলতর আকার ধারণ করলে, সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকার বাধ্য হবেনই।

পূর্বে শুনেছিলাম জলঢোকা নদীটিতে বহুমুখী পরিকল্পনা শীঘ্রই গৃহীত হবে। কিন্তু তিস্তার ধ্বংসলীলা বহুমুখী পরিকল্পনার মাধ্যমে বন্ধ রাখতে হলে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, অদূর ভবিষ্যতে রাষ্ট্র তার ব্যবস্থা করতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। তিস্তার উচ্চ উপত্যকায় সম্পূর্ণ বন্যা নিরোধ করলে, নিম্ন-তিস্তার (দামোদরের মত) খুবই ক্ষতি হতে পারে, সে কথাও বিবেচ্য হওয়া উচিত। আমার বিবেচনায় তিস্তায় উচ্চ উপত্যকায় আংশিক বন্যা নিরোধ করবার জন্য তার উপনদীতে ২।১টি আড়াআড়ি বাঁধ দেওয়া ভালো। সেই বাঁধে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করলে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রচুর সহায়তা করবে। সমতল অংশে উত্তরবঙ্গের নদীগুলির পরিত্যক্ত খাতগুলির কিছু কিছু উন্নয়ন করে দিতে হবে। আর আমার প্রস্তাবিত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মত নাব্যখালের জাল সৃষ্টি করতে হবে উত্তরবঙ্গেও; তবেই, এ অঞ্চলের বন্যা সম্পূর্ণ আয়ত্বে আসবে।

তিস্তা অথবা তার উপনদীতে আড়াআড়ি উঁচু বাঁধ দেবার আগেই এই প্রস্তাবিত নাব্যখালগুলি কাটা উচিত। এরাই বন্যার জল ও পলি সারা দেশময় ছড়িয়ে দেবে, নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে নিম্নভূমিগুলি উঁচু করতে সাহায্য করবে।

মনে রাখতে হবে, বন্যার জলের চেয়ে বাহিত শিলা, নুড়ি, বালি ও পলিই নদীর খাতে চর ও অবরোধ সৃষ্টি করে প্লাবন ঘটায়। বন্যায় নদীতে যদি শুধু পলিবিহীন জল নামতো তা হলে আপনিই সে জল নদীগর্ভে পথ কেটে নিয়ে বোধ হয় সাগরাভিমুখে চলে যেত, প্লাবন ঘটাতো না। কাজেই তিস্তার পার্বত্য উপত্যকায় ভূমির ক্ষয় নিবারণের ব্যবস্থা করতেই হবে। গঙ্গার উৎস অঞ্চলে, হিমালয়ের বর্তমান গাড়োয়াল অঞ্চলে, প্রাচীনকালে ভগীরথ নিশ্চয়ই ভূমির ক্ষয় নিবারণের ব্যবস্থা করেছিলেন, ওই অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করে আমরা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারি।

প্রয়োজন হলে পর্বতশীর্ষে তুষারগলন ইচ্ছামত কমানো যায়। যেসব পর্বত শীর্ষের তুষার গলিত হয়ে তিস্তা প্রভৃতিতে প্লাবন ঘটাতে পারে, সেই সব তুষার শীর্ষে এরোপ্লেন থেকে লবণ, খড়িমাটি প্রভৃতি শ্বেত বর্ণের উপযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ ছড়ালে অত্যধিক তুষার গলন নিবারিত হতে পারে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সহযোগিতা না পেলে উত্তর ভারতে সুলভে সহজ উপায়ে কুশী, মহানন্দা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্রের বন্যা নিয়ন্ত্রণ দুঃসাধ্য। তবে, পাকিস্তান নিজের স্বার্থে ও গরজে ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বাধ্য হবে। কারণ ভারতের পূর্বাঞ্চলের বন্যা সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত না হলে, পূর্ব পাকিস্তানই দিন দিন বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, তার অর্থনৈতিক ভিত্তির সমূহ ক্ষতি হবে। আর পাকিস্তানের সহযোগিতায় কিছু কিছু বহুমুখী পরিকল্পনাও গৃহীত হতে পারে। তার ফলে উভয় রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে।

কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ বলেন, শুধু উচ্চ অববাহিকায় উপযুক্ত বনভূমি সৃষ্টি করতে পারলেই বন্যার প্রকোপ কমানো যায়। এ কথা যে সত্য হতে পারে না, তা সহজেই বোঝা যায়। কারণ আদিম বনভূমি অঞ্চলের নদীর প্লাবন-তলেও প্লাবন হত। অরণ্যের তলে পতিত পাতা প্রভৃতি বৃষ্টির কিছু জল জমা করে রাখে এ কথা যেমন সত্যি, তেমনি কয়দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়লে, সেই পাতা প্রভৃতিতে জলাধার পরিপূর্ণ হতে থাকবে, তার পরের অতিরিক্ত বৃষ্টির জলের সমস্তটাই নদীতে নামবে আর প্লাবনের সৃষ্টি করবে। কয়দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ে হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি পড়লে, সেই শেষোক্ত বৃষ্টি ভয়ানক প্লাবন সৃষ্টি করতে পারে, বনভূমির সহায়তায়। তবে সাধারণ ক্ষেত্রে বনভূমি, উপযুক্ত গুণের উপত্যকার শিলার ক্ষয় নিবারণ করে প্লাবন প্রতিরোধে কিছুটা সাহায্য করতে পারে, এ কথা অনস্বীকার্য।

মোট কথা, উত্তর-পূর্ব ভারতের নদ-নদীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুষ্ঠু বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে, স্থানে স্থানে নদীর খাত উন্নয়ন ও নাব্যখালের জাল সৃষ্টি। বাংলা দেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে সহজ হবে সেদিন, যেদিন বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে। সেই শুভদিনের পূর্বে উপরোক্ত নদী পরিকল্পনার মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। ভূমির জল নিকাশের স্বাভাবিক পথে অবরোধ সৃষ্টি করে রাস্তা ও রেলপথের পত্তন, উত্তরবঙ্গে বন্যার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসাম লিঙ্ক রেলপথ বর্তমান বন্যার জন্য খুবই দায়ী। যে অর্থ ব্যয় করে এই সব রেলপথ ও সড়ক নির্মিত হয়েছে এবং হচ্ছে সেই অর্থে নাব্য-জলপথ সৃষ্টি করলে এবং মেরামত ও রক্ষিত হলে উত্তরবঙ্গের বন্যা একদিন কিংবদন্তীতে পর্যবসিত হবে, বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি দিয়ে এ কথা প্রতিপন্ন করা মোটেই শক্ত নয়।

॥৩॥ নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা—কৃষির উন্নতি

নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার একটা প্রধান অবদান কৃষির উন্নতি সাধন, এবং তার ফলে শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি।

খাল কেটে, ব্যারেজের এবং বাঁধের আড়ালে সৃষ্ট হ্রদ থেকে জল কৃষিভূমিতে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে প্রবাহিত করে সেচের ব্যবস্থা করা হয়। তার ফলে, যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম (অর্থাৎ ৩০ ইঞ্চির নিচে) অথবা সুসময়ে বৃষ্টির অভাব, অথবা বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে যেখানে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয় না, সেই সব অঞ্চলে বার্ষিক ২।৩টি ফসল ফলানোর পক্ষে এইরূপ খালের সেচ-ব্যবস্থা খুবই কার্যকরী হয়েছে উপযুক্ত ক্ষেত্রে।

অবশ্য আধুনিক বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার জন্ম হবার আগেই, নদীতে সাময়িক অথবা পাকা বাঁধ দিয়ে খালের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা খুব প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। কিন্তু এ পদ্ধতি সর্বস্থানে সমান উপযোগী নয়। কেন্দ্রীভূত সেচ-ব্যবস্থার ফলে এক এলাকায় এক ঋতুতে একই ধরনের ফসল উৎপাদন করতে বাধ্য হয় কৃষকেরা। একটা নির্দিষ্ট তারিখে সেচের জল মাঠে আসবে, তার আগে মাঠে ফসল যদি কিছু থাকে, তা তুলে নিতে হবে, নতুবা নষ্ট হবে সে ফসল যদি পর্যাপ্ত ভাবে পেকে না থাকে, তবুও উপায় নেই। নলকূপ, ইঁদারা, দীঘি প্রভৃতির সেচ-ব্যবস্থায় অনেকটা স্বাধীনতা পায় স্থানীয় কৃষকেরা বিভিন্ন জাতের শস্য (ধানেরও বিভিন্ন জাত আছে, পাকবার জন্য বিভিন্ন সময় লাগে) উৎপাদনের জন্য। তাই অন্ধ অনুকরণ করে সর্বত্র খাল মারফত সেচ-ব্যবস্থা করলে খুবই ভুল হবে। নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার আঙ্গিক হিসাবে খালের সেচ-ব্যবস্থা মোটেই 'অবশ্য করণীয়' একমাত্র পদ্ধতি নয়। নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার সুলভ জলবিদ্যুতের সাহায্যে, অনেক ক্ষেত্রে, ভূগর্ভস্থ জল (যেখানে উপযুক্ত গুণের পর্যাপ্ত জল আছে) তোলবার পাম্প বসিয়ে, অথবা জলাধারে সঞ্চিত জল পাম্প করে সহজেই সেচ-ব্যবস্থা করা যায়। মাকড়শার জালের মত খাল কাটতে অনেক জমি নষ্ট হয়। জমির অভাব যেখানে অত্যধিক (যেমন বর্ধমান ও হুগলী জেলায়), সে অঞ্চলে সেচের খাল কাটবার আগে বিকল্প সেচ-ব্যবস্থাগুলি ব্যবহার করা যায় কিনা, বুদ্ধিমান পরিকল্পকের উচিত সে কথা ভালো করে বিবেচনা করে দেখা।

কৃষি-কার্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, প্রথমতঃ মাটির গুণ অনুযায়ী বিভিন্ন ফসলের চাষ হয়। যে মাটিতে ভালো কমলালেবুর বাগান, অথবা ভালো চা-বাগান হয়, সে মাটিতে ভালো পাট হয় না কিংবা আমবাগান হয় না। নারিকেল বাগানের জন্য একরকম বিশিষ্ট মাটির প্রয়োজন। তেমনি তূলা বা ইক্ষু চাষও বিশেষ শ্রেণীর মাটিতে সম্ভব।

উদ্ভিদ মাটি থেকে শিকড়ের সাহায্যে তার খাদ্য সংগ্রহ করে। এই স্বাভাবিক খাদ্য মাটিতে ক্রমে কমে যায়, তাই সার দেওয়ার প্রয়োজন। আমাদের দেশে নদীর বন্যার ও খালের জলের পলি অনেক ফসলের পক্ষে ভালো সার। তা ছাড়া, পচানো গোবর-পাতা প্রভৃতি, সরিষা-বাদামের খইল, হাড়ের গুঁড়া, ছোট ছোট মাছ প্রভৃতি সারের ব্যবহার প্রচলিত আছে। বৈজ্ঞানিকেরা সারতত্ত্ব বুঝে অনেক কৃত্রিম সারের প্রবর্তন করেছেন। বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন গ্যাসকে জমি নানা স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপায়ের সাহায্যে আহরণ করে নিয়ে উর্বরতা বৃদ্ধি করে নেয়।

উদ্ভিদ এই সার গ্রহণ করতে পারে জলের সাহায্যে, তাই চাষের কাজে জলের প্রয়োজন। আর উদ্ভিদ এই খাদ্য 'পরিপাক' করে তার পাতা প্রভৃতিতে যে সবুজ ক্লোরোফিল থাকে, তাই দিয়ে সূর্যালোকের সাহায্যে। তাই উদ্ভিদের জীবনে সূর্যালোক অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

মানুষ, বহু প্রাচীনকাল থেকেই, বৈজ্ঞানিক ভাবে না বুঝেও, শুধু অভিজ্ঞতায়, কৃষির জন্যে এই সব তত্ত্ব জানে—চাষের জমিতে সূর্যালোক, সার ও

জলের সরবরাহ না হলে ফসল উৎপন্ন হয় না। আর বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা করতে শিখেছে।

আমরা যখন শহরে টবের ফুল গাছে জল দেই, সেটাও জল-সিঞ্চন বা জলসেচের কাজ।

বাগানে মালি ঝারি দিয়ে বেশী পরিমাণ জলবহন করে ফুল গাছে সেচ দেয়।

কপি প্রভৃতি তরকারির ছোট ছোট ক্ষেতে কূপ থেকে জল তোলার নানা ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে। আর সে জল সরু সরু নালা কেটে জমিতে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থাও রয়েছে। কোথাও মানুষে শুধু বালতি ও দড়ির সাহায্যে কূপ থেকে জল টেনে তোলে। কূপের উপরে কাঠের বা লোহার চাকার কপিকল (pulley) বসিয়ে জল তোলার শ্রম লাঘব করা হয়। একটি 'গাছ' বসিয়ে, তার মাথায় বাঁশ অথবা সরু শালকাঠের 'লাট্টা' কলের প্রচলন কূপের দেশে খুবই বেশী। চামড়ার বড় 'মোট' (mote) কূপের জলে ডুবিয়ে বলদের সাহায্যে প্রচুর জল তোলার ব্যবস্থা বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে খুবই প্রচলিত। তা ছাড়া 'পারস্য-চক্রে'র (Persian wheel) প্রচলনও আছে পঞ্জাব অঞ্চলে। আধুনিক কালে নানা শ্রেণীর পাম্প বসিয়ে সাধারণ কূপ ও নলকূপ থেকে জল তোলার পদ্ধতির সঙ্গে সকলেই প্রায় পরিচিত। সস্তার জলবিদ্যুতে এই পাম্প চালিয়ে সেচ-ব্যবস্থা বেশ সহজসাধ্য করা যায়। আর এই সব পাম্প আর মোটর এদেশে প্রস্তুত হতে পারে।

বড় পুষ্করিণী অথবা খাল, ডোবা থেকে কাঠের অথবা টিনের তৈরী ডোঙার সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলের সকলেই পরিচিত। এসব ক্ষেত্রেও জলবিদ্যুৎ ব্যবহারে সস্তায় পাম্প চালানো যায়।

নদীর জলকে আড়াআড়ি ব্যারেজের (বাঁধ) সাহায্যে উঁচু করে নিয়ে খালের মারফত চাষের জমিতে চালানোর ইতিহাসও খুব প্রাচীন। ভারতবর্ষীয়, চীনা, ব্যাবিলনীয়, রেড ইণ্ডিয়ান, ইংকা প্রভৃতি প্রাচীন জাতিগুলির মধ্যেই এর ব্যবহার দেখা যায়। ব্যক্তিগত চেষ্টায় এরকম ব্যারেজ বাঁধার কাজ বা খাল কাটার কাজ সম্ভব নয়। মানুষ যখন সভ্যতার সোপানের একটু উচ্চ স্তরে উঠেছিল তখনই যৌথভাবে সমবেত পরিশ্রমে এই ধরনের সেচ-ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছিল। আমাদের দেশের কোল, ওরাঁও প্রভৃতি ছোট নাগপুরের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক ব্যবস্থাই রয়েছে, বছরের যথাসময়ে যোগ্য ও বয়স্থ ছেলেমেয়েরা একত্রিত হয়ে নদীতে মাটির বাঁধ দেবে। আদিম যুগের শিকারী মানুষ ক্রমে যখন কৃষি-কার্যের স্থিরতার মধ্যে তার জীবিকার্জনের উপায় খুঁজে পেয়েছে তখনই বুঝেছে সামাজিক একতায় কাজ করেই সবচেয়ে কম পরিশ্রমে সম্পদ বাড়ানো যায়।

বৃষ্টির জলকেও বাঁধ বেঁধে আটকিয়ে বড় বড় জলাশয়ে সঞ্চিত করতে শিখেছে মানুষ। এমনিভাবে ধরা বৃষ্টির জল শুকনার দিনে ব্যবহার করা হয়। যে অঞ্চলের জমি খুব উঁচু-নিচু, সেখানে নিচুর দিকে বাঁধ বেঁধে বড় বড় হ্রদ সৃষ্টি হয়েছে। দীঘি, পুষ্করিণী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সমতল অঞ্চলে ওই পদ্ধতিরই একটু অদলবদল থেকে তৈরী। নিম্নাঞ্চলে, যেখানে ভূপৃষ্ঠের সামান্য নিচেই ভূগর্ভস্থ জল আছে সেখানে ভূগর্ভের জলও ওই সব কৃত্রিম জলাশয়ে আশ্রয় নেয়।

ইঁদারা কিছু বেশী গভীর হয়। উত্তরবঙ্গের মহীপাল দীঘির মত বড় বড় জলাধার ও আসামের শিবসাগরের 'সাগর'গুলি, আমার মনে হয়, নদীর পরিত্যক্ত খাতের জলাভূমিতে বাঁধ দিয়ে তৈরী। এই সব প্রাচীন জলাশয় আমাদের দেশে ঔদিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষের পরিচায়ক।

বৃটিশ আমলের শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষে (পাকিস্তান নিয়ে প্রায় ৭ কোটি ২০ লক্ষ একর জমিতে উন্নততর সেচ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ একর জমিতে দীঘি, পুষ্করিণী, কৃত্রিম হ্রদ, কূপ প্রভৃতির জলেই সেচের কাজ হত। বাকি অংশে নদী-উপত্যকায় খালের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল প্রধানতঃ বৃটিশ শাসকদের উদ্যোগেই, আর তূলা চাষের সুবিধার জন্য। (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন হওয়ার পরে বৃটিশকে তূলার জন্যে মিশর ও ভারতবর্ষের মুখাপেক্ষী হতে হয়)। ১৯৪৭-এর আগে এই রকম খালের সাহায্যে সেচের-ব্যবস্থা-করা ভূমির পরিমাণ ছিল ভারতবর্ষে ৪ কোটি ৯০ লক্ষ একর। এর একটা মোটা অংশ আজ পাকিস্তানের পঞ্জাব ও সিন্ধু দেশে পড়েছে। শুধু সিন্ধুর লয়েড ব্যারেজই ৫০ লক্ষ একর জমিতে সেচ-ব্যবস্থা করে। তা ছাড়া পঞ্জাবের খালের সেচ-ব্যবস্থার সমস্ত অঞ্চলটাই পশ্চিম পঞ্জাবে (পাকিস্তানে) পড়েছে। মোট ৭ কোটি ৯০ লক্ষ একরের মধ্যে আজ ভারতের ভাগে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ একর সর্ববিধ উপায়ের সেচ-ব্যবস্থার ভূমি। ভারতের ভাগে মোট কৃষিভূমির পরিমাণ ২৫ কোটি ১০ লক্ষ একর। অর্থাৎ মোট কৃষিভূমির মাত্র শতকরা ১৯ ভাগ জমি সেচ-ব্যবস্থার ভূমি। তবে 'চাষযোগ্য' ভূমির পরিমাণ আরও বেশী; কাজেই সেচ-ব্যবস্থিত জমির অনুপাত কম।

পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় কিছু কিছু খালের জলের সেচ-ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে, সে সমস্ত জমির মোট পরিমাণ কয়েক হাজার একরের বেশী নয়। অথচ আজকের দামোদর পরিকল্পনা এলাকার মধ্যেই প্রায় ১ লক্ষ একর জমিতে বিকল্প সেচ-ব্যবস্থার সুষ্ঠুভাবে চাষের কাজ হচ্ছিল। সম্প্রতি ময়ূরাক্ষী ও দামোদর পরিকল্পনায় প্রায় ১৬ লক্ষ একরে খালের সাহায্যে সেচ-ব্যবস্থার প্রবর্তন হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যার অনুপাতে চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ অত্যন্ত কম, আবার হাওড়া, হুগলী জেলার মত অঞ্চলে কোনও কোনও থানায় প্রতি বর্গমাইলে ২০০০।৩০০০ লোকের বসতি। কাজেই এখানে খাল কেটে জমি নষ্ট করা অযৌক্তিক। দামোদর পরিকল্পনায় প্রায় দেড় হাজার মাইল লম্বা খাল কেটে যে জমি নষ্ট করা হয়েছে, তার হিসেব করে দেখা যায় যে প্রতি ৮ বিঘা জমিতে সেচ-ব্যবস্থা করবার জন্য প্রায় ১ বিঘা অতি মূল্যবান জমি খালে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এটা সুবুদ্ধির পরিচয় দেয় না। পশ্চিমবঙ্গে কোথাও বার্ষিক বৃষ্টির পরিমাণ ৪৫।৫০ ইঞ্চির কম নয় (বহুস্থানে অনেক বেশী, ৬০ ইঞ্চি থেকে ৮০ ইঞ্চি পর্যন্ত)। সুতরাং কৃত্রিম জলাধারে রক্ষিত ও ভূগর্ভে সঞ্চিত বৃষ্টির জলেই সেচ-ব্যবস্থা সমীচীন। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা অঞ্চলে এখনও ভূমির অনুপাতে জনবসতি খুব বেশী নয়, তাই ও-অঞ্চলে খাল কাটা আপাততঃ সমর্থন করা যায়। কিন্তু বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায়, দামোদর-

পরিকল্পনা অঞ্চলে, অদূর ভবিষ্যতে সেচের খাল ভরাট করে জমির পুনরুদ্ধারেরই প্রয়োজন হবে। নদীর খাতগুলির উন্নতি সাধন করে নাব্যপ্রণালীর প্রবর্তন করে যাতায়াত ব্যবস্থা সুলভ করাও প্রয়োজন।

বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনায় সুলভ জল-বিদ্যুৎ-শক্তি কৃত্রিম সার তৈরীর কাজে খুবই ব্যবহৃত হয়। এই কৃত্রিম সারে কৃষি-কার্যের যে উৎকর্ষ হয়ে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে, তা বলাই বাহুল্য। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সিন্ধ্রিতে সারের কারখানা স্থাপিত হয়েছে, সে সারের মূল্য যথাযথ কম হতে পারছে না; কারণ দামোদর পরিকল্পনায় সুলভ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয় নি। বোকারোর মত তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সাহায্যে বিদ্যুতের মূল্য সুলভ হতে পারে না, এ কথা আগেই বলেছি। কানাডার সুলভ জলবিদ্যুতের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন গ্যাস থেকে নাইট্রিক এসিড ও নাইট্রেট সার তৈরী হয়। যুদ্ধের কাজে, নানা পৌতিক কাজে ও শিল্পে নাইট্রিক এসিড, নাইট্রেট থেকে তৈরী বারুদ প্রভৃতি অতি সস্তায় উৎপাদিত হয় কানাডায়। সস্তায় নাইট্রেট সার কৃষিকার্যের জন্য কানাডা নানা দেশে রপ্তানি করে।

বর্তমান ভারতবর্ষে কাবেরী নদীতে মেট্টুর বাঁধে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমিতে সেচ-ব্যবস্থা রয়েছে। এই বাঁধে কিছু পরিমাণ জলবিদ্যুৎও উৎপাদিত হয়। মিশরের নীল নদে আস্য়ান বাঁধের সাহায্যে প্রায় ৫ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমিতে সেচ-ব্যবস্থা রয়েছে। সোভিয়েত দেশে শিরদরিয়া ও আমুদরিয়া উপত্যকায় প্রায় ৪৫ লক্ষ একর জমিতে সেচ-ব্যবস্থা আছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৭০ লক্ষ একর পরিমাণ জমিতে সেচ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। ৪৮টি রাজ্যের মধ্যে মাত্র ১১টি রাজ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে সেচ-ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে। এই সব রাজ্যগুলিতে বার্ষিক বৃষ্টির পরিমাণ ৩০ ইঞ্চির কম। খালের সাহায্যেই হোক অথবা বৃষ্টির জল ধরে রেখে বিকল্প পদ্ধতিতেই হোক, সেচ-ব্যবস্থায় যে নির্ভরশীল অবস্থা পাওয়া যায়, তার ফলে ফসল উৎপাদনে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যাচ্ছে, যে ১১টি রাজ্যে সেচ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, পঞ্চাশ বছর পূর্বে সেই সব রাজ্য অপেক্ষাকৃত জনবিরল ছিল, পঞ্চাশ বছরে সেখানে জনসংখ্যা চতুর্গুণ হয়ে গিয়েছে, অথচ বাকি ৩৭টি রাজ্যে জনসংখ্যা মাত্র দ্বিগুণ হয়েছে। আবার ফসলের অতিবৃদ্ধিতে কৃষিজাতের মূল্য অত্যন্ত কম হয়ে যাবার সম্ভাবনা হয়, মূল্য ঠিক রাখবার জন্য আমেরিকায় মাঝে মাঝে গম প্রভৃতি ফসল পুড়িয়ে নষ্ট করার প্রয়োজন হয়।

চীন, জাপান, শ্যামদেশ (থাইল্যাণ্ড), ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে ধানের চাষেও সেচ-ব্যবস্থা প্রচলিত। দামোদরের বন্যার জলের সাহায্যে সেচ-ব্যবস্থায় নিম্ন-দামোদরের অঞ্চলে ধানচাষের কথা সুবিদিত। প্রধানতঃ বন্যার জলের পলিসারের উপকারিতার জন্যেই, বৃষ্টির জল প্রচুর থাকা সত্ত্বেও, এ অঞ্চলের কৃষকেরা তাদের ধান চাষের কাজে দামোদরের বন্যার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল। বন্যা নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেলে বিকল্প সেচ-ব্যবস্থায়, কৃত্রিম সার ব্যবহার করে ধানের ফলন বৃদ্ধি খুবই সম্ভবপর। কৃষি-কার্যের গতানুগতিক পন্থা ছেড়ে জাপানী প্রথার মত সুষ্ঠু পন্থায় ফলন অনেক বাড়ানো যায়। দামোদর পরিকল্পনায় যেদিন সুলভ জলবিদ্যুৎ

উৎপাদিত হবে, সেদিন সেই বিদ্যুতের সাহায্যে বিকল্প সেচ-কার্যগুলি আয়াসসাধ্য হবে, সেচের জন্য অনর্থক কাটা খালগুলি ভরাট করে জমি উঠিত করানোও যাবে। আর শুধু জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও নাব্যতার জন্য যথেষ্ট জল থাকবে পরিকল্পনায়।

বাংলা দেশে সচরাচর দেখা যায়, আজ গোচারণের জন্য জমি ছাড়া হয় না, সব জমিতেই চাষ করা হয়। এর ফলে আমাদের গো-সম্পদের যথেষ্ট হানি হয়ে গিয়েছে। দুগ্ধ উৎপাদন অনেক কমে গিয়েছে এবং তার ফলে শিশুর স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছে। সুষ্ঠু পদ্ধতিতে অল্প জমিতে অধিক ফসল ফলিয়ে, বাকি জমি গো-চর, ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতির জন্য পতিত করে রাখা দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে। দুঃখের বিষয়, সরকারী পরিকল্পনায় এ দিকের যথেষ্ট ব্যবস্থা হচ্ছে না।

সর্বত্রই যে সেচ-ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে, এ কথা ঠিক নয়। কিন্তু এই রকম ধারণা অনেকের মনে এসে যায় যখন শ্রীগুলজারীলাল নন্দের মত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উল্লেখ করেন, আমাদের দেশে চাষযোগ্য জমির শতকরা মাত্র ১৩ ভাগে সেচ-ব্যবস্থা আছে আর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে তাকে শতকরা ১৮ ভাগ করতে হবে। এই রকম অন্ধ ধারণার বশবর্তী হয়েই দামোদর এলাকায় খাল কাটা হয়েছে ওই ১৮ সংখ্যাটির জন্য। বিকল্প সেচ-পদ্ধতিতেও যদিও ওই ১৮ সংখ্যায় লক্ষ্যে পৌছানো যায় সে কথা বলেছি।

পূর্বেই বলেছি, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৪৮টি রাজ্যের মধ্যে ৩৭টিতে কোনও সেচ পরিকল্পনা নেই। ইউরোপের অনেক দেশেও সেচ পরিকল্পনা নেই। সংবৎসরব্যাপী বৃষ্টি ও তুষারপাতের জলেই কৃষিকার্য সুষ্ঠুভাবে চলে। ভারতবর্ষেও যেখানে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে, অন্ততঃ খালের মারফতে, সেচ-ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। সর্বত্র যে ২।৩টি ফসল ফলাতেই হবে, তাও ভালো নীতি নয়। সুষ্ঠু কৃষিকার্যে সংবৎসর মানুষকে আবদ্ধ না রেখে শিল্প প্রভৃতি অন্যান্য সামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত করতে না পারলে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। অত্যধিক ফসল ফলানোর ফলও কৃষক সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হতে পারে। আমেরিকা, সোভিয়েত দেশ অথবা চীনে তাঁদের স্থানীয় সমস্যার সমাধানের জন্য যে ব্যবস্থাই করে থাকুক না কেন, অন্ধ অনুকরণ করাতে শুধু কুফলই প্রসব করতে পারে। অত্যধিক শস্য উৎপাদনের ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য খুব কম হয়ে গেলে, আমাদের দেশে তার কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে বর্তমানে। এ দেশের অর্থনীতিতে কৃষির প্রতি যে অত্যধিক নজর দেওয়া হচ্ছে, সেটা সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক 'বন্ধুর' মতলবে। গত কয় বছরে দেখা গিয়েছে, অধিক জমিতে চাষ হয়েছে, কিন্তু বিঘা পিছু মোট ফসল বৃদ্ধি না পেয়ে বরং কমই হয়েছে। কৃষির উপরে নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে, আর কৃষকেরা দিন দিন দরিদ্রতর হয়ে যাচ্ছে। কৃষিজাতের মূল্য যথেষ্ট নয়, এবং কৃষি-কার্যে ব্যয় দিন দিন বর্ধিত হয়ে যাওয়াতে, কৃষকের কুটির সারা জন্মেও পাকা হয় না। বছরে বছরে কুটিরের পুনঃ নির্মাণের ব্যয়ের প্রয়োজন, কৃষকের হাতে কোনদিনই কিছু পুঁজি জমতে পায় না। বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবন তার, বুদ্ধি ও বিচারশক্তিও হীনতা পেয়ে যায়।

ভূমিবণ্টন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হলে কোনও নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার সেচ প্রভৃতি কোনও ব্যবস্থাই কৃষিকার্যে সত্যিকারের উন্নতি বিধান করতে পারবে না। আর কৃষককুলের সম্পদ বৃদ্ধি না হলে কোনও সেচ-ব্যবস্থাই রক্ষিত করে বজায় রাখা যাবে না। বর্তমানে সেচ পরিকল্পনাগুলিতে, শেষ পর্যন্ত, ভূমি উৎকর্ষ-কর, সেচ-কর প্রভৃতি ধার্য করে কৃষকদের যে ভাবে শোষণের ব্যবস্থা হয়েছে, তার ফল ভয়াবহ হবেই। সেচ-ব্যবস্থায় যদি সরকারী হিসাবমত শতকরা ২৫ ভাগ ফলন বৃদ্ধি হয়, কৃষিজাতের মূল্য সে অনুপাতে বেশী কমে যাবে বলেই দেখা যাচ্ছে। মোটের উপর কৃষকের আয় বৃদ্ধি হবে না, অথচ তাকে সরকারী পরিকল্পনার ব্যয় ভার বহন করতে হবে। এর ফলে কৃষক-সমাজে বর্গীর হাঙ্গামার সময়ের অবস্থা এসে যাবে। বর্গীর হাঙ্গামায় চৌথ আদায় প্রভৃতি ব্যবস্থায় কৃষকের সম্পদ লুণ্ঠিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন সেচ-ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল—কৃষকেরা সে সেচ-ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ করে বজায় রাখতে পারে নি। ঐতিহাসিকেরা একবাক্যে এ কথার সাক্ষ্য দেবেন। ইরাক দেশের টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের উপত্যকার খালের সেচ-ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, কৃষককুলের উপর নৃশংস বিদেশী বিজয়ীর অত্যাচারে। বাঁধ-ভেঁড়ি ব্যবস্থায় সুন্দরবনের কৃষি ও জনপদ পত্তনের ব্যবস্থা মগেদের অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে গিয়ে সুন্দরবনকে অরণ্য করে দিয়েছে। বর্তমান অর্থনৈতিক অত্যাচারও একই প্রকার ফল প্রসব করবে আমাদের দেশের নবপ্রবর্তিত নদী-উপত্যকা সেচ-ব্যবস্থার উপরে—এ সেচ-ব্যবস্থা বজায় রাখা যাবে না।

পরিকল্পনায় সুষ্ঠুতার অভাবে আমাদের দেশের বর্তমান নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা কৃষির উন্নতি ও দেশের কল্যাণ সাধন না করে পরম অকল্যাণ ডেকে আনবে। পরিকল্পনা কমিশনের মূলনীতি অনুসারে সমস্ত চাপ অবশেষে অসহায় কৃষককূলের উপরেই পড়ছে, কিন্তু বর্তমান অর্থনীতিক কাঠামোতে তাদের পক্ষে সে চাপ সহ্য করা অসম্ভব। কৃষক-সমাজ দিন দিন সর্বহারা সমাজে পরিণত হবে, কৃষি-ব্যবস্থাই ভেঙে গিয়ে 'দুর্ভিক্ষে' দেশ দারুণ কষ্টে পড়বে। মননশীল ব্যক্তিদের কাছে বেশী বিস্তারিত করে বলবার প্রয়োজন দেখছি না—অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়ম কোনও ভ্রান্তিকে ক্ষমা করে না।

॥৪॥ জল নিষ্কাশন ও নতুন জমি উঠিত করানো

জলনিকাশ ও নতুন জমি উঠিত করানো নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে, বিশেষতঃ আমাদের এই বাংলা দেশে খুবই প্রয়োজনীয়। হাওড়া, মেদিনীপুর জেলার 'হাওড়' জলাজমি, আর যেসব জমি জোয়ারের জলে ডুবে যায়, তাদের মানুষের ব্যবহারযোগ্য জমিতে পরিণত করা দামোদর পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা দ্বারকেশ্বর-রূপনারায়ণ নদ ও দামোদর নদের ইতস্ততঃ ভ্রমণের ফলে প্রায় সমস্তটাই জলাভূমিতে পরিণত হতে বসেছে। একদিন এ অঞ্চল একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল, পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক জীবনে আরামবাগ মহকুমার অবদান অকিঞ্চিৎকর নয়। আজ কিন্তু নদ-নদী মজে আসাতে এ অঞ্চল সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যহীন, 'ম্যালেরিয়ার ডিপো'। একমাত্র মুণ্ডেশ্বরী নদী বর্ষাকালে বন্যা এনে দেশের শ্রী খানিকটা

বজায় রেখেছিল, আজ উচ্চ-দামোদরের বন্যা নিরোধের ফলে, মুণ্ডেশ্বরীও সম্পূর্ণ মজে যাবে, রূপনারায়ণের নাব্যতা লোপ পাবে। এ অঞ্চলের পশ্চিমাংশে এতদিন যাতায়াত চলছিল ওই রূপনারায়ণ দিয়ে, এখন অঞ্চলটি আরও দুর্গম হয়ে উঠবে। রাজপথ তৈরি করে মোটর-বাস চালালে তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হবে, বিশেষতঃ কৃষিজাত পণ্য রপ্তানির পক্ষে।

আজ অনেক বিশেষজ্ঞই বুঝেছেন, দামোদরের উচ্চ এলাকায় বন্যা নিরোধের ফলে, আর সেচের খালের ফলে নিম্ন-দামোদর অঞ্চলের বর্তমান জলনিমজ্জিত অংশ ছাড়াও নতুন নতুন জলাভূমির সৃষ্টি হবে।

দামোদর পরিকল্পনার আঙ্গিক হিসাবে 'হাওড়া-হুগলী জলনিকাশ-পরিকল্পনার উল্লেখ আছে। তা ছাড়া ডাঃ এন. কে. বসু স্টেটস্‌ম্যান্ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখে জানিয়েছিলেন, নিম্ন-দামোদর পর্যবেক্ষণ (study) করা হচ্ছে। সুতরাং একদিন হয়তো এ অঞ্চলের মূল সমস্যা সমাধানে হাত পড়বে। কিন্তু সেদিন অদূরভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প। তার মধ্যে দামোদর পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়াতেই নদী মজে আর নতুন জলাভূমি সৃষ্টি করে 'মগেদের অত্যাচারে সুন্দরবনে'র মত এ অঞ্চল এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গে, গঙ্গার ব-দ্বীপের নিম্নভাগে জমি উঠিত করানো ও জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থার ফলে যে ক্রমশঃ একটা বৃহৎ অংশ বাসযোগ্য ও আবাদযোগ্য হয়ে উঠেছে, তা বোঝা শক্ত নয়। আজকের কলিকাতা ও হাওড়া শহর অঞ্চল তো বটেই, ঐতিহাসিক কালে প্রতাপাদিত্যের খুলনা-২৪ পরগনা জেলার রাজ্যও জলনিকাশ ও জমি উঠিত করানোর ফলেই সম্ভব হয়েছিল। তখনকার সেই প্রাচীন পদ্ধতি, আজও সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে।

বর্তমান ঢাকপিটানোর যুগে, পৃথিবীতে ওলন্দাজদের নাম খুবই প্রচারিত হয়ে থাকে জলনিকাশ ও জমি উঠিত করানোর বিশেষজ্ঞ হিসাবে। অবশ্য, এ কথা জেনে রাখা ভালো যে, ওলন্দাজদের দেশ হলাণ্ডের প্রায় শতকরা ৬৬ ভাগই সমুদ্র-জল-পৃষ্ঠের তলদেশে (below sea-level) উঠিত করানো ভূমি। বাঁধ ও ভেঁড়ির সাহায্যে, খালের সাহায্যে আর বড় বড় হাওয়া-কল (Wind Mill) চালিত পাম্পের সাহায্যে ওলন্দাজরা বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে। কিন্তু সুন্দরবনে স্বাভাবিক জোয়ার-ভাটার উপর নির্ভর করা হয়, পাম্পের ব্যবহার নেই। সম্প্রতি সোনারপুর অঞ্চলে পাম্পের সাহায্যে কিছু জমি উঠিত করানো হচ্ছে।

ইতালিতেও বহু জমি উঠিত করানো হয়েছে, বেলজিয়মেও। হলাণ্ডের বাঁধ ভেঙে মাঝে মাঝে আটলাণ্টিক মহাসাগরের জল দেশের মধ্যে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে মহা বিপর্যয় ঘটায়। চীনের হোয়াংহোর নিম্নাঞ্চলের বাঁধ ভাঙা ও প্রবল বন্যার কাহিনী সারা পৃথিবীতে সুবিদিত। কিন্তু এই সব দেশের মানুষ আবার পূর্ণোদ্যমে বাঁধ সংস্কৃত করে নিয়ে বসবাস করে, ভূমিকম্পের স্বাভাবিক বিপর্যয়ের পরে জাপানীদের মত।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৯ কোটি একর জলা নিম্নভূমি আছে, তার মধ্যে প্রায় ৮ কোটি একরের কিছু বেশী নিম্নভূমি উত্থিত করানোর চেষ্টা হচ্ছে, রাষ্ট্র ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায়।

পশ্চিমবঙ্গে জমি উত্থিত (উঠিত) করানোর ইতিহাস যে সুপ্রাচীন তা পূর্বেই বলেছি। গঙ্গার ব-দ্বীপ গঠনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ভূমি উঠিত হতে শত শত বছর সময় লাগে, মানুষ ততদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকতে পারে নি। মানুষের এই অধৈর্যের ফলে ব-দ্বীপে গঙ্গার শাখাপ্রশাখাগুলির ধারে বাঁধ-ভেড়ি নির্মিত হয়েছিল। নদীগুলি জোয়ার-ভাটার স্বাভাবিক লীলায়, বঙ্গোপসাগরের নিমজ্জিত মঞ্চের পলি পাতিত করে গর্ভ ক্রমশঃ উঁচু করে ফেলেছে,—আদিগঙ্গা, মাতলা, বিদ্যাধরী, পিয়ালী প্রভৃতি মজে আসা নদীর খাতের ধারে জমির বহুলাংশ তাই জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে, সম্প্রতি এই রকম জলাভূমি উঠিত করানোর কাজে কিছু কিছু হাত দেওয়া হয়েছে। 'সোনারপুর-আরাপাঞ্চ-মালো জলনিকাশ পরিকল্পনা'য় প্রায় ১০৮ বর্গমাইল এলাকা বিদ্যুৎশক্তি চালিত সুবৃহৎ পাম্পের সাহায্যে উঠিত করার চেষ্টা হচ্ছে। তার মধ্যে ২৬ বর্গমাইল উঠিত হয়েছে। কলিকাতার পূর্বে রাজভবন থেকে ৫০ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যের এলাকায় আরও জল নিষ্কাশন পরিকল্পনায় সরকারী হাত পড়েছে। এগুলি, অবশ্য, পাম্পের সাহায্যে করা হচ্ছে না, খালের সাহায্যে সাধারণ পদ্ধতিতেই করা হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দিক থেকে বিচার করলে এ জলনিকাশ পরিকল্পনার নতুন পরীক্ষাটি অনুমোদন যোগ্য, কিন্তু অর্থ নৈতিক বিচারে নিষ্ফল হতে বাধ্য।

এমনি এক পরিকল্পনা ২৪ পরগনা জেলায় দমদম-বারাসত থানা অঞ্চলের জলাভূমির জলনিকাশের জন্যে 'বাগজোলা-ঘুনি-যাত্রাগাছি জলনিকাশ পরিকল্পনা'। পূর্ববঙ্গের বাস্তহারাদের পুনর্বসতি পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িয়ে (এবং তারই জন্য বরাদ্দ টাকায়) প্রায় ১৮ মাইল দীর্ঘ খাল কাটানো হচ্ছে, ওই বাস্তহারাদের দিয়ে। মাইলে মাত্র ৩ ইঞ্চি ঢালের খালের মারফত কুলটি-বিদ্যাধরী নদীতে জলার বৃষ্টির জল নামিয়ে দেবার চেষ্টা হবে ভাটার সময়ে। স্থানীয় কৃষকদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না রেখেই অথবা তাদের সহযোগিতা গ্রহণ না করেই কাজটি তুলতে চেষ্টা হচ্ছে। ফলে এক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। জলাভূমির জলনিকাশ সকলেরই কাম্য, বহুপরিমাণ ভূমি উঠিত হবে, অথচ সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর দোষে এমন ভালো কাজেও বাধা পড়ে। স্থানীয় কৃষকরা যদি ভাবতে পারতো, উঠিত জমিও তাদেরই জমি, তা হলে এরকম বাধার সৃষ্টি হত না। ভূমিবণ্টন নীতির মৌলিক পরিবর্তন যতদিন না সাধিত হচ্ছে, ততদিন কোনও স্কীমই জনসাধারণের কল্যাণ করতে পারবে না। তা ছাড়া কুলটি-বিদ্যাধরী মজে আসা নদী এই জলনিকাশ পরিকল্পনা কতদূর সফল হতে দেবে, তাতে, আমাদের মত ইঞ্জিনিয়ারদের ঘোরতর সন্দেহ আছে।

মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, ২৪ পরগনা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায়, গঙ্গার ব-দ্বীপের 'মুমূর্ষু' ও 'পরিণত' অংশে অনেক জলাভূমিই আজ জলনিকাশ ও জমি-উঠিত-করা পরিকল্পনার অপেক্ষা রাখে। সুষ্ঠু নদী-উপত্যকা পরিকল্পনায়, ভাগীরথী-হুগলী, জলঙ্গী, মাথাভাঙা, ভৈরব ও সুন্দরবন অঞ্চলের নদীগুলির সংস্কার না করতে পারলে, সমস্যার সমাধান হতে পারে না। 'সোনারপুর-আরাপাঞ্চ-মালো' অথবা 'বাগজোলা-ঘুনি-যাত্রাগাছি' অথবা দামোদর পরিকল্পনায় 'হুগলী-হাওড়া জলনিকাশ' পরিকল্পনা নিয়ে সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত মূল সমস্যার

সুষ্ঠু সমাধান না হচ্ছে। সেই রকম সুষ্ঠু সমাধানই কলিকাতা বন্দরের নাব্য-প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন করতে পারে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এ পর্যন্ত সরকারী প্রচেষ্টায় কোথাও লক্ষ্য করতে পারছি না যে তাঁরা মূল সমস্যা সম্যক্ বুঝেছেন। তাঁদের গবেষণা সমস্তই এলোপাতাড়ি, খাপছাড়া এবং ভ্রান্ত পথে চালিত হচ্ছে। যেন শুধু চাকরি বজায় রাখবার জন্যই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগুলি বেশী আগ্রহশীল, ত্রুটিগুলি উচ্চতর মহলে দেখিয়ে দিলেও কোনও ফল হয় না।

॥৫॥ মজা-নদীর পুনরুদ্ধার

নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার মাধ্যমে মজা-নদীর পুনরুদ্ধার একটা প্রধান কাজ। আড়াআড়ি উঁচু বাঁধের আড়ালে জল সঞ্চিত করে, সারাবছর নিয়মিত প্রবাহে নদীর মজে আসা শাখা-প্রশাখাগুলিতে প্রবাহিত করতে পারলে, তাদের পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। অবশ্য, সেই সঙ্গে আরও পৌর্তিক কাজ করারও প্রয়োজন আছে। জলপ্রবাহের শক্তির দ্বারাই খাতের মধ্যভাগ গভীরতর করে নেওয়া যায়, দুই পাশে কৃত্রিম উপায়ে পলি পাতিত করে পাড়ের ধারে চর সৃষ্টি করা যায়। তা ছাড়া স্পার, গ্রয়েন, গাইড বাঁধ প্রভৃতি পৌর্তিক কাজের ক্ষেত্র-বিশেষে প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, মহানদীর পুনরুদ্ধারের কাজে। এই সব কাজের সাহায্যে যে অতি সহজে ভাগীরথীর মজে আসা উৎসের অংশ পুনরুজ্জীবিত করা যায়, তার ইঙ্গিত যথাস্থানে দিয়েছি, অনর্থক ফরাক্কা-ব্যারেজের মত পৌর্তিক কাজে বিপুল ব্যয়ের প্রয়োজন নেই।

দামোদরের শাখা 'কাণা' নদীগুলির পুনরুদ্ধার হবে দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনার মাধ্যমে, আমরা প্রথমে এই রকম আশা করেছিলাম। উচ্চ-দামোদর এলাকার বর্ষার জল বাঁধে সঞ্চিত করে আর নিম্নাঞ্চলের বর্ষার জলও স্থানে স্থানে স্থির জলাশয়ে সঞ্চিত করে, সমস্ত বাঁকুড়া, হুগলী, মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার মজা-নদীগুলির পুনরুদ্ধার সাধিত হতে পারতো। কিন্তু আমরা বিস্মিত হয়ে দেখলাম, সাম্রাজ্যবাদী পরামর্শদাতাদের কুটিল বুদ্ধি তা সম্ভব হতে দেয় নি। অনর্থক সেচের খাল কাটিয়ে জলের অপচয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। সেই সরু সরু সেচের খালগুলি মজা-নদীর সমান্তরালে কাটা হচ্ছে, একদিন আধা ঔপনিবেশিক অর্থ-নীতির শোষণ ব্যবস্থার ফলে শ্রীহীন কৃষকসমাজ ওই নতুন খালগুলিকেও চালু রাখতে পারবে না, এগুলিও মজে যাবে। তা ছাড়া, উচ্চ-দামোদর এলাকায় কৃত্রিম হ্রদগুলিতে যত জল সঞ্চিত হবে বছরে, তাই দিয়ে এই ১৫০০ মাইল খাল জীবন্ত রাখা অসম্ভব। বড়ই পরিতাপের কথা, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা কোনও মজা-নদীর পুনরুদ্ধার না করে জীবন্ত নদ-নদী মজানো ও মজা-খাল সৃষ্টির ব্যবস্থাই করেছে। এই সেচের খালগুলিকে ভরাট করে এ পরিকল্পনার সংস্কার না করলে, এ অঞ্চলের মানুষ সমূহ সর্বনাশের মুখে পড়বে। এত বড় মারাত্মক ভ্রম যে কোনও নদী-উপত্যকায় করা সম্ভব এ যুগে, আমরা সে কথা স্বপ্নেও ভাবি নি। সামান্য প্রাথমিক অঙ্ক কষে যে কথা বোঝা যায়, সে কথা যে কেন আজও কর্তৃপক্ষ বুঝেও বুঝতে চাইছেন না, সে শুধু তাঁদের মিথ্যা মর্যাদা জ্ঞানের জন্য।

॥ ৬ ॥ নাব্যপ্রণালীর উন্নতি ও সৃষ্টি

নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা নাব্যপ্রণালী সৃষ্টির কাজে খুবই সহায়তা করতে পারে। বর্ষার বন্যার সময়ে কয়েকদিনে যে জল প্লাবনের সৃষ্টি করে আর অপচয়িত হয়ে যায়, সেই জলকে সারা বছর নিয়মিত প্রবাহে নদীর খাতে, উপযুক্ত গভীরতায় প্রবাহিত করাতে পারলেই নদীর নাব্যতা সৃষ্টি হয়। মজা-নদীর পুনরুদ্ধারের অনুচ্ছেদে যেসব পৌর্তিক কাজের উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের সাহায্যে প্রশস্ততর নদ-নদীকে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ ও গভীর করে নেওয়াই হচ্ছে নাব্যপ্রণালী সৃষ্টির প্রধান কাজ। এইভাবে রূপনারায়ণ-দামোদর নদ মোহানা থেকে বর্ধমান পর্যন্ত সহজেই নাব্য করা সম্ভব ছিল। অন্যান্য কাণা নদীগুলিও নাব্য হতে পারতো, কিন্তু দামোদর পরিকল্পনায় সে কাজ সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, দামোদর পরিকল্পনার মারাত্মক গলদের ফলে কলিকাতা বন্দরের নাব্যতাও ধ্বংস হবে, এ কথা পূর্বেই বারবার বলেছি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীতে রেল, রাস্তা, বিমান পথ প্রভৃতির দিকে বিশেষ ঝোঁক পড়ায়, আমাদের বাংলা দেশের মত নদী-নালার দেশে নদীর নাব্যপথ বিশেষ অবহেলিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে রেল ও সড়ক নির্মাণের স্বার্থে, অনেক নদীর অববাহিকায় বাধা সৃষ্টি করে নদীর নাব্যতা ধ্বংস করা হয়েছে, আর রেল ও সড়কের বাধায় জলনিকাশ বন্ধ হওয়ায় জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থের প্রচুর হানি করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বাংলা দেশে কলিকাতার মত শহর দিনে দিনে বড় হয়ে উঠেছে, এখানে বস্ত্র প্রভৃতি বৈদেশিক পণ্যসম্ভার দেশবাসীকে বিক্রি করবার ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু দেশের কৃষিজাত ও কুটির শিল্পজাত পণ্যের বিক্রির ব্যবস্থার ভিত্তি অত্যন্ত শিথিল হয়ে গিয়েছিল, অন্যায় ও বি-সম প্রতিযোগিতায়। নাব্যপথের হানির সঙ্গে পুরানো গঞ্জগুলি ধ্বংস পেয়েছে।

আজ কয়লা খনির বিদেশী স্বার্থ আফ্রিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পড়ে আওয়াজ তুলেছেন দুর্গাপুর থেকে কলিকাতা পর্যন্ত নাব্যপথ চাই, নতুবা সস্তায় কয়লা চালান দেওয়া যাচ্ছে না সিংহল প্রভৃতি দেশে। কিন্তু এঁদেরই স্বার্থে একদিন বাংলা দেশের অন্তঃস্থলের সহজ নাব্যপথ নষ্ট করা হয়েছে।

নাব্যপথে সস্তায় বাংলা দেশের সুদূর গ্রামাঞ্চলের পণ্য শহরে ও গঞ্জে আমদানির ব্যবস্থা নষ্ট হওয়ার ফলে সমস্ত গ্রামাঞ্চল ধ্বংস হয়ে গিয়েছে গত একশত বছরে। জলপথেই আজও পণ্য আমদানি-রপ্তানি অতি অল্প খরচে করা যায়। জাহাজে বিলাত থেকে কাপড় এনে কলিকাতার বাজারে সস্তায় ছাড়া যায়, গ্রামের তাঁতির ঘর থেকে কাপড় কলিকাতায় আনাতে, জলপথের অভাবে, অত্যধিক খরচ পড়ে যায়। তরিতরকারি ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য পাঠাতেও অনেক বেশী খরচ পড়ে যায় দেশের অভ্যন্তর থেকে। আজও হুগলীর তটে বৈদ্যবাটীর হাটে সেই সব অঞ্চল থেকেই তরিতরকারি আনানো পোষায়, জলপথে যেসব অঞ্চল সহজগম্য। অন্যত্র চাষ করে লাভ নেই। তাই নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার মাধ্যমে নাব্যপ্রণালীর সৃষ্টি ও উন্নতি বিশেষভাবেই কাম্য আমাদের এই বাংলা দেশে।

জলপথে পণ্য আমদানি কত সুলভ হতে পারে, তা বোঝা যায়, একখানি হাজার মণি নৌকা পর্যবেক্ষণ করলেই। মাত্র গুটি ৫।৬ সাধারণ দাঁড়ি-মাঝির সাহায্যে কয়েকদিনে এক হাজার মণ পণ্য কলিকাতা থেকে সুদূর নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, শ্রীহট্ট, অথবা গঙ্গায় পাটনা, এলাহাবাদ কানপুর পর্যন্ত চালান দেওয়া যায়। সেখানে ১০ খানি লরী বোঝাই করে রাস্তা দিয়ে চলতে হবে অথবা ৪ খানি রেল-ওয়াগনে রেলপথে ওই মাল চালান দিতে হবে।

সহজেই বোঝা যায়, ১০০ মাইল যেতে নৌকায় যে মালের হয়তো মণ-পিছু এক আনাও লাগবে না, রেলপথে তারই ভাড়া এক টাকা এবং রাস্তার লরীর দু টাকা। স্টীমারেও খুব কম খরচ হয় অনেক মাল সুদূরে নিয়ে যেতে। ভাড়াও কম লাগতো। আজ বিলাতী কোম্পানির কর্তৃত্বাধীনে ব্রহ্মপুত্র নদের গঞ্জগুলি থেকে কলিকাতা অবধি স্টীমারযোগে মাল পাঠানোর খরচ অন্যায়ভাবে বর্ধিত হারে আদায় করা হচ্ছে শুধু অত্যধিক মুনাফা লুণ্ঠনের অভিপ্রায়ে আর বর্তমান পাক-ভারত বিবাদের সুযোগে তাদের হাতে একচেটিয়া অধিকারের বলে।

যথাযথ স্থানে রাস্তা ও রেলপথের যথেষ্ট কার্যকারিতা আছে, তাদের কাজ জলপথ করতে পারে না। আর সর্বত্র জলপথের সৃষ্টিও হতে পারে না। উচ্চ, পার্বত্য অঞ্চলে রাস্তা এবং রেল ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু আমাদের বাংলা দেশের সমতল ভূমিতে নদী-নালার দেশে নাব্যপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধন করে যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত করাই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। দেশের অভ্যন্তরের পণ্য সুলভে ও সহজে শহরে ও গঞ্জে উপস্থিত করাতে নাব্যপথের তুলনা নেই। এরই সাহায্যে গ্রামাঞ্চলের মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পায় অতি সহজে।

নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার সুলভ জলবিদ্যুতের সাহায্যে নাব্যপথের যাতায়াতের দ্রুততা বৃদ্ধি করানো যায়। বৈদ্যুতিক রেল অথবা ট্রামের মত, নাব্যপ্রণালীতেও খোঁটায় খোঁটায় বিদ্যুতের তার খাটিয়ে, জলযান চালানো যায় দ্রুততর গতিতে। সুষ্ঠু নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা যে কতভাবে দেশের শ্রীবৃদ্ধি করতে পারে, শুধু তারই ইঙ্গিত দিচ্ছি। ফ্রান্স দেশটি আয়তনে প্রায় বাংলা দেশেরই সমান (সমগ্র বাংলা), কিন্তু সেখানে প্রায় ৪০ হাজার মাইল নাব্য জলপথ আছে। আর আমাদের দেশের কয়েক শত মাইল নাব্য নদীগুলিই মজে যাচ্ছে, নাব্যখালের সৃষ্টি তো দূরের কথা। হিজলীর খাল ও উড়িষ্যা উপকূলের খাল মারফত উড়িষ্যার মহানদীর মোহানাকে হুগলী নদীর সঙ্গে সংযুক্ত করবার কথা হচ্ছে। কিন্তু সেটা কথা মাত্রই এখন পর্যন্ত। দামোদর পরিকল্পনায় দুর্গাপুর থেকে হুগলী পর্যন্ত প্রায় ৮৫ মাইল দীর্ঘ একটি নাব্য খাল কাটা হচ্ছে। ডিজাইনে এর প্রশস্ততা যা রাখা হয়েছে তা মোটেই যথেষ্ট নয়। এর চেয়ে চওড়া করা সম্ভবও নয় এই কারণে যে যথেষ্ট জল দেওয়া যাবে না নাব্যখালে। অনর্থক সেচের খালে জল নষ্ট করাই যে পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে পরিকল্পনায় সুলভ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন অথবা সুষ্ঠু নাব্যখাল সৃষ্টি যে হতে পারে না, তা সহজেই বোঝা যায়।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ আর নাব্যতা সৃষ্টির কাজ একসঙ্গে অতি সহজেই করা যায়। কিন্তু কৃষি-কার্যে সেচের জল ঋতু অনুযায়ী সরবরাহ করবার জন্যে

মজুত করে রাখতে হয়। কাজেই সেচের সঙ্গে নাব্যতা ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সুষ্ঠুভাবে হওয়া অসম্ভব।

সোভিয়েত দেশে নাব্যতার সুবিধার জন্য বড় বড় নদীকে সংযুক্ত করা হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশেও, যেখানে দ্রুততাকে খুবই প্রধান স্থান দেওয়া হয়, সেখানেও দেশের অভ্যন্তরে নাব্যপ্রণালীকে মোটেই অবহেলা করা হয় না। মিসিসিপির মত নদীর নাব্যতার উন্নতির জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হচ্ছে সে দেশে। সম্প্রতি নব্যচীন জনগণের সহায়তায় দীর্ঘ সুপ্রশস্ত খালপথ মাত্র ৭৫ দিনে কেটে ফেলেছে। ভারত সরকারের ইঞ্জিনিয়াররা দেখে বিস্মিত হয়ে এসেছেন।

নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার মাধ্যমে সেণ্ট লরেন্স নদীপথে বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজ দেশের সুদূর অভ্যন্তরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছে মার্কিন-কানাডীয় যৌথপ্রচেষ্টা। (নদী-উপত্যকা পরিকল্পনায় এমনি পাক-ভারত যৌথ প্রচেষ্টারই প্রয়োজন। তা না হলে অন্ততঃ বাংলা দেশের অনেক জানপদ-পরিকল্পনার রূপায়ণই অসম্ভব)। এই নাব্যপথের (সমুদ্রগামী জাহাজের জন্যে) দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২৫০০ মাইল (কলিকাতা থেকে রেলপথে বোম্বাই যাতায়াত পথেরও বেশী), সেণ্ট লরেন্স নদীর আটলাণ্টিক মহাসাগরের মুখ থেকে কানাডা-ইউ. এস. এ'র সীমানার সুদূর অভ্যন্তরে ডুলুথ শহর পর্যন্ত ১০ হাজার ১২ হাজার টনের জাহাজ কানাডার লাব্রাডার অঞ্চল থেকে লোহা-পাথর (iron ore) বোঝাই করে মার্কিন ইস্পাত শিল্পকে সস্তায় যোগান দেবে। তা ছাড়া এই সমুদ্রপথ সৃষ্টি করতে সেণ্ট লরেন্স নদীর উপত্যকায় প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ K. W. বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হবে।

সেণ্ট লরেন্স নদী ও সুপীরিয়র, মিচিগান, হিউরন, ইরী ও অণ্টারিও হ্রদের পথে পূর্বেই বহুদূর পর্যন্ত নাব্যতা ছিল। নায়াগ্রা জলপ্রপাতকে পাশ কাটিয়ে ওয়েল্যাণ্ড ক্যানাল নামক খাল কেটে নাব্যতার দৈর্ঘ্য সুপীরিয়র হ্রদের পশ্চিমাংশ অবধি বাড়ানো হয়েছিল ইতিপূর্বেই। এখন সেই পথ ২৫০০ মাইল দীর্ঘ হতে চললো।

ইউরোপের হল্যাণ্ড দেশে ডাইক (সমান্তরাল বাঁধ) দিয়ে রক্ষিত নদী ও খালপথের বহুলাংশ জাহাজের পক্ষে নাব্য। জার্মানীতে নদী ও খাল জলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ হাজার মাইল।

ফ্রান্সের প্রধান নদী সেইন, লো-আর, রোন্ এবং গারনের নাব্যতা রক্ষা করে ফরাসীরা পৌর্তিক কাজে শ্রেষ্ঠ সুনাম অর্জন করেছে। এই নদীগুলি এবং এদের উপনদীগুলি বহুসংখ্যক নাব্যখালদ্বারা (৪০ হাজার মাইল) সংযুক্ত। তারই ফলে ফ্রান্সে প্লাবনের ধ্বংসলীলার কথা শোনা যায় না, আর নদীগুলিও তাদের জলপ্রবাহ শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়ার দরুন পলি পড়ে মজে আসার হাত থেকে বেঁচেছে। সর্পিল গতি সংকীর্ণ সেইন নদীতে যে রুয়াঁ (Rouen) শহর পর্যন্ত সামুদ্রিক জাহাজ চলতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

বহু শতাব্দী থেকে আমাদের দেশে নতুন নাব্য জলপথের সৃষ্টির কথা দূরে থাক, নাব্য নদীগুলিও ক্রমশঃ ধ্বংস হয়ে আসছে। ৩০।৪০ বছর আগে গঙ্গা কানপুর

পর্যন্ত নাব্য ছিল, আজ মাত্র পাটনা পর্যন্ত অতি সম্প্রতি জলপথের সম্বন্ধে কাজ করবার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট একটি বোর্ড গঠন করেছেন। কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জলপথ বাবদ বরাদ্দ টাকা নগণ্য বললেই চলে। রাজপথ, রেলপথ, এরোড্রোমের উপরই ঝোঁক বেশী। উত্তর প্রদেশে গঙ্গা-যমুনার অববাহিকায় সেচ-ব্যবস্থার খাল সৃষ্টির ফলেই গঙ্গা-যমুনার নাব্যতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে অনেকাংশে।

সুলভ জলপথে আমদানি-রপ্তানির ব্যবস্থা ক্রমশঃ অবহেলিত হওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। আজকের দিনে, বিজ্ঞান ও টেকনিকের উন্নতির সঙ্গে অতি অল্প গভীর জলেও (৬ ইঞ্চি বা ১ ফুট গভীর) বহু পরিমাণে মাল বহনের উপযোগী জলযানের নির্মাণ কার্য সম্ভব হয়েছে। এরোপ্লেনের প্রপেলারের মত প্রপেলার বসিয়ে এই সব জলযান অল্প জলেই বায়ুর চাপে অতিদ্রুত চলতে পারে। জেট্‌এঞ্জিনের সাহায্যেও চালানো যায়। সুতরাং জলপথে যাতায়াতের দ্রুততাও অনেক বৃদ্ধি করা যায়, এমন কি রেলপথের চেয়ে দ্রুততর অথচ সুলভ করা যায়।

সাধারণতঃ এক ফ্যাদম (fathom) বা ৬ ফুট গভীর জলেই নৌকা ও ছোটখাটো স্টীমার-লঞ্চ চলে, ২ ফ্যাদম বা ১২ ফুট গভীর জলে বড় বড় স্টীমার চলে। সামুদ্রিক ছোট জাহাজ ২৫।৩০ ফুট গভীর জল চায়।

ভাগীরথী-হুগলীর নাব্যতা রক্ষার জন্যে Ordinary maintenance, সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ যথেষ্ট না হওয়ার দরুন যে গত একশত বছরে এর নাব্যতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মানুষের কাজে লাগাবার জন্য যে কোনও নদীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে রেখে দেওয়া কখনই সম্ভব নয়; বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ নদীর স্বাভাবিক প্রবাহতত্ত্ব পর্যবেক্ষণ করে তাকে কার্যোপযোগী করে রাখে। পরাস্ত মনোভাবাপন্ন কোনও কোনও এদেশী ইঞ্জিনিয়ারের কাছে শুনতে পাই, নদীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াই ভালো। কিন্তু এই স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেওয়ার শেষ কোথায়? বর্বর জীবনে ফিরে যাওয়া ছাড়া?

হুগলী নদীকে কার্যোপযোগী রাখবার জন্য কলিকাতা বন্দর এলাকায় বার্ষিক প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ড্রেজিং-এর কাজে ব্যয়িত হয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষে যে সমস্ত সাধারণ পৌর্তিক কাজের সুপারিশ করা হয়েছিল, নানা কারণে সে সব কাজ করানো হয় নি। মাঝে ডায়মণ্ড হারবার থেকে কলিকাতা বন্দর পর্যন্ত একটি নতুন খাল কাটার কথা উঠে এই প্রয়োজনীয় পৌর্তিক কাজের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। এই কাজগুলি হলে ড্রেজিং বাবদ খরচ আর বাড়বে না আশা করা যায়। (ড্রেজিং কোনও দিন সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যাবে, এরকম আশা করা অন্যায়।) সম্প্রতি এই সব কাজে হাতে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু দামোদরের বন্যা নিরোধের ফলে যে **অসাধারণ অবস্থার** সৃষ্টি হবে, এই কাজগুলির দ্বারা সেই অসাধারণ অবস্থায় হুগলী নদীকে নাব্য রাখা যাবে মনে করলে ভুল করা হবে। গঙ্গার ব-দ্বীপের মুখে বঙ্গোপসাগরের উপকূলের বৈশিষ্ট্য মনে রাখতে হবে। পৃথিবীর অন্য কোথা থেকে অনুকরণ করা পদ্ধতি নিয়ে এখানকার নদীগুলির নাব্যতা রক্ষা ও উৎকর্ষ সাধন করা যাবে না। গঙ্গার ব-দ্বীপের নদীর সুব্যবস্থা

করতে হলে নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। তা না হলে, কলিকাতা পোর্ট কমিশনার যে নদী শাসন কাজের আয়োজন করছেন নিম্ন-হুগলীতে, তার ফলে বন্দরের নাব্যপথ ধ্বংস ত্বরান্বিত হবে মাত্র।

তা ছাড়া, উত্তরবঙ্গের নদী-উপত্যকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নাব্যতার জন্য পাকিস্তানের সহযোগিতা কাম্য। ফলে দুই রাষ্ট্রেরই উপকার ও উন্নতি হবে। পূর্ব পাকিস্তানের আকাশ দিয়ে মেঘ উড়ে আসে, উত্তরবঙ্গে হিমালয়ের পাদমূলে ও আসামের খাসিয়া, গারো, জয়ন্তিয়া পাহাড়ে বৃষ্টি নামে, বন্যার জল আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে নেমে পূর্ববঙ্গ প্লাবিত করে। এই নৈসর্গিক নিয়মের যেমন ব্যতিক্রম নেই, তেমনি নদী-উপত্যকা নিয়ন্ত্রণের সুফল ভোগও দুই রাষ্ট্রের সহযোগিতাতেই সম্ভব। বিজ্ঞানের অবদান পূর্ণভাবে ভোগ করতে হলে চাই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে শান্তির আলিঙ্গন, যুদ্ধবিবাদের বিচ্ছেদ নয়। দশ বছর আগে যখন যুগান্তর পত্রিকায় 'বাংলা দেশের জানপদ পরিকল্পনা' প্রবন্ধগুলি লিখছিলাম, তখন ভাবতেই পারি নি, বাংলা দেশ দুই রাজনৈতিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যাবে। কিন্তু রাজনৈতিক ভিন্নতা সত্ত্বেও, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদীখালে নাব্য জলপথের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করবার জন্যে একতা ও সহযোগিতার পথে বাধা থাকা উচিত নয়। অনৈক্যের পথে রাষ্ট্রেরই সর্বনাশ ও ধ্বংস অনিবার্য।

॥ ৭ ॥ শহরে ও শিল্পে জল সরবরাহ

নদী-উপত্যকা পরিকল্পনায় আর একটি অবদান শহরে ও শিল্পে উপযুক্ত গুণের প্রচুর নির্ভরশীল জলের সরবরাহ অটুট রাখা।

মানুষ রন্ধন করে, আহার করে। সেই রন্ধনের কাজে তার জলের দরকার। তা ছাড়া স্নানের জন্য এবং পিপাসা নিবারণ করবার জন্যও তার স্বাদু ও বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজন। বিশুদ্ধ জল না হলে যে মানুষ বাঁচতেই পারে না, সে কথা সকলেই জানেন। অবিশুদ্ধ জলের নানারূপ ব্যাধির বীজাণু ও বিষাক্ত পদার্থ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়। শহরের বাইরে ব্যক্তিগতভাবে অথবা ছোট ছোট গোষ্ঠীগতভাবে মানুষ শুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে। প্রবাহিত নদী থেকে কলসী প্রভৃতি জলপাত্রে জল বহন করে আনা হয়। দীঘি-পুষ্করিণীর জলের ব্যবহার অথবা কূপ, নলকূপের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহারের ব্যবস্থা ব্যক্তিগত অথবা ছোট গোষ্ঠীর চেষ্টায় সম্ভব।

কিন্তু শহরে, যেখানে অনেক মানুষের ঘন বসতি, সেখানে জল সরবরাহের উপযুক্ত ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হলে কাজ চলে না। রাস্তায় ধূলি নিবারণের কাজ থেকে পিচ দেওয়া অথবা সিমেন্টের রাস্তা ধোয়ার কাজ, ড্রেন ধোয়ার কাজ, পার্কে-বাগানে জল দেওয়া এবং অগ্নি-নির্বাপণের জন্য শহরে প্রচুর জল সরবরাহ ও মজুতের প্রয়োজন। মানুষ ও পশুর নিত্য স্নান, আহার ও পানের জলের তো কথাই নেই। তা ছাড়া আজকাল এয়ার-কন্‌ডিশনিং ব্যবস্থার জন্যও কলিকাতার মত শহরে প্রচুর ভালো জলের দরকার। মোটর, বাস, ট্রাম গাড়িগুলি ধোওয়া, বাসগৃহ ধোয়া-পোঁছা প্রভৃতি কাজেও প্রচুর জল লাগে। শহর থেকে ট্রেন চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এঞ্জিনের বাষ্প তৈরীর বয়লারে উপযুক্ত গুণের জলের প্রয়োজন।

শিল্পে শুধু এঞ্জিন চালাবার জন্য বাষ্প উৎপাদনের কাজেই উপযুক্ত গুণের জল দরকার, তাই নয়। যন্ত্রপাতি ঠাণ্ডা রাখবার জন্যও প্রচুর জল চাই। বড় বড় পাটকলে অনেক জল লাগে, কাপড় কল, সূতাকলেও প্রচুর জল চাই। এসব কলে বাষ্প-চালিত এঞ্জিন ব্যবহার না করে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হলেও যে জল লাগে, তার পরিমাণও খুব বেশী। লোহা, ইস্পাত, এলুমিনিয়ম শিল্পে অনেক জল চাই। কাগজ প্রস্তুত শিল্পে, চামড়া শিল্পে ও বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে জলই প্রধান উপাদান।

হুগলী নদীর জল ক্রমশঃ দূষিত ও লবণাক্ত হয়ে আসার দরুন কলিকাতা ও আশপাশের শহরগুলির মানুষের জন্যে জল সরবরাহের সমস্যা আজ জটিল হয়ে আসছে। শুধু তাই নয়, হুগলীর জলের লবণের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে শিল্পেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। বয়লার শীঘ্র শীঘ্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি পূর্ব রেলপথের জেনারেল ম্যানেজার বিবৃতি দিয়েছেন, শিয়ালদহ থেকে লোকাল ট্রেনগুলির এঞ্জিন যে এত ঘন ঘন বিগড়ে যায়, তার কারণ হুগলীর জলের গুণের অবনতি।

উনবিংশ শতাব্দীর আগেও ইউরোপের শহরগুলিতে সুষ্ঠু জলসরবরাহ ও ময়লা জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় মহামারী দেখা দিত প্রায়ই। রোম (Eternal City) সুষ্ঠু জলসরবরাহ ও ময়লা জলনিকাশের ব্যবস্থার জন্যে প্রসিদ্ধ। হুগলী নদীর জলের অবনতি হতে থাকলে কলিকাতা অঞ্চল যে অদূর ভবিষ্যতে ভীষণ-ভাবে বিপন্ন হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শহরে এবং শিল্পে কি পরিমাণ জলের চাহিদা হবে, তা নির্ভর করে সেই শহর ও শিল্পের বিশেষত্বের উপরে। পাশ্চাত্য অনেক বড় বড় শহরে মাথাপিছু জলের চাহিদা, আমাদের কলিকাতা শহরের চেয়ে অনেক কম—কলিকাতায় পরিস্রুত ও অপরিস্রুত জল মিলিয়ে আজ মাথাপিছু ২০০ গ্যালন জল সরবরাহ করা হচ্ছে। তেমনি শিল্পভেদেও জলের পরিমাণ বিভিন্ন।

শহরে ও শিল্পে জল সরবরাহের জন্যে জলের উৎসও বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। বোম্বাই শহরের জন্যে জল আসে বহু দূরবর্তী টানশা নামক স্থানের কৃত্রিম হ্রদ থেকে। অনেক শহরে উপকণ্ঠবর্তী নদীর জল ব্যবহার করা হয়। ছোট ছোট শহরে ও শিল্পে নলকূপ বসিয়ে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারের ব্যবস্থা হয়েছে। কলিকাতা শহরের জল সরবরাহ করা হয় প্রধানতঃ হুগলী নদীর জল দিয়ে। সম্প্রতি কয়েকটি বৃহত্তর ব্যাসের নলকূপও বসানো হচ্ছে, জলের সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু কলিকাতার নলকূপের জল 'কঠিন' (hard) আর সেজন্য অনেক কাজের অনুপযুক্ত, বয়লার শীঘ্র শীঘ্র নষ্ট করে।

প্রচুর জল থাকলেই সে জল সব সময়ে শহরে ও শিল্পে ব্যবহার্য হতে পারে না। সমুদ্রের জল অথবা সমুদ্র উপকূলের নদীনালা ও হ্রদের জল এই রকম ব্যবহারযোগ্য নয়। তেমনি ভূগর্ভস্থ অনেক প্রচুর জলও নলকূপের সাহায্যে তুলে নিয়ে ব্যবহারযোগ্য বিবেচিত হয় না। কোথাও নদী ও নলকূপের জল ফিলটারে পরিস্রুত করে নিয়ে ব্যবহারযোগ্য করা হয়। দূষিত পদার্থ, লবণ ও রাসায়নিক দ্রব্য সংমিশ্রিত থাকার জন্য অনেক জলই ব্যবহার করা যায় না। অগভীর নল-কূপের জল এই কারণে প্রায়ই ব্যবহারযোগ্য নয়।

দেখা যায়, ছোট ছোট ঝরনা থেকে আরম্ভ করে ছোট বড় নদীর জলই মানুষের শিল্পের ব্যবহার উপযোগিতার দিক থেকে সর্বোৎকৃষ্ট। তবে, নানাকারণে, এই সব উৎস থেকে পর্যাপ্ত জল সরবরাহে নানা বাধা উপস্থিত হয়। নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার মাধ্যমেই এই সব বাধা দূর করে পর্যাপ্ত ও নির্ভরশীল জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায়। হ্রদের বৃহৎ জলরাশি অথবা নদীর প্রবাহিত জল আলোড়নের ফলে বায়ুর অক্সিজেন গ্যাস ও সূর্য কিরণের সংস্পর্শে আসে, তাই ব্যাধির বীজাণু ধ্বংস হয়ে যায়, জল সুস্বাদু হয়। সেইজন্য এই জলই মানুষের ব্যবহারের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। আর এই জন্যই কলিকাতার মত শহরের জন্য ভাগীরথী-হুগলীর জলের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল।

কলিকাতায় দুই ধরনের জল ব্যবহার করা হয়। এক অপরিস্রুত জল যেটা কলিকাতা শহরেই নদীর উপকূলে দুটি পাম্পিং ঘাঁটি বসিয়ে তোলা হয়, প্রধানতঃ রাস্তা, বসতবাটি, ড্রেন প্রভৃতি ধোয়া-মোছা এবং অগ্নিনির্বাপণের কাজের জন্য। আর দ্বিতীয়তঃ পরিস্রুত জল—যেটা কলিকাতা থেকে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে ব্যারাকপুরের কাছে পলতায় পাম্পিং ঘাঁটি বসিয়ে তোলা হয় আর টালায় আনিয়ে কলিকাতার সকল অঞ্চলে সরবরাহ করা হয়। সম্প্রতি কয়েকটি নলকূপও বসানো হচ্ছে শহরের অভ্যন্তরে।

পরিস্রুত জলের পাম্পিং ঘাঁটি পলতায় বসানোর প্রধান কারণ, সে সময় ওখানে জলের লবণের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পেত না।

আজ হুগলী নদীর জল দূষিত ও লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। আশা করা হয়েছিল, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় দামোদরের জলের সাহায্যে কলিকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের জলের উন্নতি সাধিত হবে। কিন্তু বর্তমান দামোদর পরিকল্পনায় সে আশা দূরীভূত হয়েছে। অনর্থক সেচের খাল কেটে জল নষ্ট করবার ব্যবস্থা হওয়াতে যথেষ্ট জল আর পাওয়া সম্ভব নয়, হুগলী নদীর জলের গুণের উন্নতি সাধন করবার জন্যই সামোদরের জল। কর্তৃপক্ষ অবশ্য এখনও ঢাক পিটিয়ে প্রচার করতে ছাড়ছেন না যে, দামোদরের যথেষ্ট জল হুগলীতে এসে পড়বে সারা বছর ধরে। কথাটা যে সত্যি নয়, তা বোঝা অতি সহজ একটু অঙ্ক কষে দেখলেই। প্রতি ১২ বছরের মধ্যে ৫ বছর অপেক্ষাকৃত অল্প বৃষ্টিপাত হয় দামোদরের উচ্চ-উপত্যকায়। এমনি শুকনা বছরের সমস্ত জল বাঁধের আড়ালে কৃত্রিম হ্রদে মজুত করে দুর্গাপুরের নাব্যখাল দিয়ে নিয়মিত হুগলী নদীতে নামলে ৬,০০০ কিউসেক জল নামতে পারে। আর সুবৃষ্টির ৭ বছরে পাওয়া যেতে পারে ১৪,০০০ কিউসেক। দশ লক্ষ একরে সেচ-ব্যবস্থা করে ওই জলের যে কিছুই বাকি থাকে না হুগলীতে নামার জন্য, তা বোঝাই যায়। সরকারী কর্তৃপক্ষ এ কথা জেনেও সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করতে পশ্চাদপদ হচ্ছেন না, এইটাই প্রকাণ্ড দুর্ভাগ্য। এক দিকে সঙীন অবস্থার সমাধানের জন্যে তাঁরা উপায় খুঁজতে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। আমরা (যাঁরা দামোদর পরিকল্পনার ত্রুটিগুলি প্রথম থেকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছি) সাধারণ মানুষের ভুল ভাঙবার চেষ্টা করার পরেই তাঁরা ফরাক্কায় গঙ্গা-ব্যারেজ পরিকল্পনার অবতারণা করেছেন, এ কথা পূর্বেই বলেছি। ত্রুটিপূর্ণ বর্তমান

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার মাধ্যমে কলিকাতা ও নিকটবর্তী শহরে জল সরবরাহের যে কোনও উন্নতি হবে না, তা সুনিশ্চিত। ত্রুটি সংশোধনের একমাত্র উপায় অনর্থক কাটা সেচের খালগুলি ভরাট করে দেওয়া।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার উপর ভরসা করে পশ্চিমবঙ্গে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠার জল্পনাকল্পনা হচ্ছে, বিশেষতঃ দুর্গাপুর অঞ্চলে। পশ্চিমবঙ্গের যেসব গুণী বিশেষজ্ঞ এই জন্য পণ্ডশ্রম করছেন, তাঁহাদের জন্য অনুকম্পা হয়। খালের সেচ-ব্যবস্থায় কায়েমীস্বার্থ সৃষ্টি হতে চলেছে, নিম্ন-দামোদর এলাকায়। সাম্রাজ্যবাদী পরামর্শদাতাদের কুটবুদ্ধির চালে দেশকে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে বেঁধে রাখবার ষড়যন্ত্র ভেদ করে শিল্প গড়ে তোলার আশা দুরাশা ছাড়া কিছু নয়। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করা মোটেই সম্ভব নয় বর্তমান দামোদর পরিকল্পনা থেকে। তাই পদে পদে পশ্চিমবঙ্গের চেষ্টা বানচাল করে দেওয়া হচ্ছে দিল্লী থেকে,—সেখানে জল সরবরাহের প্রকৃত অবস্থা অজ্ঞাত নয়। প্রস্তাবিত ইস্পাতের কারখানা দুর্গাপুরে না হয়ে রূড়কেল্লায় হওয়ার একটা সঙ্গত কারণ দেখানো যায়, কিন্তু ১২½ কোটি টাকার কোক ও ভেন প্লান্ট-এর পরিকল্পনা নামঞ্জুর করার কারণ জলাভাব ছাড়া আর কিছু নয়, সে কথা একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। বাস্তবিক দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা দিয়ে দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের স্বপ্ন রূপায়িত করতে হলে, তার মূল ত্রুটি সংশোধন করতেই হবে। তার নিরর্থক সেচের খালগুলি এখনই ভরাট করে দিতে হবে। বিলম্ব হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট নব সৃষ্ট চাষীর স্বার্থ পরে অবুঝ বাধা দেবে। সাম্রাজ্যবাদীদের কুটিল চালই বিজয়ী হবে।

॥ ৮ ॥ মৎস্যচাষের সুযোগ বৃদ্ধি

নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার মাধ্যমে বৃহদায়তন কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি ও যে ক্ষেত্রে নদীর খাতে জলপ্রবাহের উন্নতি হয়, সেই সব ক্ষেত্রে যে মৎস্যচাষের নতুন নতুন বৃহৎ আবাদ সৃষ্টি হতে পারে, এ কথা সহজেই বোঝা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে আজ মাছের একান্ত অভাব। কলিকাতা অঞ্চলে মাছের চাহিদার একটা বৃহদংশ পূর্ববঙ্গ থেকে আসতো, পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর থেকে মাছ সরবরাহ ব্যাহত হয়ে গিয়েছে, সে কথা অজ্ঞাত নেই। তাই সাধারণ বঙালীর প্রধান খাদ্য মাছের চাষ বৃদ্ধি হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। শুনতে পাওয়া যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাছের চাষের উৎকর্ষের জন্য নানা আয়োজন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গকে পার্বত্য, পার্বত্যের পাদভূমি, উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও সমুদ্রোপকূল প্রভৃতি ছয় ভাগে ভাগ করে নিয়ে মৎস্যচাষ সম্বন্ধে সরকারী উদ্যোগ আয়োজনের কথা প্রায়ই শোনা যায়।

বাংলা দেশে সাধারণতঃ যেসব মাছ আমরা খাই, তাদের 'কৃষিক্ষেত্র' প্রধানতঃ চার ভাগে ভাগ করা হয়ঃ ১] মিঠাজলের মাছের আবাদ, ২] নদীর মাছের আবাদ, ৩] সমুদ্রোপকূলের মাছের আবাদ ও ৪] নদীর মোহানার মাছের আবাদ।

বাংলা দেশের পার্বত্য ও পর্বতের পাদভূমি অঞ্চলে নদীর মাছ ও মিঠাজলের মাছের আবাদই প্রচলিত। উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য অংশেও নদীর মাছ ও মিঠা-

জলের মাছের চাষ হয়। এই অঞ্চলে বড় বড় দীঘি পুষ্করিণীতে বেশ সুষ্ঠু ও নিয়মিতভাবে মাছের চাষ হয় আর সে মাছের ডিম আসে দামোদর-রূপনারায়ণ-কাঁসাই-এর বন্যায় হাওড়া-মেদিনীপুর জেলা থেকে। হুগলী নদীতেও কিছু ডিম ধরা হয়। সমুদ্রোপকূলের আবাদ আর খোলা সমুদ্রেও মোহানায় মাছের আবাদকে এক শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

মহাশোল, কাতলা প্রভৃতি মাছ পার্বত্য-নদীতে জন্মায়।

পর্বতের পাদদেশ অঞ্চলে উপরোক্ত মাছ ছাড়া রুই, মিরগেল মাছও পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম বিভাগে রুই, কাতলা, মিরগেল, পাবদা, চিংড়ি, বোয়াল, শোল, কই, মাগুর, শিঙি প্রভৃতি পরিচিত মাছের রাজ্য। সমুদ্রোপকূলে ও নদীর মোহানায় ইলিশ, বেলে, তপসে, পাঁকাল, ভেটকি, কই, মাগুর, চিংড়ি, ট্যাংরা প্রভৃতি মাছ জন্মায়।

মাথাপিছু মাত্র ১ ছটাক পরিমাণ দৈনিক মাছের প্রয়োজন যদি ধরা হয়, তা হলেও পশ্চিমবঙ্গে বার্ষিক মাছের প্রয়োজন প্রায় ১ কোটি ৮ লক্ষ মণ। তার মধ্যে আজ পশ্চিমবঙ্গে বছরে উৎপন্ন মাছের পরিমাণ ৩০ লক্ষ মণ মাত্র। তা ছাড়া বর্তমানে প্রায় ৬ লক্ষ মণ মাছ অপর রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসে। অর্থাৎ বর্তমানে প্রায় ৩৬ লক্ষ মণ মাছ পশ্চিমবঙ্গের বাজারে এক বছরে বিক্রিত হয়। প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ! কাজেই মৎস্যচাষের উৎকর্ষ বিধান যে কত জরুরী তা সহজেই বোঝা যায়। চাহিদার তুলনায় সরবরাহের এই দারুণ পার্থক্যের জন্যই মাছ এত দুর্মূল্য। বিশেষতঃ এই অভাবের সুযোগে মধ্যবর্তী দালাল অত্যধিক লাভের লোভ সামলাতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার খোলা সমুদ্রে মাছ ধরার রঙিন পুতুল দেখিয়ে জনসাধারণকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাঁদের আয়োজন যে কতদূর অকিঞ্চিৎকর, তা হিসাব করে দেখলেই বোঝা যায়।

বাজারে মাছ খুব দুর্মূল্য বটে, কিন্তু আসল মৎস্য-চাষীরা লাভের অতি ক্ষুদ্রাংশ পান। মাঝখানের মুনাফাখোরেরা যদি টাকা পিছু চৌদ্দ আনা অংশ ভাগ করে নেয়, তো, মৎস্যজীবীরা পান দুই আনা।

পশ্চিমবঙ্গে আশি হাজার ঘরে প্রায় ৯৬ হাজার মৎস্যজীবী মাছ ধরে জীবিকার্জন করে। এদের অবস্থা শোচনীয়। বড় বড় মুনাফাখোরের ও জমিদারের হাতে আবাদ, বিক্রয়-ব্যবস্থাও ব্যবসায়ীদের হাতে, কাজেই মৎস্যজীবী এবং মাছ-খেকো বাঙালী দুইই মারা যায়। যে সুষ্ঠু সমবায় নীতিতে আর মাছের আবাদের স্বত্বাধিকারের ন্যায়সম্মত বিধানে এ সমস্ত অন্যায়ের প্রতিকার করা যায়, যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত মাছের চাষের সত্যিকারের উন্নতির কোনও আশা নেই পশ্চিমবঙ্গে।

নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার মাধ্যমে মৎস্যচাষের উন্নতি হওয়া সম্বন্ধে যে সরল ধারণার কথা প্রথমেই উল্লেখ করেছি, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে, দামোদর পরিকল্পনার মারফত তা কতদূর হবে, সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে।

আর কর্তৃপক্ষকে সে কথা জানিয়েছি। তাঁরা প্রতিকারের কোনও ব্যবস্থার কথা ভাবছেন কিনা জানি না।

মৎস্যের ব্যাপারে দামোদর উপত্যকার বর্তমান পরিকল্পনায় আর একটা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

সাধারণতঃ রুই, কাতলা, মিরগেল প্রভৃতি পোনা জাতীয় মাছ বছরে একবার ডিম ছাড়ে। ছোট নাগপুরের বর্ষার জল যখন বন্যারূপে দামোদর-রূপনারায়ণ, হুগলী, কাঁসাই প্রভৃতি নদীতে নামে তখনই পোনা মাছ নদী-প্রবাহের বিপরীত দিকে ধাবিত হতে হতে ডিম ছাড়ে। এই ডিমই সরু জালে ধরে মৎস্যচাষের জন্য উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম বিভাগের দূর অঞ্চল পর্যন্ত বিক্রি হয়। যে বছর কম বন্যা হয়, সে বছর এই ডিম সরবরাহে ঘাটতি পড়ে,—মৎস্যচাষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলে সকলেই এ কথা জানেন। দামোদর-রূপনারায়ণের নিম্নাঞ্চলই এই ডিম ধরবার প্রধানতম কেন্দ্র এবং প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ ডিম এখান থেকেই আসে। কাজেই দামোদরের উচ্চ অঞ্চলের বন্যা নিরুদ্ধ হয়ে গেলে, দামোদর ও রূপনারায়ণের নিম্নাঞ্চলে যে এই ডিমের সরবরাহে ভীষণ ঘাটতি পড়তে পারে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং দুর্ভাগ্যক্রমে দেখা যাচ্ছে, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে মৎস্যচাষের শ্রীবৃদ্ধি না হয়ে বরং মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। পরিকল্পিত নিরর্থক সেচের খাল কেটে জল অপচয়িত না হলে, দামোদরের খাতে সারা বছর জল প্রবাহিত রাখলে, বর্ষার সময়ে নিম্ন-দামোদর অঞ্চলে যে বৃষ্টিপাত হয় তারই জলে নদী ভরপূর হলে হয়তো দামোদর-রূপনারায়ণে মাছের ডিম পাড়া বজায় রাখা যেত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য সরবরাহের যে জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে, তার প্রতিকারের উপায় বিশেষজ্ঞগণই বাতলাতে পারেন। আমরা মৎস্যচাষ-বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি এ দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করছি।

॥ ৯ ॥ জলক্রীড়া প্রভৃতি আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা

নদী-উপত্যকা পরিকল্পনায় পার্বত্য উচ্চ অঞ্চলে বাঁধ নির্মিত হওয়ায় যে বড় কৃত্রিম হ্রদ তৈরী হয়, সেখানে সন্তরণ, জলক্রীড়া, নৌকাচালানো, বাইচ খেলা প্রভৃতি ব্যায়াম ও আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই গড়ে ওঠে। কারণ বাঁধ প্রভৃতি পৌর্তিক কাজগুলি নির্মাণের জন্য সাধারণতঃ এই সব দুর্গম অঞ্চলে, নতুন নতুন রাস্তা, পুল প্রভৃতি তৈরী হয় এবং হ্রদের আশপাশে যাতায়াত সুগম হয়। পাহাড়, অরণ্য, ঝরনা প্রভৃতির দৃশ্যও নয়নাভিরাম, কাজেই স্থানগুলি যাত্রী আকৃষ্ট করে।

আমাদের দেশে প্রধানতঃ ধর্মের আহ্বানে তীর্থস্নানের জন্য হিন্দু নরনারী গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী প্রভৃতি নদীর তীরে সমবেত হয়—দূর দূর দেশ থেকে। কিন্তু ভ্রমণ-লিপ্সা ও আমোদ-আহ্লাদের টান ধর্মনির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীকে নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার বিরাট জলাশয়ে একত্র করতে পারবে। এই জন্য হোটেল প্রভৃতি ব্যবসায় ও নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠে আর এক ধরনের সামাজিক জীবনের আস্বাদ দেবে নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই সব ক্রীড়াক্ষেত্রে স্বভাবতঃই অনেক বিদেশীরও আগমন হবে, তাদের সঙ্গেও মেলামেশার সুযোগ পেয়ে এ দেশের মানুষের দৃষ্টির পরিধি ও ব্যাপ্তি বিস্তীর্ণ হবে। তা ছাড়া নদী-উপত্যকা পরিকল্পনায় হ্রদের কেন্দ্রগুলি সুপরিচালিত হলে, বিদেশী ভ্রমণকারী দলের আগমনে এ দেশে অর্থ আমদানিও হবে কিছু। কিন্তু এ সমস্তই নির্ভর করছে, পরিকল্পনার সুষ্ঠু সমাপ্তিতে যদি দেশের লোকের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয়, তার উপরে। বর্তমান পরিকল্পনা যে লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে না, এই আমাদের সিদ্ধান্ত।

॥ ১০ ॥ স্বাস্থ্যনিবাস পত্তন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি

নদী-উপত্যকা পরিকল্পনায় উচ্চ হ্রদাঞ্চলে যে কিছু স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে উঠবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জনবহুল ও কর্মবহুল শহর থেকে দূরে, মনোরম পার্বত্য দৃশ্যের মাঝখানে, হ্রদের জলের সমীপবর্তী মৃদু আবহাওয়ার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এই সব স্বাস্থ্যনিবাসের শান্ত জীবন নষ্ট-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় অনেককে আকৃষ্ট করবে। যাতায়াত সুগম হওয়ার জন্য পূর্বেকার এই দুর্গম স্থানগুলিতে আর যাতায়াতের কোনও অসুবিধা থাকবে না আজকের এই মোটরকারের দিনে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার হ্রদাঞ্চলের কেন্দ্রগুলি কলিকাতার মত শহর থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ; সুতরাং কলিকাতাবাসী অনেকেই যে ব্যবহার করতে পারবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তা ছাড়া, নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার মাধ্যমে সাধারণভাবেও দেশের জন-স্বাস্থ্য ভালো হবার কথা। আর জনস্বাস্থ্য ভালো হলে মানুষের কর্মক্ষমতা দেশে অধিক ধন উৎপাদন করতে পারে। নির্মল জলপ্রবাহী নদীর জলে অবগাহন স্নান মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী। যে নদী পরিকল্পনা নদীর খাত ও প্রবাহের উন্নয়ন করে, তার জলকে নির্মল রাখে, সে পরিকল্পনা দেশের উন্নতির খুবই সহায়ক। দামোদর পরিকল্পনায় যদি দামোদরে এই রকম সংবৎসরব্যাপী জল-প্রবাহের ব্যবস্থা হত, তা হলে নিম্নাঞ্চলের জনস্বাস্থ্যের যে উন্নয়ন হত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে, অল্পজলের নদী দেশের স্বাস্থ্যহানি করতে পারে ভীষণ ভাবে। কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি অন্ত্রঘটিত ব্যাধির জীবাণু এবং সম্ভবতঃ ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দিকাশি প্রভৃতি রোগের বীজাণু বাহিত ও বর্ধিত হয় এই সব নদীর জলে। জলে বিশেষ বায়ুর আলোড়ন না থাকায়, অক্সিজেন ও সূর্য-কিরণ জীবাণু ও বীজাণু ধ্বংস করতে পারে না। মজা-নদী যে ম্যালেরিয়ার মশক বৃদ্ধির ক্ষেত্র তা সকলেই জানেন। সুষ্ঠু নদী পরিকল্পনায় নদীর প্রবাহের উন্নতি হলে ওই সব রোগের প্রসার কমে যায়, আর দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। রন্ধন ও পানীয়ের জন্য নির্ভরশীল বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করে নদী গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটায়।

আমাদের দেশে আজও নদীর জলে নোংরা জিনিস ও শহরের এবং শিল্পের ময়লাজল ফেলা নিষিদ্ধ করার পূর্ণ ব্যবস্থা হয় নি। এইজন্য অনেক নদীর জল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নদী-উপত্যকা পরিকল্পনায় নদীগুলি শক্তিশালী শাসক-মণ্ডলীর আওতায় এলে এর প্রতিবিধানও সহজ হয়। উন্নীত নদী স্নান, সন্তরণ,

ব্যায়ামের সুযোগ দিয়েও মানুষের স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন করে। দামোদর পরিকল্পনা থেকে এসব কিছুই আমরা আজ প্রত্যাশা করতে পারছি না। বরং নতুন সরু সরু সেচের খালগুলির ধারের বাঁধ নিম্নাঞ্চলে বৃষ্টির জলনিকাশের পথে নতুন বাধা সৃষ্টি করে যে জলার সৃষ্টি করবে বর্ষাকালে ও বর্ষার পরে, তাতে ম্যালেরিয়ার বাহক মশককুলের বৃদ্ধির সুযোগই বেশী হবে। পূর্বেও বার বার উল্লেখ করেছি, এ অঞ্চলে সেচের জন্য জল আনয়নের ব্যবস্থা নয়, অতিরিক্ত বৃষ্টির জল সুষ্ঠু ব্যবস্থায় নিকাশ করার ব্যবস্থাই অগ্রগণ্য হওয়া উচিত ছিল। বর্তমান দামোদর পরিকল্পনার ফলে বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে দেখা দিতে পারে। এখনই এর প্রতিবিধানের ব্যবস্থা হওয়া, অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার মশক নিবারক রাসায়নিকের ব্যাপক প্রয়োগের ব্যবস্থা করাও অন্ততঃ ডি. ভি. সি. কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত।

মোট কথা

আমাদের সরকারী পরিকল্পনা, দেশের জনসাধারণের যথার্থ কল্যাণ ও স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে রচিত হয় নি, উপরের আলোচনা একটু মন দিয়ে পড়লে তা বোঝা শক্ত নয়। সরকারী পরিকল্পনার মূলনীতি নির্ধারণের সময়ে জনসাধারণের প্রকৃত হৈতৈষী সমৃদ্ধ বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ গ্রাহ্য করা হয় নি, প্রধানতঃ ঠগ বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও তাদের দালাল, সাম্রাজ্যবাদীদের আদরে লালিত-পালিত স্বদেশী তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের পরামর্শই গৃহীত হয়েছে। যে সব স্বদেশী আজ সরকারে উচ্চতর ও উচ্চতম পদে আসীন, তাঁদের অধিকাংশই বৃটিশ আমলে শুধু রাজকার্যে রাজসুখ ভোগ করেছিলেন; দায়িত্বশীল কাজের জন্য শিক্ষা, পর্যবেক্ষণ, পড়াশোনা প্রভৃতি কিছুই করবার অবসর অথবা চেষ্টা তাঁদের ছিল না। বৃটিশ কর্তাদের আদেশ পালনই তাঁদের প্রধান কাজ ছিল, স্বাধীন শিক্ষা-পর্যবেক্ষণের সুযোগই ছিল না। পদাধিকার বলে এঁরাই আজ সরকারের পরামর্শদাতা। দেশের তরুণ হিতাকাঙ্ক্ষীদের কাছে দৈনন্দিন জীবনে আজ এইসব তথাকথিত বিশেষজ্ঞগণের অজ্ঞতা ও দাম্ভিকতা অজ্ঞাত নয়—কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ নানা কারণে এদেরই হাতের ক্রীড়নক মাত্র। পুরানো দলের মধ্যে জ্ঞানীগুণী যাঁরা ছিলেন, সংখ্যাধিক ও ক্ষমতাশীল দুর্বৃত্তদের ষড়যন্ত্রে তাঁরা হয় নানাছলে পদ থেকে অপসারিত হয়েছেন অথবা নীরব থাকতে বাধ্য হয়েছেন। সুতরাং সরকারী পরিকল্পনার মূলনীতি গৃহীত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে অন্তরাল থেকে নির্দেশিত পরামর্শ অনুযায়ী। মূলনীতি গ্রাহ্য হবার সময়ে একটা লোক-দেখান জনসাধারণের পরামর্শ গ্রহণের অভিনয় হয়েছিল, কিন্তু নীতি নির্ধারিত হয়ে গেলে দেখা গেল প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পোষণের জন্যেই আমাদের দেশের পরিকল্পনার কাজগুলিতে দেশের বিপুল অর্থ অপব্যয়িত হচ্ছে।

পরিকল্পনার মূলনীতিতে অনেক বড় বড় বুলি আছে, যার ভিতরের গলদ আপাতঃদৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। যেমন 'সেচ ও শক্তি উৎপাদনে'র মূলনীতিতে বলা হয়েছে, 'খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে সেচের ব্যবস্থা সর্বাগ্রগণ্য হবে আর শক্তি উৎপাদনের কাজ এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হবে যে বিদ্যুৎ-যন্ত্রগুলিতে

অনর্থক পুঁজি আবদ্ধ না হয়ে পড়ে, শক্তির চাহিদা সৃষ্টি হবার আগে।' মূলতঃ এই মূলনীতিতে আমাদেরও আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু এই নীতি কার্যকরী করবার সময়ে যে অন্ধতা ও মূঢ়তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তাতেই বোঝা যায়, আসল ব্যাপার অন্যরূপ। বোকারোর তাপবিদ্যুৎ যন্ত্রে অনর্থক মোটা টাকার পুঁজি আবদ্ধ করে বলা হচ্ছে, 'আহা! ভুল হয়ে গিয়েছে।' আর দামোদর পরিকল্পনার অন্যান্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কাজ স্থগিত রাখা হচ্ছে ওই মূলনীতির নজিরে এবং নানা ওজুহাতে এ দিকে সমসাময়িক সময়েই আবার দুর্গাপুরে ৬০ হাজার K. W. তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ঘাঁটি স্থাপন করার চেষ্টা হচ্ছে। নিগূঢ় কারণে এবং আমাদের তীব্র সমালোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের এই প্রস্তাব সম্প্রতি অনুমোদন করেন নি।

কল্যাণরাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে নানা শিল্প প্রতিষ্ঠা করে শক্তির চাহিদার বাজার সৃষ্টি করা, কিন্তু বাজার নেই বলে শক্তি উৎপাদনের কাজে হাত দিয়ে আংশিক অগ্রসর হয়ে আবার থমকে দাঁড়ানো হচ্ছে মূলনীতির অপব্যাখ্যা করা।

নদী-উপত্যকা পরিকল্পনায় সেচের মারফত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলতেই কর্তৃপক্ষ মূলনীতি অনুযায়ী একমাত্র পদ্ধতি ধরে নিয়েছেন—সেচের জন্য খাল কাটা! (তা ছাড়া বে-হিসাবী খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধিও দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক হতে পারে, সে কথা ইতিপূর্বে বলেছি)। দামোদরের নিম্ন-উপত্যকায় যেখানে বর্ষার উদ্বৃত জলনিকাশ করার জন্য মজা ও কাণা নদীর পুনরুদ্ধারই প্রধান করণীয় ছিল, সেখানেও সেচের জন্য সরু সরু খাল কাটা হচ্ছে বিপুল অর্থের অপব্যয়ে এবং বহুমূল্য কৃষিভূমি নষ্ট করে। সস্তায় জলবিদ্যুতের সহায়তায় বিকল্প ব্যবস্থায় এখানকার সমস্ত আবাদী জমির সুষ্টু সংবৎসরব্যাপী সমীচীন সেচ পরিকল্পনা অতি সহজেই হতে পারে। আসল কথা বুঝতে আমাদের বাকি নেই। যেহেতু সস্তা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন আদপেই রাষ্ট্রের বর্তমান কর্ণধারগণের পরামর্শ-দাতাদের স্বার্থের পরিপন্থী, তাই দামোদরের উচ্চ-উপত্যকার সমস্ত জল সেচের কাজে নিযুক্ত হবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এর ফলে নিম্ন-দামোদরের নতুন সেচ খাল-গুলির ধারে যে এক ক্ষুদ্র কায়েমীস্বার্থ সৃষ্টি হবে, তাদের দেখিয়েই ভবিষ্যতেও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ওই জল ব্যবহারের পথে বিপুল বাধা সৃষ্টি করা হবে।

ধূর্ততার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নদী-উপত্যকা পরিকল্পনাগুলি রচিত হয়েছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। বহু দূর-ভবিষ্যৎ পর্যন্ত আমাদের দেশের জনসাধা-রণের উন্নতির পথ এইভাবে অবরুদ্ধ করা হয়েছে।

আমরা প্রথম থেকেই বলেছি, এক সঙ্গে বিরাট বিরাট বাঁধ বাঁধা আরম্ভ না করে দামোদর, তিস্তা প্রভৃতি পরিকল্পনায় অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত করে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। সারা অঞ্চলে নানারূপ শিল্পের প্রতিষ্ঠা উৎসাহিত করে এবং গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে পরিকল্পনা রচিত হওয়া উচিত ছিল। তা হলে মোটা পুঁজি বিদ্যুৎ উৎপাদন-যন্ত্রে অনর্থক আটক পড়ে যেত না। ইতিমধ্যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়ে আরও অধিক অর্থ যোগান দিতে পারতো দেশ। পরিকল্পনার তথাকথিত

মূলনীতি অনুযায়ী এখন জলবিদ্যুৎ উৎপাদন 'যন্ত্রে' অনর্থক পুঁজি আটক পড়ছে না বটে—নীতিটির 'অক্ষরগত' কথা রাখা হচ্ছে। কিন্তু বিরাট বাঁধগুলির নির্মাণ কাজে দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনায় যে পুঁজি আটক পড়ে থাকছে, আগামী পঞ্চাশ বছরেও যা থেকে কোনও ফল প্রসব করানো যাবে না, রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা তার সমস্যা সমাধানের কোনই উপায় পাচ্ছেন না। সেচের খালে কৃষির উন্নতি করে তাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে মনে করছেন দরিদ্র কৃষক-সম্প্রদায় বুঝি সমস্ত দায়ের বোঝা বহন করতে পারবে। আধা-ঔপনিবেশিক মনোভাবের চূড়ান্ত নিদর্শন! শেষ পর্যন্ত অর্থাভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য পরিকল্পনা স্থগিত ও পরিত্যক্ত হবে নিশ্চয়ই। এখনই উত্তর-পূর্ব ভারতের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যন্ত জরুরী কাজ করতেই রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা প্রধানতঃ অর্থাভাবে পশ্চাদপদ হচ্ছেন, যদিও প্রকাশ্যে নানা বাজে অজুহাত দেখাচ্ছেন এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের প্লাবনসমস্যা লঘু করে দেখাতে চেষ্টা করছেন। শুধু সেচ-ব্যবস্থার মাধ্যমে বিপুল দায় দরিদ্র কৃষকদের কাছ থেকে উসুল করবার কোনও ব্যবস্থাই সফল হতে পারে না। 'ভূমির উন্নয়ন কর' ও 'সেচকর' দিয়ে কৃষি-কার্যের খরচই পোষাবে না, কৃষিজাতের মূল্য নিম্নগামী হয়ে যাবার ফলে। কাজেই, কার্যতঃ নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার মাধ্যমে শুধু খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে আজ রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা কৃষি-কার্যে সামন্ততান্ত্রিক যুগের অর্থনীতিতে দেশকে আবদ্ধ করে রেখেই নিশ্চিন্ত হচ্ছেন, জমিদার উচ্ছেদ করে সরকারী পদস্থ ব্যক্তিদের নতুন 'জমিদার' সৃষ্টি করে।

স্টার্লিং ব্যালান্সের প্রচুর অর্থ খরচ করবার সুযোগ পেয়ে রাজনীতিক দলগত স্বার্থে এই রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা তাড়াহুড়া করে নদী-উপত্যকা পরিকল্পনাগুলির কাজ আরম্ভ করেছেন, ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যাগুলির পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ না করেই আজ দামোদরের পার্বত্য এলাকায় বন্যা নিরোধের ফলে অদূর ভবিষ্যতে (বন্যা-নিরোধী বাঁধের নির্মাণ শেষ হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যেই) কলিকাতা বন্দরের সমুদ্রগামী জাহাজের নাব্যপ্রণালী নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়ে যাবে। আমার এই সাবধান বাণী ৬।৭ বছর পূর্বেই উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু, প্রথমেই তাঁরা কর্ণপাতই করতে চান নি। সংবাদপত্রের মারফত জনসাধারণের দৃষ্টি বারংবার আকৃষ্ট করার পরে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে, অবশেষে এক 'হুগলী অনুসন্ধান কমিটি' বসানো হয়। এই মারাত্মক ভুলের জন্য যাঁদের দায়ী করা চলে, প্রায় সেই সব 'বিশেষজ্ঞ'দের দ্বারাই গঠিত হয়েছিল এই 'হুগলী অনুসন্ধান কমিটি'। তাঁরা আমায় আহ্বান করে আমার বক্তব্য শোনার কোনও প্রয়োজন অনুভব করেন নি। কমিটি বাকচাতুরীর সাহায্যে সমস্যার প্রধান কথা চাপা দিয়ে ফরাক্কা ব্যারেজ ও হুগলী-শাসন প্রভৃতির সুপারিশ করেন। মিথ্যা মর্যাদার অভিমানে তাঁরা বোধ হয় সমস্যার পূর্ণ-সমীক্ষার সম্মুখীন হতে নারাজ।

অপরদিকে বিভ্রান্তিকর প্রচারণার সাহায্যে জনসাধারণকে ভুলিয়ে রাখার অবিরাম চেষ্টা চলেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কঠোর সত্য-মিথ্যা প্রচারণার সাহায্যে বেশীদিন চাপা রাখা যায় না। সুখের কথা, আজ দেশের অনেক বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক

ও ইঞ্জিনিয়ার সমস্যাটি হৃদয়ঙ্গম করেছেন আর দেশের সাধারণ মানুষও ঘটনা প্রবাহে ক্রমশঃ বুঝতে পারছেন, সরকারী পরিকল্পনার গলদ কতখানি এবং কোন্‌খানে। জনসাধারণের অভিমতের চাপে ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁদের বৈদেশীক নীতি পরিবর্তিত করতে যেমন বাধ্য হয়েছেন আজ, তেমনি পরিকল্পনার নীতিও তাঁদের বদলাতে হবে।
